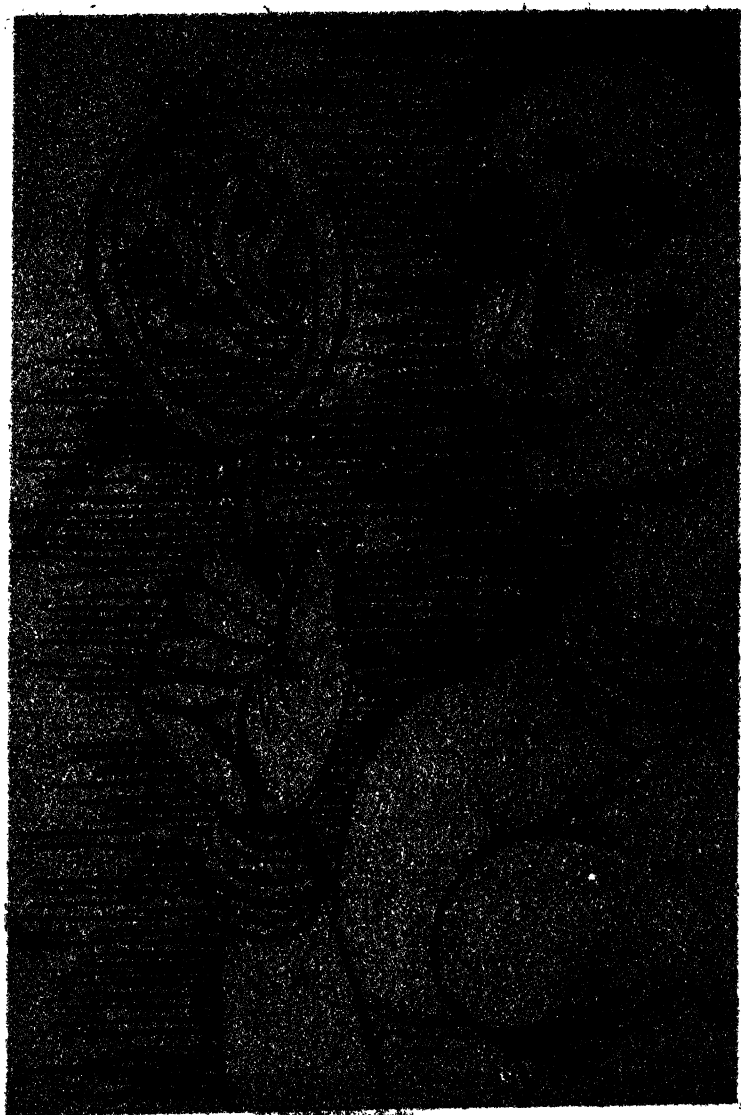


ରକ୍ତ କ୍ଷୟଶୀଳ ବର୍ଷ ॥ ୧୭୮୭



ଅତୀତ

ମାସକ : ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୫ ॥ ଅଭିନବ ମାସକ

দুমদ জাহানকোষা আজ অতীতের স্মৃতি



জাহানকোষা। নবাব মুশিদকুলি খাঁর
সেবা হাতিয়ার। আজ অতীত গৌরবের
স্মৃতিমাত্র। অতীতের মুশিদাবাদ—ঐশ্বর্য
আর বিলাসের লীলাভূমি। যেখানে
অতুলনীয় দেশপ্রেম আর ঘণাতম ষড়যন্ত্র
একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে সমান
গতিতে। এখানে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র
স্মৃতিসৌধ, যা আপনাকে মনে করিয়ে
দেবে নবাবী বাঙলার গৌরব-গাঁথা আর
তার পতনের বেদনাময় ইতিহাস।
এছাড়াও আজকের মুশিদাবাদে আপনি
পাবেন অতীত ঐতিহ্যের আরও সুন্দর
স্মারকসমূহ অসাধারণ হাতির দাঁতের

জিনিসপত্র আর শিল্পের শাড়ি। আজই
চলুন মুশিদাবাদ। দেখে নিন নবাবী
আমলের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি।
রাত্রিবাসের জন্যে রয়েছে বহরমপুর
ট্যুরিস্ট লজ। সেখানে পাবেন
আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য আর আশ্রয়।

বিশদ বিবরণের জন্যে যোগাযোগ করুন :

ট্রাবেল্‌স্‌ ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-নীলেশ বাগ

(ডালহৌসি কোয়ার্টার) ইষ্ট, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩৬২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS

ঘরাই (পার্বতী বিভাগ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার

With best compliments from :

McROCH & COMPANY

ENGINEERS & CONTRACTORS

163, Belilious Road,
Howrah.

Phone : 66-4120

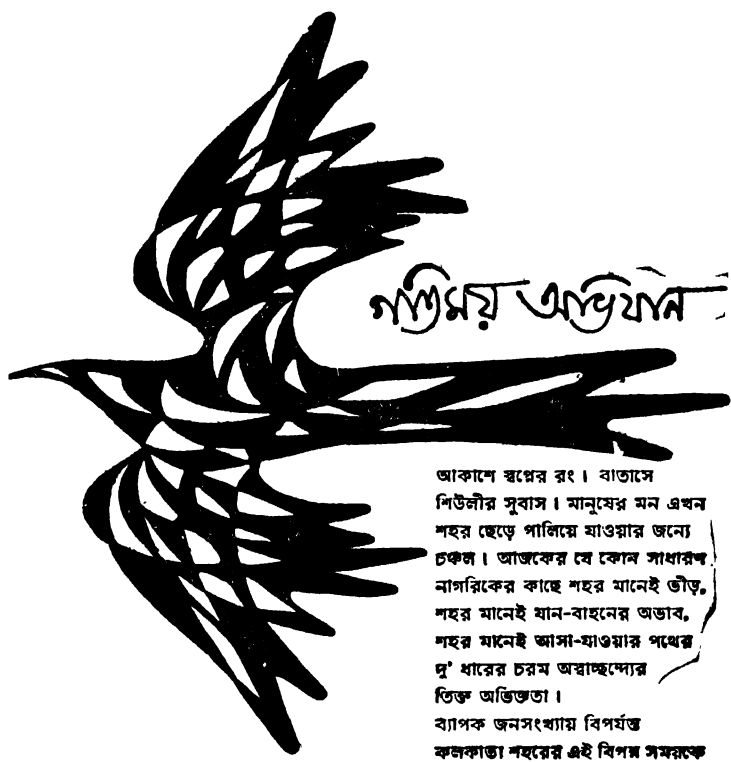
With best compliments from :

ENGINEERS ENTERPRISE

ENGINEERS & FABRICATORS

353/B, Biren Roy Road East,

Calcutta-700008



গতিময় অভিযান

আকাশে স্বপ্নের রং। বাতাসে
শিউলীর সুবাস। মানুষের মন এখন
শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে
চঞ্চল। আজকের যে কোন সাধারণ
নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়,
শহর মানেই যান-বাহনের অভাব,
শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের
দু' ধারের চরম অব্যাহতদোর
তিক্ত অভিজ্ঞতা।

ব্যাপক জনসংখ্যায় বিপর্যস্ত
কলকাতা শহরের এই বিশাল সমস্যা
পটভূমিকায় রয়েছেই তুগর্ড-রেলের
ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা। তুগর্ড
রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ
যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের
প্রতিশ্রুতি। তুগর্ড রেল মানেই
জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক
গতিময় অভিযান।

MT

কলকাতার মানচিত্র রচনায় তুগর্ড-রেল
ম্যেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

With best compliments from :

PRINTADEX ADVERTISING

3, Udayachal, 9, Rawdon Street,
Calcutta - 17.

Gram : PRINTADEX

Phones : 44 - 1044

44 - 0138

With best compliments from :

WISER EQUIPMENTS CORPORATION

DESIGNERS & MANUFACTURERS.

Foundry Equipments & Industrial Furnaces

Office :

4A, Bawali Mondal

Road :

Calcutta - 26

Works :

95-1B, Tollygunge

Road,

Calcutta - 26

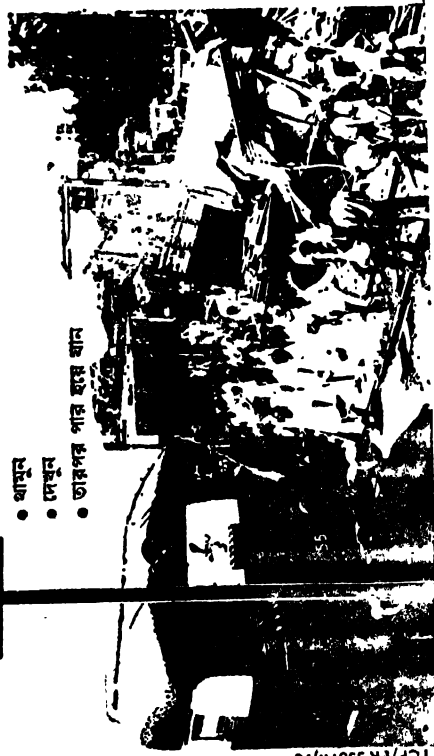
গাড়ি চালকদের প্রতি আবেদন

অহেতুক প্রাণহানি যত্নাবেন না



বেসর সড়ক ক্রসিং-এ পেটখান নেই, সেখানে

- থামুন
- দেখুন
- তারপর পার হয়ে যান



TCP/ER 358A/76



With best compliments from :

BANSAM AGENCIES PVT. LTD.

1/3, Mrigendralal Mitra .Road

Calcutta - 700017

Phone No : 43 - 1561

Solve your cargo problem by :

UNION ROADWAYS

Controlling & Head Office

P-9, New C.I.T. Road,

Calcutta - 700001

Phone : 34 - 5429 -'34 / 3200 : : Resi : 33 - 8565

Gram : UNI ROAD

Booking & Delivery Office :

8, Peter Lane,

Calcutta - 700012.

Complete range of SF products

Over 3000 floating testimonials now on the seven seas

During three decades in the marine air handling field, SF has delivered complete installations for more than 3000 ships—proof enough that shipowners everywhere place their trust in SF air at sea.

reliable air

Constant research and development work coupled with SF's basic experience in solving air handling problems has resulted in a complete line of standardized units to meet every need. For ship-builders this means that even complex installations can be designed using standardized components available at competitive prices.

The SF manufacturing range

- ☐ Air conditioning ☐ Ventilation and dehumidifying of cargo holds ☐ Circulating fans and air renewal systems for refrigerated holds ☐ Ventilation of engine rooms ☐ Forced draft fans and air preheaters ☐ Pump room fans ☐ Tank ventilation ☐ Air washers



Fläkt
SF India Limited

MARINE DEPARTMENT

"POONAM" BUILDING, 8/2 RUSSEL STREET, CALCUTTA 700071
POST BOX 411, CALCUTTA 700001

BRANCH

"CHANDER MUKHI", NARIMAN POINT, BOMBAY 400001
POST BOX 173, BOMBAY 400001

SF Marine representatives: ARGENTINE: G. Håkansson, Representaciones, Buenos Aires. AUSTRALIA: SF Australia Pty Ltd., Sydney. BELGIUM: Ventilation SF s.a., Brussels. CANADA: SF Products Canada Ltd., Montreal. DENMARK: SF Luftteknik A/S, Copenhagen. FINLAND: AB Finska Fläktfabriken, Helsinki. FRANCE: Ets Graneux SA, Marseille. GERMANY: R. Nocke Maschinenfabrik, Hamburg-Altona. GREECE: Dem. Hountoglou, Athens. INDIA: SF India Ltd., Calcutta and Bombay. ISRAEL: Jos. Muller, Representations Haifa. ITALY: Scatolpine Genova S.p.A., Genoa. JAPAN: Gadelius & Co., Tokyo and Kobe. MEXICO: SF de Mexico, S.A., Mexico City. THE NETHERLANDS: SF Lucht-en Warmtetechniek N.V. Amersfoort. NORWAY: A/S Norsk Viftefabrikk, Oslo. PORTUGAL: ESSEFE Ventilação Lda, Lisbon. SPAIN: Sociedad Española de Ventilación SF, Madrid. SWEDEN: AB Svenska Fläktfabriken, Gothenburg. U.K.: SF Air Treatment Ltd., Glasgow, U.S.A.: Arnesen Electric Co. Inc., New York. YUGOSLAVIA: Ventilator, Rijeka.

With Compliments from :

ALCO HEATING CO.

32/39, Tollygunge Circular Road.

Calcutta - 53

Manufacturers of Electrical Heaters

GRAM : ALHITCO

Phone : 45-8062 (Office)

44-8970 (Res.)

With the best Compliments of -

TRIO ENGINEERS

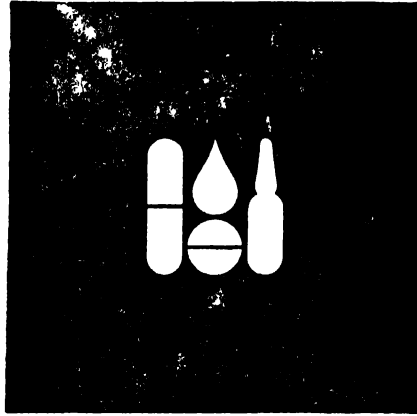
Mfg. Electrical Engineers.

2, Gagan Sarkar Road,
Calcutta—700010

GRAM : DHANSEEREE

Phone : 35-7287

এই প্রতীক কী এবং কেন?



**ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্—
সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে
উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও
সরবরাহ করে চলেছে।**

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে
ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্-এর কায়মনোবাক্যে
নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ
দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ঈ-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুন্সিমেস
একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ
এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা
কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের
ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে সুলভে
সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

**ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্
আপনার সেবায়**

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-১৯

With best compliments of :

WOOLCOMBERS OF INDIA LTD.

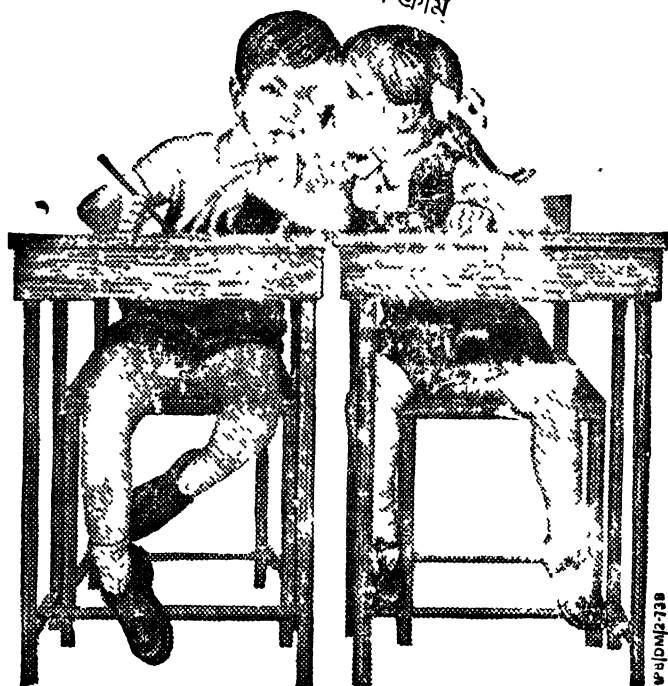
DUNCAN HOUSE Telephone : 22-6831 (20 Lines)
31, Netaji Subhas Road.
Calcutta—I Telegram : TLX 317 Woolcomber

Best Wishes for the Occasion .

FABRICATORS INDIA

GANGARAMPUR ROAD.
(P.O.) Raipur
24-Parganas

• ছটির পরেই
হিস ক্রীম
— আইস ক্রীম



(ভারকোরেট অফ ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রস্তুত।)

With the compliments of :

SPRITZ AUTOMATION (INDIA) PVT. LTD.

Manufacturers of Automatic Injection Moulding
Machines.

140, Asutosh Mukherji Road,
Calcutta—700025.

Phone : 47-0985
48-2433

With best compliments :

G. M. ENGINEERS

Manufacturers of Plastics & Mechanical Components

1A, Ramnoid Road
Calcutta-700025

Phone : 47-9385

রবি	১	৮	১৫
সোম	২	৯	১৬
মঙ্গল	৩	১০	১৭
বুধ	৪	১১	১৮
বৃহস্পতি	৫	১২	১৯
শুক্র	৬	১৩	২০
শনি	৭	১৪	২১



মধ্যমাসে অমাবস্যা

আমরা যারা নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ তাদের অনেকের প্রায় প্রত্যেক মাসে একই সমস্যা। প্রথমে দরাজ হাতে খরচ বা কিছু বাড়তি চাপ, তারপর মাস মেন আর শেষ হতে চায় না। তখন দু'তিনটে বিয়ের নেমন্তন্ন গেলেও মুক্তি। কিন্তু হয়। গুজোপার্বণ, উৎসব, অতিথিঅভ্যাগত আর লৌকিকতার দায় কখনো মাসের প্রথম বা শেষ বিচার করে আসে না।

সেজেনো ইউবিআই-তে একটা অ্যাকাউন্ট খোলা ভালো। মাসের প্রথমে টাকাটা ব্যাঙ্ক রেখে তারপর পরকায়মতো তুলে খরচ করুন। এতে সাত্রয় হবে, খীরে খীরে কিছু টাকা জমেও যাবে। তখন বাড়তি খরচের ধাক্কা নিজের সঞ্চয় থেকেই মেটাতে পাবেন। অসুবিধের পড়তে হবে না। টাকা ইউবিআই-তে রাখুন, বাড়িতে রাখলে টাকাতো কপূরের মতো উবে যেতে থাকে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

With best compliments from ;

RAMBAL AGENCIES

Mfs :

FIBREGLASS PRODUCTS, TANKLININGS ETC.

Office :

Factory :

**70, Paikpara Row. 1/4C, Khagendra Chatterjee
Road.**

Calcutta-700037

Shed No. 10.

Calcutta-700002

Phone : 23-7072

With best Compliments from :

MAX INDUSTRIES

3A, Pollock Street.

P. O. Box—870

Calcutta (India)

Fights Corrosion with G.R.P. Pipes, Tanks, Ductings.

Undertakes Lining jobs at site Polyester based or

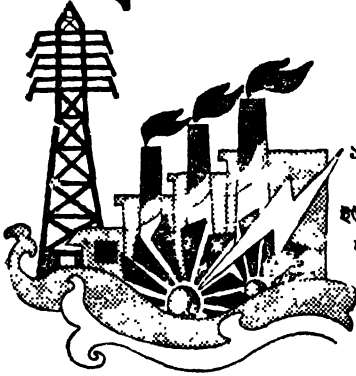
Epoxy based. Specialised in Compressor

Mouldings.

**Phone No. 22-6384
22-3873**

Gram : Fresh brew.

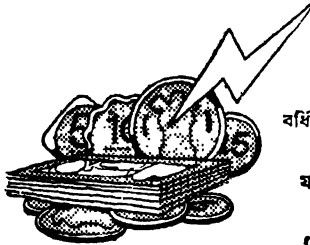
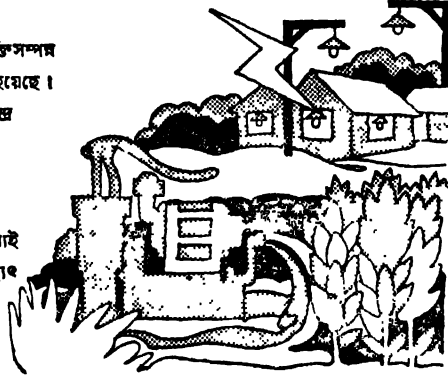
উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে...



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ এই রাজ্যে কৃষি, শিল্প, রেলচলাচল, গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এছাড়া, কলকাতার চাহিদা পূরণেও পর্ষৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে কলকাতার বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবিলায় ব্যাভেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারটি ইউনিটকেই বছরের অর্ধেক সময় অবিরাম চালু রাখতে হয়েছিল। সাঁওতালডিহি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও ইতিমধ্যে কলকাতায় বিদ্যুৎ সরাসরি আসছে ২২০ কেডি লাইনের মাধ্যমে। উত্তরবঙ্গে জলচাকা কেন্দ্র নির্ভরযোগ্যভাবে বিদ্যুৎ যোগান দিয়ে চলেছে।

প্রকল্প : ব্যাভেল ও সাঁওতালডিহি—এ দুটি কেন্দ্র বর্তমানে সম্পূর্ণসরিত হচ্ছে। এছাড়া কোলাঘাটে তিনটি ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন ইউনিট স্থাপনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। জলচাকা ও কার্শিয়াড়ের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ : ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১০,০০০টিরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই রাজ্যের ৭০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।



অর্থ : এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড়ের জন্যে পর্ষৎ আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে ফালানী, নাওল এবং অন্যান্য খাতে বর্ধিত ব্যয় সামান্য দিতে বিদ্যুতের হার লংশোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ঠিকমতো অর্থ যথাসময়ে পাওয়া যায়, তাহলে ৫ম পরিকল্পনার শেষে রাজ্যে ১০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির কাজ সমন্বয়তো শেষ করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ



Then you insist on the Best of Anything
Machining & Fabrication

The name to Remember

GHOSHAL ENGINEERING WORKS

Engineers & Contractors

P-5, Senhati,
Calcutta-700034

Twenty-five Cheers for as many Years

To:

SATABHISHA

from :

M/s. ELEMAC & S. T. S. INDUSTRIES.

241, Roy Bahadur Road,
Calcutta-700053.

প্রায়তে এসে টমাস বাটা অসংখ্য ছাত্র ও সংস্কৃত মনো বিখ্যাত এই পাণ্ডিত্য দেখানেন।... দেখানেন আজ লক্ষ হোক বাণী পায়ে চলাফেরা করে।



এদের জুতো পরাতে চাই

আমাদের কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা টমাস বাটা
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লক্ষ্য করেছিলেন
আমাদের দেশে অসংখ্য বাণী পা
ঢাকার জন্ম দরকার যান্ত্রিক উপায়ে
তৈরী প্রচুর জুতোর
আজ টমাস বাটার জন্ম শতবার্ষিকী
আমরা পালন করছি।
সেই সঙ্গে বাণীয়ে চলেছি
এমন দামে জুতো
লক্ষ-লক্ষ মানুষ যা কিনতে পারে।



Bata

ভালো জুতোর সেরেও ভালো

With the best compliments from :



Shivasakti Engineering Co.

FOUNDERS & ENGINEERS

42, Strand Road.

Calcutta—700007

With the best compliments from :



Caster & Moulder Of India Private Ltd.

MOULDERS OF NON-FERROUS METALS

105/2, ULTADANGA MAIN ROAD,

Calcutta—700004

With the best compliments from :

India Industrial Enterprises

A HOUSE FOR TOOL & ALLOY STEEL



40, STRAND ROAD, 4th FLOOR, SUITE No. 16/5

CALCUTTA—700001

PHONES : 22-7210/22-8047

Gram : INDUSTRIAL : Telex : 021-2419

Bombay Branch

188, NAGDEVI STREET, 2ND FLOOR,

BOMBAY :—400003

PHONE : - 326519

With the best compliments from :

Ganesh Transport Agency

P O. & VILL.—MAHESHTOLLA,
24-PARGANAS.

With the best compliments from :



A WELL WISHER



ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে
স্বাবলম্বী করে তুলতে
সাহায্য করছে

UCOC-2BR2BEN

BRU
taste!



rich satisfying
coffee taste

প্রকাশের পথে
একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

বিভাব

মননশীল কবিতা, দায়িত্ববান প্রবন্ধ এবং সত্য-অর্থের সমালোচনায়
পুটে এই পত্রিকাটি কয়েকদিনের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করবে।

সম্পাদক : মনীশ নন্দী

প্রকাশক : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

‘হীনযান’ আন্তর্জাতিক সংখ্যা

HEENAYANA—INTERNATIONAL

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একটি নির্ভরযোগ্য মানচিত্র এই সংখ্যায়
ইংরেজী রূপান্তরে ও আলোচনায় উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়াও
ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকটি অমূল্য প্রবন্ধ লিখেছেন
হালের কয়েকজন শক্তিমান বিদেশী পণ্ডিত-সমালোচক।

এই বিশেষ সংখ্যার সম্পাদনা করেছেন

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ চিত্র ডেসমণ্ড ডয়েগ

হার্ডবোর্ডে হৃদয় বাধাইযুক্ত ২০০ পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটির দাম ১০.০০ টাকা মাত্র।

চাকরি অথবা ব্যবসার তাগিদে ভারতের যে কোনো জায়গায় একটা ডেরা অথবা ভবঘুরের মতন সারা ভারত ভ্রমণ। এর যে কোন একটা আপনার ভাগ্যে রয়েছে। কিন্তু আদি চাকেক্ষরীর সারা ভারত থেকে সংগৃহীত শাড়ীর বৈচিত্রে আপনি পাবেন একটা স্বাদ যার মধ্যে রয়েছে সময় ও স্থানের এক অপূর্ব সমন্বয়। তা সে সময়কালের ডিজাইন বাংলার বালুচরী শাড়ী অথবা স্থানকালের আধুনিক নক্সার জোলুঘই বলুন। এতে আছে বেনারসী, কটকী, মাদ্রাজী, বাঙ্গালোর, কাজীভরম, আওরঙ্গাবাদ, গাদোয়াল, চান্দেরী, মহারাত্রী ও আরো কত কৃষ্টির সৌন্দর্য সুষমা।

গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ

কলিকাতা—৭০০০১৯

আপনাদের সেই চির আকাঙ্ক্ষিত, চির কৃতজ্ঞ

শ্রীনিভাইলাল সাহা

(আমাদের কিন্তু কোন শাখা নেই।)

শতভিষার কবিতার বই :

ভিনদেশী ফুল

(ফরাসী কবিতার অন্তর্বাদ)

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার

একস্মতু

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

রষ্টির শব্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়

প্রথম পুরুষ

অরবিন্দ গুহ

আজ চোখ মেলে

কুমার রায়

বিশুদ্ধ অরণ্য

আলোক সরকার



From The Gates of Paradise

Air
*On Cloudy Doubts and
Reasoning Cares*

William Blake

William Blake accompanied his etched words with etched and painted pictures : he called the process illuminated printing. Blake intended that his illuminated works should be looked at as well as read, but only now can his wish be fulfilled, with the publication of David V. Erdman's edition of the entire illustrated canon ; and the beginning of a series of Blake facsimiles. OUP's Blake list includes the following :

The Illuminated Blake. Ed. David V. Erdman Rs 92.57

Blake : Complete Writings. Ed. Sir Geoffrey Keynes Rs 84.15

The Marriage of Heaven and Hell (Colour facsimile). Ed. Sir Geoffrey Keynes
Rs 55.17/140.25

Songs of Innocence and Experience (Colour facsimile). Ed. Sir Geoffrey Keynes
Rs 55.17

Tiriel. Ed. C. E. Bentley Rs 74.80

A Choice of Blake's Verse. Ed. Kathleen Raine Rs 17.77

Blake's Illustrations to the Divine Comedy. Ed. A. S. Roe Rs 305.42

Blake's Illustrations to the Poems of Gray. Ed. I. Tayler Rs 235.00

The Notebook of Blake. Ed. D. V. Erdman & D. K. Moore Rs 299.20

Mona Wilson : **Life of Blake** Rs 32.73

Northrop Frye : **Fearful Symmetry** Rs 32.43

D. Wagenknecht : **Blake's Night** Rs 112.80

K. Raine : **Blake's Debt to Antiquity** Rs 37.13

D. V. Erdman & J. E. Grant (ed.) : **Blake's Visionary Forms Dramatic** Rs 188.00

K. Raine : **Blake and Tradition** (2 Vols) Rs 258.50

D. V. Erdman : **Blake : Prophet Against Empire** Rs 164.50

Andrew Wright : **Blake's Job : A Commentary** Rs 51.43

Geoffrey Keynes : **Blake Studies** Rs 130.90

G. E. Bentley : **Blake Records** Rs 187.00

M. D. Paley : **Energy and the Imagination** Rs 56.10

M. D. Paley and M. Phillips (ed.) : **William Blake : Essays in Honour of
Sir Geoffrey Keynes** Rs 196.35



Oxford University Press

P-17, Mission Row Extension, Calcutta 700013

কয়েকটি কবিতার বই

ষাট দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা
পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

নির্বাসন নাম ডাকনাম
কালীকৃষ্ণ গুহ

তোমার নিঃশব্দ ভরবারী
রথীন্দ্র মজুমদার

সামনে প্রিয়তম পথ
রাণা চট্টোপাধ্যায়

অনুভব অন্বেষণ পরিক্রমা
পার্থ রাহা

কফিন কিংবা স্ট্রটকেস
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

জয়ন্তীবর্ষে প্রকাশের পথে শতভিষার নতুন বই

অরুণ মিত্র

কবিতা কাহিনী ইত্যাদি : ফরাসী প্রসঙ্গ

ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক সমগ্র প্রবন্ধ সংকলন



দীপংকর দাশগুপ্ত

ছন্দ কবি কবিতা

প্রবন্ধ সংকলন



আলোক সরকার

মায়াকাননের ফুল

সমগ্র কাব্যনাট্যের সংগ্রহ

শতভিষা

রজতজয়ন্তী বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৮৩

একটি চিঠি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নন্দলাল বসু

শতভিষার পঁচিশ বছর

আলোক সরকার

প্রেক্ষিত

স্বরজিৎ বোষ

পঁচিশ বছরের এ্যালবাম্

পঁচিশ বছরে শতভিষার পাতায় প্রকাশিত কিছু

স্মরণীয় কবিতা ও গল্পের এলোমেলো ছবি

কবিতা

জীবনানন্দ দাশ অজিত দত্ত অরুণ মিত্র বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অরুণকুমার সরকার নবিশ গুহ অরবিন্দ গুহ শঙ্খ বোষ
আলোক সরকার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত দীপংকর দাশগুপ্ত
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত স্বধেন্দু
মল্লিক অমিতাভ দাশগুপ্ত তারাপদ রায় মঞ্জুশ্রী দাশ শান্তিকুমার
ঘোষ সামসুল হক দেবীপ্রদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন্দ্র আচার্য
পবিত্র মুখোপাধ্যায় কালীকৃষ্ণ গুহ রত্নেশ্বর হাজরা বুদ্ধদেব
দাশগুপ্ত পরেশ মণ্ডল অশোক দত্তচৌধুরী রাণা চট্টোপাধ্যায়
সুনীধ মজুমদার বখীন্দ্র মজুমদার পার্থ রাহা অশোক
চট্টোপাধ্যায় জ্বরত রুদ্র প্রমোদ বসু শেখর গঙ্গোপাধ্যায়
গৌতম বসু অভিরূপ সরকার স্বরজিৎ বোষ

বিশেষ নিবন্ধ চিঠিপত্র আলোচনা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রবোধচন্দ্র সেন শঙ্খ ঘোষ
দীপংকর দাশগুপ্ত আলোক সরকার
অভিরূপ সরকার সুরজিৎ ঘোষ

কবিতা বিকীর্ণ শিল্প

আলোক সরকার অলোকবজ্র দাশগুপ্ত শমীক বন্দোপাধ্যায়
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় যশোধরা বাগচী বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
রমানাথ রায় গোতম বসু সুরজিৎ ঘোষ অভিরূপ সরকার

শংকর চট্টোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বধেনু মল্লিক পবিত্র মুখোপাধ্যায় সুরত
সেনগুপ্ত কালীকৃষ্ণ গুহ পার্থ রাহা আশিস ঘোষ অশোক
দত্তচৌধুরী আলোক সরকার শংকর চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা

সুরজিৎ ঘোষ অভিরূপ সরকার

দাম : পাঁচ টাকা

এই চলার শিরায় উপশিরায় যে ছন্দ আছে তাই এ স্তম্ভ

চিত্ররূপময়

তখন ছুটির দিন। সেই সপ্তাহটি কিশোর খুশিটি তখন ফুলে পড়ে। শরতের ছুটিতে তার সে কি আনন্দ। জীবনভর জল না পেলে বাঁচে না। পাথরের থেকেও রস নিতে চায়, যে পাষাণের মঞ্চে সে বাঁধা থাকে তা থেকে। বিজ্ঞানস্নেহ গভীর ভিতরেই তখন তার খেয়ালখুশীর গান, সেই খেয়ালেই কখন সে আনমনে বাচ্ছিল পথ দিয়ে। এ দিকে শরতের রোদে তখন কী আলো কী বাহার। পৃথিবীর ছবি আঁকার সমস্ত সরঞ্জাম ঘরের ভেতরে ফেলে শুধু এক জোড়া আনন্দের চোখ নিয়ে জাপানী ঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। কে—না কতকাল আগে জন্মতারার একটি আলোকবিন্দু রওনা হয়েছিলো পথে, ঘাটে ঘাটে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তখনকার মত বাসা বেঁধেছিল সেই অবয়বে যার নাম অবনীন্দ্রনাথ। ছেলেটি পড়ে গেল তাঁর চোখে, মনের নজরে।

আঁখি যতজনে হেরে

সবারে কি মনে ধরে ?

একে বোধ হয় ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠলেন, “এই, শোন এদিকে।” সামনে গিয়ে গুটিগুটি দাঁড়াতেই বললেন, “কী গান গাইছিলি ? গা তো।” সিঁড়ির নীচের ধাপে বসে তখন ছেলেটির গান শুরু হল আবার।

এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ

এই যে পাতার আলো নাচে, সোনার বরণ

হৃদয়হরণ

কষ্ট তো কত। শরতের খোলা আকাশে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকায় যা কিছু তা কি সে জানত। মন বলে, “চোখ, তুমি ধরে রাখতে পার না।” গান শুনে তিনি টেঁচিয়ে উঠলেন, “ধরেছে, রবিকা ধরে ফেলেছে। আর তুমি কত চেষ্টা করছি, কিন্তু সবুজের উপরে সোনাটা কিছুতেই ধরতে পারছি না।” সেই বলায় কি কোন হুঃখ ছিল, কে জানে ? পরমুহূর্তেই আবার আনন্দে গলা বুজিয়ে বললেন, “গান শোনালি, তোকে এখন কি দিই ? হাতে ছিল চিঠির তাল্লা ; তার থেকেই একখণ্ড পোষ্টকার্ড দিয়ে বললেন, “এই নে তোদের মাষ্টারমশাই পাঠিয়েছে।” কী না তার এক পিঠে হুঁচকার লাইন, অল্প পিঠে পেন্সিল আর কলমের

আঁচড়ে একটি অপরূপ দৃশ্য—এক কোণে যার লেখা “On the way to Baroda” এই চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি নন্দনের অমৃতধারায় যার স্নান সারা হয়েছিলো জন্মের আগেই। ঐ কিশোরের মত তিনি কতজনেরই তো মাষ্টারমশাই, তাঁদের চোখের তারায় সৃষ্টি করার রঙ মেশানোর কাজে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর কাছে তিনি ছাত্র, শুধু নন্দলাল, নন্দলাল বহু নন। বরোদা থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন কুশল সংবাদ দিয়ে আর পথের সংগ্রহ একটুখানি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর মাষ্টারের কাছে। দিগন্তের কোল ঘেঁষে কারা ফেরে। ‘স্মৃতি জাগায় বহুকাল আগের। মন চায় বাড়ী ফিরতে। স্বপ্নে দেখে বহুকাল আগের ছেড়ে আসা বাড়ি ঘর ঘাট মাঠ গাছ।’ অনেক দিনের পুরোনো ছবি, কবে এই যাত্রা শুরু হ’য়ে ছিলো, এখন বড়ছুট। ধীরে ধীরে ঝাপসা হ’য়ে আসছে রঙ। তাই কালো কার্লতেই ছাপিয়ে দিলুম সেই চিঠি, নাকি ছবি। সময় ছাড়া এর গায়ের রঙ চড়ায় কার সাধ্য। আর নীচে দেওয়া রইল এই গল্পের কিশোর আর এই চিঠিতে লেখা সব সাক্ষ্যপাত্রদের পুরো নাম।

বিস্ত—বিশ্বরূপ বহু।

মাসোজী—বিনায়ক রাও মাসোজী।

জয়ন্ত—জয়ন্ত দেশাই।

সুখময়—সুখময় মিত্র।

গুপ্ত—দেবীপ্রসাদ গুপ্ত।

মধুকর—মধুকর শেঠী।

শান্তি—শান্তি বহু।

সেই কিশোরটি—বিশ্বজিৎ রায়।

স্মরণজিৎ ঘোষ

২৬শে বৈশাখ ১৩৮৩

রবিবার। কলকাতা।

শতভিষার পঁচিশ বছর

আলফা কাফে নয়, ‘শতভিষা’র প্রথম পরিকল্পনা হয়েছিলো রাসবিহারী আর মহীশূর রোডের মোড়ের এক ছোট্ট চায়ের দোকানে। সেই চায়ের দোকান আর নেই, সেখানে এখন ঘড়ি মেরামতের দোকান। বসন্ত যারা এই পরিকল্পনা করেছিলো, সেই দুজন অতিরিক্ত যুবক, যারা তখন পর্যন্ত ভোটের অধিকার পায়নি, তারাও বোধহয় আর নেই; সেই সময় নেই, সেই অস্থিত উদ্দীপনা নেই। আলোক সরকার তখন সত্য বি. এ. পাশ করা বেকার যুবক, দীপংকর দাশগুপ্ত পুরোপুরি বেকার নয়, দৈনিক ‘গণবার্তা’য় সাংবাদিকতা-বিষয়ে শিক্ষানবিশী করে মাসিক দশ টাকা হাতখরচ পায়। সকালবেলায় এলোমেলো ভ্রমণ, সঙ্গে তরুণ মিত্র, শংকর চট্টোপাধ্যায়, অজিত বক্সী, অশেষ চট্টোপাধ্যায়, বিমল রায়চৌধুরী সত্যেন্দ্র আচার্য, বিকেলবেলায় আড্ডা জমে আলফাতে। সুরু গলির মতো ছোট্ট এক চায়ের দোকান, দিনের আলো ফুরতে-না-ফুরতে সেইখানে এসে হাজিরা দেয় উজ্জল নয়ন, আদর্শনিমগ্ন তরুণেরা—সেইখানে কবি আছে, গল্পকার আছে, চিত্রশিল্পী আছে, ললীতজ্ঞ আছে, রাজনীতিজ্ঞ আছে, আছে এমনকি খুন-জখম-ওস্তাদ গুণ্ডা। সকলেই অপ্রতিষ্ঠ, সকলেরই চোখে স্বপ্ন, বৃকে অতৃপ্তি কিন্তু হতাশা নয়, হতাশাজনিত অবসাদ নয়, বিদ্বেষ নয়, চণ্ডা বৃকে সবকিছুকেই গ্রহণ করতে হবে, থোলা চোখে যা-কিছু দেখার আছে দেখতে হবে। সে এক উদ্দীপ্ত সময়, মাঝে-মাঝে উৎসবের সময় বলে মনে হয়, মহীশূর রোডের মোড়ের চায়ের দোকানের মতো সেই সময়ের মাছঘেরা কোন ঘড়ির দোকানের শিকার হলো, ভাবি।

সবকিছুই পরিবর্তনশীল কিন্তু মহীশূর রোডের মোড়ের সেই চায়ের দোকানে ‘শতভিষা’র প্রথম পরিকল্পনার সময় আমরা যে উদ্দেশ্যের দ্বারা অল্পপ্রাণিত হয়েছিলাম তার মৌল কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। কবিতার কাগজ বের করতে হবে যার লক্ষ শুধু কবিতাই। কবিতার কাগজ বের করতে হবে কেবল আধুনিক কবিতার জন্য—আধুনিকতা অর্থাৎ প্রবাহমানতা,

শতভিষা

যে প্রবহমানতাকে মেনে নিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি বারেবারেই ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত নতুন, সেই ব্যক্তিকতাই হবে আমাদের অধিষ্ট। ‘শতভিষা’ তরুণ কবিদের মুখপত্র নয়; প্রবীণ কবিদের মুখপত্র নয়, কবিতার ব্যাপারে বয়স-বিচার হাশ্বকর; ‘শতভিষা’ কবিতারই মুখপত্র, যে কবিতা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে না, ফ্যাশনের দাসত্ব করে না, হুজুগে মাতে না, যে-কবিতা ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত, একই সঙ্গে সৌন্দর্যময় অপূর্ব এবং অ-পূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমতার প্রজ্ঞা প্রমাণ করতে সক্ষম। আমাদের পরিকল্পনা এইরকম কিন্তু সেই পরিকল্পনাকে কেমন ক’রে রূপ দেবে এই নিয়ে সেই দিন দুইজন তরুণ বিশেষ ভাবিত হয়েছিলো। প্রথম প্রয়োজন অর্থের, ঠিক হলো কাগজ বার হবে এক ফর্মার অর্থাৎ ডিমাই সাইজের ষোলপাতার, খরচ পড়বে সবমিলিয়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। টাকা সংগ্রহ হবে কেমন ক’রে? দীপংকরের মাসিক দশ টাকা আয় আছে, আমার পোস্ট-অপিসে দশ টাকার একটা অ্যাকাউন্ট ছিলো তার থেকে পাঁচ টাকা তোলা গেলো, তরুণ মিত্র দিলো তিন টাকা, সত্যেন মুখোপাধ্যায় তিন টাকা, রণজিৎ সেন তিন টাকা—চব্বিশ টাকা দিয়ে কাজ শুরু হলো।

আলফা বাফের অধিকাংশ সদস্যকেই জানানো হ’লো না ব্যাপারটা, আমরা গোপনে কাজ করতে থাকলুম, উদ্দেশ্য একদিন সকলকে চমক দেওয়া যাবে। দীপংকরের সঙ্গে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় আছে, তাঁর কাছ থেকে একটি কবিতা সংগ্রহ করা গেলো, অরুণকুমার সরকারের একটি কবিতা চুরি করলুম, তরুণ মিত্র অশোক মুখোপাধ্যায়ের মাস্টার-মশাই নরেশ গুহ, তাঁরও একটি কবিতা পাওয়া গেলো। যুগলকান্তি, এখন পরমানন্দ সরস্বতী, তিনি আমাদের বিশেষ পরিচিত, গৌতম রায় তার একটি কবিতা নিয়ে এলো। অরবিন্দ গুহ, যিনি কেবল আলফা ক্যাফেই নন, বাংলাদেশের তৎকালীন তরুণ কবিদের মধ্যে সবচাইতে প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত, কিছু না জানিয়েই তার কাছ থেকে একটি কবিতা নিয়ে নিলুম। পাওয়া গেলো কল্যাণ সেনগুপ্তর কবিতা, পূর্ণেন্দুবিশাশ ভট্টাচার্যের কবিতা, ইন্সুলের ছাত্র মানস রায়চৌধুরীর কবিতা। আলফা ক্যাফের অনেক ভিড়ের মধ্যে তখন একজন তরুণ, নাম শংকর চট্টোপাধ্যায়,

শতভিষা

আসতেন। বাইরে শুনেছি সে নাকি ভীষণ দামাল ছেলে কিন্তু আলফা কাকের এককোণায় চূপচাপ বসে থাকতো, কখনো আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সাহিত্যালোচনা করতো। আন্ততঃ কলেজের পত্রিকায় একটি গল্প ছাপা হয়েছে, কবিতা-টবিতা লেখার অভ্যাস আছে বলে জানি না। একদিন রাতে, ল্যাম্পডাউন বোডের ল্যাম্পপোস্টের আলোর নীচে লজ্জা-লজ্জা মুখে আমাকে একটি কবিতা দেখালো, স্বরচিত কবিতা। কিছু না বলে কবিতাটা নিয়ে নিলুম, ‘শতভিষা’র প্রথম সংখ্যায় ছাপতে হবে;

এ-সব ১৯৫১ সালের ঘটনা, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা। ‘শতভিষা’র প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলফা কাকের হৈ-হৈ পড়ে গেলো, আমাদের অগ্রজ কবিতা, আলফা কাকের বাইরের তরুণ কাঁবরা অভিনন্দন জানালেন। সাহায্যের জন্তে এগিয়ে এলেন অনেকে, শংকর তো আছেই সঙ্গে সন্তান আচার্য। ছোট্ট এক ফর্গার কাগজ, ওপরে প্রেস থেকে ধার করা ব্রকের ছবি, স্বচাপিত নেই, পাতার নম্বর নেই তবু তার প্রতি অসংখ্যের প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। অগ্রজদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ নানা পরামর্শ দিলেন, সক্রিয় সহযোগিতা করলেন। মনে আছে ঢাকায় পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন নরেশ গুহ, পত্রিকার ছাপা কেমন করে ভালো করা যায় সে-বিষয়েও সুপরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর সন্তান দত্ত বোডের বাড়িতে আমি আর দীপংকর দীর্ঘসময় কবিতা নিয়ে আলোচনা করতুম।

‘শতভিষা’র সমস্ত পরিকল্পনাটাই দীপংকর দাশগুপ্তের। খরচের টাকা যেমন প্রায় সবটাই তিনি দিতেন, সেই রকম ‘শতভিষা’র প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন তিনিই। আমি প্রধান পরামর্শদাতা, সঙ্গে তরুণ মিত্র। কবিতা-ব্যাপারে আমার সঙ্গে দীপংকরের মতের অমিল প্রায় ঘটতোই না, আজ পর্যন্ত সেই অবস্থা অটুট আছে। তরুণ মিত্র, আমাদের মধ্যে সবচাইতে পণ্ডিত ব্যক্তি, বিদেশী সাহিত্য-বিষয়ে আমাদের সবসময় ওয়াকিবহাল রাখতেন। ‘শতভিষা’র পরিচালনা ব্যাপারে ভিতরের দিকে আমরা এই তিনজন বাইরের দিকে অগ্ণ্য কবি এবং অকবি বন্ধুর শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতা।

শতভিষা

সবচাইতে বেশি মনে পড়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনি কেবল ‘শতভিষা’র প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিই নন, প্রথম থেকেই তিনি ‘শতভিষা’র আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে। বীরেন্দ্রের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমরা লেখা সংগ্রহ করতাম তৎকালীন প্রবীন কবিদের, বীরেন্দ্রাই আমাদের নিয়ে যেতেন জীবনানন্দ দাশের কাছে, বিষ্ণুদের কাছে। বীরেন্দ্রের স্মৃতিতেই আমাদের যোগাযোগ ঘটে ক্রান্তিপ্রসঙ্গের সঙ্গে, সেখানে অল্পটাকায় ‘শতভিষা’ ছাপার বন্দোবস্ত করে দেন তিনি। শুভ্রত আছে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা বীরেন্দ্রের, ‘শতভিষা’কে তিনি সহজেই আপন ক’রে নিয়েছিলেন। ঠিক এইরকমই ‘শতভিষা’র নিকটজন ছিলো শংকর চট্টোপাধ্যায় আর সত্যেন্দ্র আচার্য। প্রেস ছাপার কাজে দেরি করলে শংকর আছে, কাগজগুলা পত্রিকা বিক্রির টাকা না দিতে চাইলে শংকর আছে। নতুন লাজুক প্রকৃতির কিন্তু ‘শতভিষা’র প্রচারের ব্যাপারে অর্থাৎ স্টলে কাগজ দেওয়ার ব্যাপারে (যে কাজে আমার বা দীপংকরের কোন যোগ্যতাই ছিলো না) বরাবরই উৎসাহী কর্মী। আর একজনের কথা মনে পড়ছে, অতীব তরুণ প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘শতভিষা’ তার কাছ থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছে।

‘শতভিষা’ প্রকাশ হবার কিছুদিনের মধ্যেই ‘শতভিষা’র মতো ক্ষুদ্র আকারের ঘোলা পাতার কবিতার কাগজ পরপর অনেকগুলি প্রকাশিত হলো। রোহিণী চক্রবর্তীর ‘কবিতা পত্রিকা’, সত্যেন্দ্র আচার্য অমিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘সব শেষের কবিতা’ ভূমেন্দ্র গুহরায় স্নেহাকর ভট্টাচার্যর ‘ময়ূখ’। আক্ষয়িক অর্থে বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের সূত্রপাত হলো। কিছুদিন পর একটু বড়ো আকারে প্রকাশিত হয়েছিলো আনন্দ বাগচী দীপক মজুমদার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘কৃত্তিবাস’। ‘শতভিষা’ প্রকাশের পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ঘোলা পাতার কবিতার কাগজ কতো যে প্রকাশিত হয়েছিলো তার হিসেব-নিকেশ করে কুলিয়ে ওঠা যাবে না। আজ আর এ-কথা স্বীকার করতে কষ্ট হয় না, পঞ্চাশের পর বাংলা দেশের কবিতা আন্দোলন এই সমস্ত ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে, কোনো বাণিজ্যিক পত্রিকার সহায়তা লাভ অথবা মুখ্যপক্ষী হবার প্রয়োজন অসম্ভব করেনি।

১৯৫১ সালে কেন আমরা ‘শতভিষা’ প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম সে

শতভিষা

আলোচনা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তা বিশেষ সময় এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ। আমি যা বলতে চাইবো তার অপক্ষে সব দলিল-টিক এইমূহর্তে উপস্থিত করতে পারবো না, যখন পারবো তখন বিষয়টি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করবো। এখন কেবল এইটুকু বলি, ‘শতভিষা’, কেবল ‘শতভিষা’ নয়, এইধরনের ক্ষুদ্র কবিতা পত্রিকাগুলির প্রয়োজন তখন অপরিহার্য ছিলো। ‘শতভিষা’ প্রকাশের আগে বাংলা দেশে মাত্র দু-টি কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হতো—একটি বুদ্ধদেব বহুর ‘কবিতা’ অপরটি শুদ্ধসব বহুর ‘একক’। বুদ্ধদেব বহু-র ‘কবিতা’ পত্রিকা, যার প্রতি তৎকালীন তরুণ কবিদের শ্রদ্ধা এবং আস্থা গভীর ছিলো, সেই সময় তা-ও আর নতুন কবিদের কাব্যভাবনা এবং কাব্যকলা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলো না, সেই সময়কার তরুণ কবিদের কবিতার সংকলন ‘সমকালীন বাংলা কবিতা’র সমালোচনায় নতুন যুগের সঙ্গে ‘কবিতা’ পত্রিকার ব্যবধান স্পষ্ট হয়। অবশ্য তরুণ কবিরা অনেকেই ‘কবিতা’-র লেখক ছিলেন, এমনকি ‘শতভিষা’ যে-সমস্ত তরুণ কবিদের রচনা প্রকাশে আগ্রহী ছিলো তাদের লেখাও মাঝে-মাঝে প্রকাশিত হ’তো ‘কবিতা’য়। কিন্তু বুদ্ধদেব বহু-র ‘কবিতা’ সেই ধরনের কবিতা বিষয়েই পক্ষপাত প্রমাণ করতো যা তিরিশের দশকের কবিদের-ই প্রতিধ্বনি, নতুন কোনো কাব্য আন্দোলন যে শুরু হ’তে পারে এমন ধারণা ‘কবিতা’ পত্রিকার ছিলো না। এই অবস্থায় ‘শতভিষা’ যা আধুনিকতাকে প্রবহমানতা-র অর্থেই এক দিক থেকে গ্রহণ করেছিলো, তার প্রকাশ যে বিশেষ প্রয়োজনের ছিলো সেটা বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু এ সব আলোচনা অনেক তর্ক-বিতর্কের ব্যাপার, আমি আবার ‘শতভিষা’র ঘরোয়া আলোচনায় ফিরে যাই। আমার ইচ্ছে ছিলো ‘শতভিষা’র প্রসঙ্গে তৎকালীন বাংলা কবিতা বিষয়ে একটা দীর্ঘ আলোচনা করবো—তৎকালীন কবিদের ছন্দ-বিষয়ে উন্মুখর আগ্রহ, শব্দ-বিষয়ে একনিষ্ঠ পরিশ্রম, পূর্ববর্তী কালের কবিদের ঘোঁনকাতরতা, মূল্যবোধে অনাস্থা, ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ, অতিরিক্ত সমাজ-ভাবনা, তরল কাব্যময়তা ইত্যাদি লক্ষণগুলির সমগ্র পরিহার—এইসব প্রবণতা-গুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবো কিন্তু তা করতে হলে অনেক বড়ো প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন, আমি বরং আপাতত ঘরোয়া কথাতাই ফিরে যাই।

শতভিষা

১৯৫১-এর সেপ্টেম্বরে ‘শতভিষা’র প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়, তার ঠিক তিনমাস পরেই দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হলো। প্রথম দিকে আমরা নিয়মিত ছিলাম। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদপট রচনা করলেন অশেষ চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পাওয়া গেলো; পুরোনো আনন্দবাজার পত্রিকার আপিসে গিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করলুম, ব্যস্ত থাকায় তিনি কবিতা দিতে পারলেন না, কিন্তু প্রচুর উৎসাহ দেখালেন ‘শতভিষা’ বিষয়ে। দ্বিতীয় সংখ্যায় আরো অনেক নতুন কবি এলো—বটকৃষ্ণ দে, রবীন্দ্র বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র আচার্য, কবিতা সিংহ ইত্যাদি।

‘শতভিষা’র তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের আগে দীপংকর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কাছে কবিতা চেয়ে একটি চিঠি লেখে। অলোকরঞ্জন তখন ‘দেশ’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক, আমাদের সঙ্গে আলাপ নেই কিন্তু আমরা সকলেই তার রচনার বিশেষ অহুরাগী। দীপংকরের চিঠি যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে কবিতা এলো, “আমার ঠাকুমা”। মনে আছে, পাণ্ডুলিপি দেখতে দেখতে দীপংকর সঙ্গ্রহসম মন্তব্য করেছিলেন, ‘ভংসনা’ বানানে ‘ং’র মাথার উপর রেফ ব্যবহার করেছে। এই বকমই ছিলুম তখন আমরা। বানান বিষয়ে অতি সচেতন, ছন্দ শব্দ বিষয়ে অতি সচেতন। কিন্তু সংস্কারাবদ্ধ নয়। একই সঙ্গে বিদ্রোহী এবং শিকড় সচেতন। বানান বিষয়ে ছন্দ বিষয়ে দীপংকর চিরদিন কট্টর আধুনিক কিন্তু সেই আধুনিকতা কোনো উন্মত্ততা নয়, যুক্তিবহু শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রমঅগ্রসরমানতা, নির্বোধ অশিক্ষিত ভেঙেচুরে দেবার প্রয়াস নয়। মনে আছে, একবার অলোকরঞ্জন ‘বাণী’ বানানে দীর্ঘ ই কার ব্যবহার করেছিলেন, ছাপাবার সময় দীপংকর ত্রুষ্ ই ক’রে ছাপেন। এইনিম্নে ওদের দুজনের মধ্যে খুব সাময়িক ছোটো-খাটো একটা মনোমালিঙ্গের সৃষ্টি হয়।

আমরা চাইতুম জীবনানন্দ দাশ বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব বসু সঞ্জয় ভট্টাচার্য আমাদের পত্রিকায় কবিতা তিখুন কিন্তু কাছে গিয়ে কবিতা চাইবার সাহস হ’তো না। ল্যান্ডাউন রোডে জীবনানন্দ-র বাড়ির সামনে দিয়ে আমরা দিনে অন্তত আটবার যাওয়া আসা করতুম কিন্তু ভিতরে যেতে ভয় হতো। তখন তরুণ কবিদের কাছে জীবনানন্দের কবিতা মন্ত্রের মতো, তা একই

সঙ্গে আচ্ছন্ন করে, উদ্দীপ্ত করে। অহুপ্রেরিত করে। সেই সময় দীপংকরকে আমি বলেছিলুম, জীবনানন্দর কবিতা আমি পড়তে চাই না, তা আমার ভিতরের সব ঘর বাড়ি গ্রাস করে। সেই সময় আর একজন কবি ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। একই রকম প্রতিপত্তি, একই রকম প্রভাববিস্তার। জীবনানন্দ অমিয় চক্রবর্তী বিষু দে, আমরা এঁদের যেমন শ্রদ্ধা করতুম, ঠিক সেই রকমই এঁদের প্রভাব-বিষয়ে সতর্ক থাকতুম। ১৯৫১—৫২ সাল, তখনও স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত তরুণ কবিদের কাছে বিশেষ আলোচিত নাম নয়, বুদ্ধদেব বহুর কবিতা যে কোনো কারণেই হোক তরুণদের তেমন আলোড়িত করতো না।

জীবনানন্দর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে-যেতে একদিন সাঁহস করে এগিয়ে যাওয়া গেলো। সন্ধ্যা গলে দিয়ে ঢুকে দরজার কড়া নাড়তে বেরিয়ে এলেন উঁচু ক'রে কাপড়-পরা, কাপড়ের খুঁট গায়েজড়ানো এক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। এই জীবনানন্দ দাশ, রাসবিহারী এভিনিউ-র পথে অসংখ্যবার দেখেছি, কাপড়ের কঁচা শক্ত হাতে ধ'রে আড় চোখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে পথ চলছেন। 'শতভিষার' জন্ত কবিতা চাইতে বজ্রেন, আর কে কে লিখেছে, প্রেমন লিখেছে? আমি বললুম, উনি তো কবিতা আর তেমন লেখেন না, গান লেখেন। শুনে দেড় মিনিট ধ'রে এক অলৌকিক হাসি হাসতে থাকলেন, সে হাসিতে সমস্ত শরীর কাঁপে, দাঁত দেখা যায় না। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে গভীর গলায় বজ্রেন, এক সপ্তাহ পর কবিতা দেবো।

ঠিক এক সপ্তাহ পরেই দিয়েছিলেন। আমরা যতোবার তাঁর কাছে কবিতা চেয়েছি, কখনো ফেরাননি। শেষ দিকে আমাদের সঙ্গে মোটামুটি চেনা-জানা হয়ে গিয়েছিলো, শংকরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা; প্রায়ই বাড়ি দেখে দেবার কথা বলতেন, কদাচিৎ কবিতার কথা।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। প্রথম কবিতা খুব সহজে পেলেও জীবনানন্দর কাছে কবিতা চাইতে যেতে আমাদের ভয় করতো। দ্বিতীয়বার কবিতা চাইতে যাওয়ার আগে আমরা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিলুম। বীরেন্দ্র কিছুদিন আগে জীবনানন্দ বিষয়ে একটি ছোট মন্তব্য লিখেছিলেন। দেখানে জীবনানন্দর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ফাঁকে 'লোকটা যে

শতভিষা

দেখতে হাবাগোবা, আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিস্বহীন' এ-কথাও ছিলো। আমরা জীবনানন্দর বাড়িতে এলুম, বীরেনদা সঙ্গে আছেন বলে একেবারে বাড়ির মধ্যে, এর আগে জীবনানন্দ গলির মুখে দাঁড়িয়েই কথা সেয়ে নিতেন। আমরা ঘরে বসে আছি, একটু পরে জীবনানন্দ ঘরে ঢুকলেন, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত গামছা, খালি গা, হু'হাতে হু'বালতি জল। জল ঘরের কোণে রেখে আমাদের কাছে জানতে চাইলেন, কী চাই, বীরেনদার দিকে ফিরেও তাকালেন না। আমরা তাঁর হাতে 'শতভিষা' দিয়েছি, বীরেনদা আমাদের সঙ্গে জীবনানন্দর ভালো ক'রে পরিচয় করিয়ে দেবার জ্ঞা এগিয়ে এলেন, কী বলতে চাইলেন, আর সেই মুহূর্তেই বিস্ফোরণ ঘটলো। 'শতভিষা'গুলো ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিয়ে জীবনানন্দ বীরেনদার দিকে প্রায় তেড়ে এলেন—'আমার ব্যক্তিত্ব নেই! কী লিখেছেন আপনি? জানেন আমি বাইশ বছর অধ্যাপনা করছি।' বীরেনদা বোঝাবার চেষ্টা করছেন, জীবনানন্দর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যে কতোটা নিবিড় সে-কথা বলছেন, কিন্তু ক্ষিপ্ত, প্রায় উন্মত্ত জীবনানন্দ। তারপর হঠাৎ শান্ত হলেন, নিজেই 'শতভিষা'গুলো কুড়িয়ে নিলেন ঘরের মেঝে থেকে, বস্ত্রেন, সাতদিন পরে এসো, কবিতা দেবো।

সাতদিন পরেই দিয়েছিলেন। আর কবিতা দেওয়ার পর পাঁচ মিনিট, যদি না তার বেশি হয়, মুখ বন্ধ ক'রে, সারাশরীর কাঁপিয়ে হেসেছিলেন। হাসির কারণ কি? দীপংকর বলেছিলো, উনি বলতে চাইছেন, কেমন দেখলে আমার ব্যক্তিত্ব!

বিষ্ণুদেব-র বাড়িতে যেতেও আমাদের কম ভয় ছিলো না। বিষ্ণু দে জীবনানন্দ-র ঠিক উল্টো। সাজানো ঘর, সুন্দর শোভন সাজপোশাক। বিষ্ণুদেও আমাদের কখনো নিরাশ করেননি, যখন কবিতা চেয়েছি, দিয়েছেন। যেমন বুদ্ধদেব বসু। প্রফ দেখাবার কঠোর নির্দেশ থাকলেও কবিতাভবন থেকে কখনো খালি হাতে ফিরিনি।

'পূর্বাশা' আপিসে গিয়ে সঙ্ঘর ভট্টাচার্যের লেখা নিয়ে আসতুম। শান্তি-নিকেতনে চিঠি পাঠিয়ে সুনীলচন্দ্র সরকারের। প্রথম দিকে মণীন্দ্র রায় ছিলেন আমাদের নিয়মিত লেখক যেমন ছিলেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। ১৯৫২ সালের শেষদিকে 'শতভিষা'র পঞ্চম সংকলন প্রকাশের আগে আমরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শতভিষা

নামের একজন কবির কবিতা পাই। তাঁর নাম আগে কখনো শুনিনি কিন্তু কবিতা পড়ে দীপংকর উচ্ছ্বসিত। এরপর থেকে যখন-ই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা এসেছে, দীপংকরের সমান উচ্ছ্বাস দেখেছি। কিন্তু ঠিক এই বকম হয়নি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বেলায়। 'শতভিষা'র অগ্ৰ পাঠানো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা দীপংকর প্রকাশ করতে ঠিক সম্মত ছিলো না। আমি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে। কবিতাটি 'শতভিষা'র প্রকাশ হবার অনেক দিন পরে কথাপ্রসঙ্গে শক্তি একদিন বলেছিলেন ওটি তাঁর তৃতীয় ছাপা কবিতা। শঙ্খ ঘোষের কবিতা 'শতভিষা'র অনেক পরে ছাপা হয়। আমরা তাঁর কবিতা পেতে চাইতুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিলো না, তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করতে করতেই 'শতভিষা'র অনেকগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে গেলো। প্রথমদিকে আমাদের পত্রিকায় প্রায়ই লিখতেন শিবশঙ্কু পাল মোহিত চট্টোপাধ্যায় আর শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। ফণিভূষণ আচার্যের কবিতাও 'শতভিষা'র প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছিলো। অগ্ৰ একটি পত্রিকায় ফণি লিখেছেন ওটি তাঁর প্রথম ছাপা কবিতা।

উৎপলকুমার বসুর যে সব কবিতা 'শতভিষা'র প্রথম দিকে ছাপা হয় তা পড়ে আজকের দিনের পাঠক উৎপলের কবিতা বলে চিনতেই পারবে না। উৎপল মহিলার ছদ্মনামেও 'শতভিষা'র কবিতা লিখেছেন। বিনয় মজুমদার 'শতভিষা'র একেবারে শেষদিকে 'শতভিষা'র কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং প্রচুর লেখেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'শতভিষা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিলো না। পরিচয় হয় ১৯৫৩-র শেষের দিকে। এবং এর-ই কাছাকাছি সময়ে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত-র সঙ্গে। আলাপ হবার পর তাঁরা দু'জনেই 'শতভিষা'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'য়ে ওঠেন। ১৯৫৪ থেকেই প্রণবেন্দু 'শতভিষা'র নিয়মিত লেখক, কেবল লেখকই নন, 'শতভিষা'কে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তিনি। ১৯৫৪-৫৮, 'শতভিষা'কে ঘিরে আছে অলোকরঞ্জন, প্রণবেন্দু, তরুণ মিত্র দীপংকর আর আলোক সরকার। লেকের পাড়ে, দেশপ্রিয় পার্কের মাঠে, অলোকের ষাটবপুরের বাড়িতে তখন নিয়মিত বৈঠক। প্রণবেন্দু তখন কলেজের নিচু ক্লাসের ছাত্র, 'শতভিষা'র প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা আলোক সরকারকে

শতভিষা

উৎসর্গ করা হয়। সেই কবিতার শেষ লাইনে ‘কাম’ শব্দটি ছাপার ভুলে ‘কাজ’ হয়ে যায়। প্রণবেন্দুর ধারণা সেটি ইচ্ছাকৃত। ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কোনো ভিত্তিই নেই।

এ-ঘটনার উল্লেখ এ-কারণেও প্রয়োজন যে ‘শতভিষা’ সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে—‘শতভিষা’ ইন্দ্রিয় বিশেষ ক’রে প্রথম ইন্দ্রিয়-উত্তেজক কবিতার বিরোধী। তা একেবারেই নয়। ‘শতভিষা’ কেবল মনে করতো, কবিতা রচনায় কোনো একটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া নিরতিশয় নিবৃদ্ধিতা, কবিতা সবকিছু নিয়েই লেখা চলে। তাছাড়া তিরিশের চল্লিশের কবিদের রচনায় ‘কাম’ বিষয়টি এতো বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যে ‘শতভিষা’ তা নিয়ে আর তেমন উৎসাহবোধ করতো না। কবিতার অগ্রগতির জ্ঞান নতুন, নতুন এবং ব্যক্তিগত চিহ্নিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, শতভিষা এটা বুঝেছিলো। কাম বিষয়ে তার অনীহা ছিলো না; অতিরিক্ত উৎসাহও ছিলো না যেহেতু বিষয়টি ব্যবহারে ব্যবহারে হেজে মজে গিয়েছে। বস্তুত প্রণবেন্দু সেকথা যে জানতেন না, এমন নয়। কবিতাকে আরো বড়ো উন্মুক্তির পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা তখন দিবারাত্র ইউরোপের, বিশ্বের কাব্যচিন্তা, কাব্যধারার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করছি—ভালোরি আমাদের মাতাচ্ছে, রিলকে আমাদের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে, মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে মালার্মের কাব্যাদর্শই বুঝি একমাত্র। প্রণবেন্দু, অন্তত আলোক সরকারকে এ-বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, প্রণবেন্দুর মনে থাকতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর নাম মনে পড়ছে, তাঁর কাছেও ‘শতভিষা’ বিশেষভাবে ঋণী। ১৯৫৬-এ ‘শতভিষা’র প্রথম কবিতা প্রকাশের পর থেকেই সমরেন্দ্র আড়াল থেকে ‘শতভিষা’কে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি নিজে এই নিয়ে বিশেষ আলোচনা করার বিপক্ষে, আমিও আর কিছু লিখলুম না। কুমার রায়ের সহযোগিতার কথাও এই প্রসঙ্গে ‘শতভিষা’ স্মরণ করছে।

১৯৫৩-র মাঝামাঝি সময় থেকেই আলফার আড্ডা ভাঙতে শুরু করে। আমরা একে একে এসে আশ্রয় নিই লেক মার্কেটের দোতলার এক রেইটুরেন্টে। সে আড্ডাও বেশিদিন টেকে না, দোকানটাই উঠে যায়। পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আর তেমন একত্র হই না, কিছুটা আত্মকেন্দ্রিকতা, কিছুটা জীবিকা অর্জনের তাগিদে সকলেই নানাদিকে বিন্ধিত। ‘শতভিষা’ তখনও

আমাদের অনমনীয় উৎসাহে প্রকাশিত হচ্ছে, বছরে চারটের জায়গায় বছরে দুটো। পুরোনো বন্ধুদের ফাঁক পূরণ করছেন নতুন বন্ধুরা, এলেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিছুদিন পর তারাপদ রায়। ১৯৫৭ সালে তারাপদ রায়-র প্রায় গ্রাম্য অমার্জিত ব্যবহারে আমরা তাকে একটু ভয়-ই পেতুম কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারাপদ আমাদের নিবিড় বন্ধু হলেন। সেই সময় তারাপদ-র মতো মূক্তপ্রাণ জীবনময় ব্যক্তি খুব কমই ছিলো। শংকরের মতো, কবি-বন্ধুদের প্রয়োজনের সময় সাহায্যের ভক্ত তারাপদ নিজেই এগিয়ে আসতো, তাকে অহুরোধ করার দরকার হ'তো না। তারাপদের মধ্যবর্তিতাতেই আলাপ হয় সুধেন্দু মল্লিকের সঙ্গে, 'শতভিষা'র সঙ্গে সুধেন্দুর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের নিজের পত্রিকা ছিলো, 'কবিপত্র', কিন্তু 'শতভিষা'র সঙ্গে তারও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আন্তে আন্তে আরো তরুণ নবীন কবিদের ভালোবাসায় 'শতভিষা' সমৃদ্ধ হয়—মৃণাল দত্ত, আশিস সান্মাল, রত্নেশ্বর হাজরা, কালীকৃষ্ণ গুহ, অশোক দত্তচৌধুরী, পুন্ডর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সুনীথ মজুমদার, রথীন্দ্র মজুমদার, স্বরত রুদ্র, রাণা চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। 'শতভিষা'র প্রতি মৃণাল দত্তের নীরব ভালোবাসার পরিচয় 'শতভিষা' অনেকবার পেয়েছে। কালীকৃষ্ণ, অশোক, সুনীথ, রাণা, রথীন, বুদ্ধদেব এরা 'শতভিষা'র একান্ত আপনজন। কালীকৃষ্ণর ভালোবাসার উষ্ণতা 'শতভিষা'র কাছে প্রেরণার মতো কাজ করেছে। ১৯৬৫, শতভিষা আর একজন তরুণ কবির ভালোবাসা পেলো, পার্থ রাহা। পার্থ যে-ভাবে 'শতভিষা'কে সাহায্য করেছে তেমন ক'রে খুব বেশি তরুণ কবি করেনি। পার্থ 'শতভিষা'র অনলস স্বার্থহীন কর্মী, নিকট আত্মীয়। পার্থই নিয়ে যায় ভুলবাবুর প্রেসে। ভারী হৃদয় মিষ্টি মানুষ ছিলেন ভুলবাবু, তার সঙ্গে আর দেখা হয় না।

১৯৫৫—৫৬ সালে 'আধুনিক কাব্য পরিচিতি' সিরিজ নাম দিয়ে 'শতভিষা' অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে। অরবিন্দ গুহ স্বকুমার রায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত শান্তিকুমার ঘোষ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পাঁচজনের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একই সময়ে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং আলোক সন্নকায়ের 'ভিনদেশী ফুল'ও প্রকাশিত হয় 'শতভিষা' থেকে। পরে 'শতভিষা' থেকে প্রকাশিত হয় রথীন রাণা কালীকৃষ্ণ আলোক সন্নকায়ের কবিতার বই।

শতভিষা

১৯৬৪ সালে ‘শতভিষা’র উদ্বোধনে কাব্যনাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সবশুদ্ধ আমরা সাতটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম। নীরঞ্জন চক্রবর্তী ‘প্রথম নায়ক’, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ‘উত্তর মেঘ’, দীপক মজুমদারের ‘বেদানার কুকুর ও অমল’, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ‘হিনাব’, আলোক সরকারের ‘অশ্ব গাছ’ ও ‘মায়াকাননের ফুল’ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘কাঁকি’। এই নাটকগুলি অভিনয়ের ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন সমীর ঘোষ। সাতটি নাটকের ছটিরই পরিচালক ছিলেন তিনি, অলোকরঞ্জনের নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

১৯৬৪-তে ‘শতভিষা’ নতুন উত্তমে বার করবার চেষ্টা করি। পত্রিকার আকার অনেক বড়ো, পরিকল্পনাও বিস্তৃত। দীপকর তরুণ তো আছেই, প্রণবেন্দু সমরেন্দ্র কুমার রায়ও সাহায্যের জ্ঞাত এগিয়ে আসে। এইভাবে কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তারপর ১৯৬৮-তে অভিরূপ এসে ‘শতভিষা’য় যোগ দেয়। অভিরূপ ইস্কুলের ছাত্র কিন্তু তার সক্রিয় সাহায্য না পেলে ‘শতভিষা’ তখন প্রকাশ করাই সম্ভব ছিলো না। আমি ভিতরে ভিতরে তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। প্রকৃত দোষ প্রেসে দৌড়োদৌড়ি অভিরূপ ছাড়া আর কেই-বা করবে! এইভাবেই কয়েকবছর এবং আমার ক্লান্তি আমার অবসাদ আবেগ ঘনীভূত। ঠিক সেই সময় এলো তরুণ কবি স্বরঞ্জিত ঘোষ, যে না এলে ‘শতভিষা’র প্রকাশ চিরদিনের জ্ঞাতই বন্ধ হয়ে যেত। স্বরঞ্জিতের সঙ্গে ‘শতভিষা’র পরিচয় করিয়ে দেন অলোকরঞ্জন, তার দু-একটি কবিতা ‘শতভিষা’য় প্রকাশিত হয়েছে, সেই ‘শতভিষা’র সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলো, সঙ্গে অভিরূপ। এ-কাজ এ-কিছু যেমন সাহসের, তেমনি ‘শতভিষা’র প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসাও প্রমাণ করছে। ‘শতভিষা’ তাদের শ্রম এবং আন্তরিকতায় যে ক্রমশই পরিণত সার্থক হয়ে উঠছে এ-কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমরা যা চেয়েছিলাম অথচ পারিনি, স্বরঞ্জিত-অভিরূপ আমাদের সেই স্বপ্নকেই সফল করে তুলছে।

‘শতভিষা’র প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর পঁচিশ বছর পার হয়ে গেলো, ‘শতভিষা’র বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে। অনেক আনন্দ অনেক সার্থকতা অনেক বেদনা অনেক ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে এই দীর্ঘ সময় পার

শতভিষা

হওয়া। সে আলোচনা করতে চাই না, নতুন সম্পাদকদের হাতে ‘শতভিষা’ আরো অনেক দিন এবং আরো সুন্দর হয়ে প্রকাশিত হবে, সন্দেহ নেই। আমরা যতদিন ‘শতভিষা’ প্রকাশ করেছিলুম তার সত্যিকারের কোনো সার্থকতা কোথাও আছে কিনা জানি না, কেবল এটুকুই বুঝতে পারি আমাদের যতো সাধ ছিলো সাধ্য ততোটা ছিলো না। অল্প পরিসর, অনিয়মিত প্রকাশ এইসব কারণে কোনো কবির প্রতিই আমরা অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে পারিনি। এ ছাড়া ‘শতভিষা’র বিলি ব্যবস্থা বিশেষ দুর্বল ছিলো, কোনো রকম অতিকথন অমিতকথন পছন্দ না করায় ‘শতভিষা’ কোনোদিনই যাকে বলে হৈ হৈ তা করতে পারে নি। এই কারণেই হয়তো অনেক কবি, যাঁরা ‘শতভিষা’কে প্রথম দিকে আশ্রয় করেছিলেন, ‘শতভিষা’র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, পরে অগ্রত্ৰ চলে গেলেন। তবু গোপনে সকলেই ‘শতভিষা’কে ভালবাসে, ‘শতভিষা’ এটা জানে, আজ রজত জয়ন্তী উৎসবে শতভিষা তাদের ভালোবাসাকে স্বরণ করছে।

আলোক সরকার

প্রেক্ষিত

‘শতভিষা’র পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। তার তেইশ বছর বয়স থেকে সম্পাদক হিসেবে আমাদের নাম যুক্ত—অভিরূপের আর আমার। ভালোবাসার যজ্ঞগার মধ্যে যে আনন্দটুকু বিধে গিয়ে তিরতির ক’রে কাঁপছে, তাকে কি ক’রে বোঝাই?

প্রকাশ এখনও অনিয়মিত, কিন্তু নিয়মিত প্রকাশ করতে গিয়ে যেমন তেমন সংকলন বার ক’রলে বোধহয় ভালো হতো না।

শংকর চট্টোপাধ্যায় চলে গেলেন। এই সংখ্যায় তাঁর নামে প্রকাশিত সংযোজনে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে, কবি জানিয়েছেন সেটি লিখবার সময়ে তাঁর সামনে শংকর ছাড়া আরও কয়েক জনের মুখ এসেছিল প্রসঙ্গত।

কিছু পুরোনো ছবির এলোমেলা সংগ্রহ “পঁচিশ বছরের অ্যাল্‌বাম”। অনেক ধুলো পড়লেও বোঝা যায় সে কত দামি ছিল। এতে শংকর চট্টোপাধ্যায়ের যে কবিতাটির ছবি আছে তা শুধু তাঁর প্রথম প্রকাশিত নয়, প্রথম রচিত কবিতাও বটে।

একই দহনের আত্মীয়তায় অধিত বিভিন্ন শিল্প-মাধ্যমের উপরে একটি বিশেষ প্রবন্ধ-সংযোজন ‘কবিতা বিকৌণ শিল্প’।

এবারের ‘কবিতা’ সংগ্রহের কবি-নির্বাচনে পঁচিশ বছরের স্মৃতি প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। দুঃখ রয়ে গেল, অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে উৎপল কুমার বসু বা বিনয় মজুমদারের কবিতা সংগ্রহ ক’রতে না পারার জগ্ন।

পত্রিকার চারিত্রিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখতে নিয়মিত বিভাগগুলি সবই রইল। সঙ্গে রইল দুটি বিশেষ রচনা।

নন্দলাল বসুর চিঠিটির জগ্ন কৃতজ্ঞতা বিখজিৎ রায়-এর কাছে। চিঠিতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের পুরো নাম ব’লে দিয়ে অশেষ উপকার করেছেন শ্রীমতী ইন্দুলেখা ঘোষ। সম্পূর্ণ এই সংখ্যাটির জগ্ন কৃতজ্ঞতাভাজন সমস্ত বন্ধুজন। সবচেয়ে বেশী বোধ হয় শ্রীপার্থ রাহা।

স্বরজিৎ ঘোষ

পঁচিশ বছরের অ্যালবাম

পঁচিশ	বছরে	'শতভিষা'র	পাতায়	প্রকাশিত	কিছু
স্মরণীয়	কবিতা	ও	গল্পের	এলোমেলো	ছবি

শতভিষা

সময়ের হাতে তিরিশের দশকের কবিদের ব্যবহৃত কৌশলগুলির দিন যে ফুরিয়ে গিয়েছে 'শতভিষা' তা উপলব্ধি করেছিলো। তিরিশের দশকের কবিদের যৌন-কাতরতা, মূল্যবোধে অনাস্থা, ব্যঙ্গ-বিদ্রোহ, অতিরিক্ত সমাজ-ভাবনা, তবল কাব্যময়তা ইত্যাদি আপাত-লক্ষণগুলি যে আর ব্যবহৃত হবার নয় এ-সত্য অভ্রান্ত ভেনে কবিতার মুক্তির জন্য শতভিষা প্রয়োজন অস্বস্তব করেছিলো নতুন পথ-সন্ধানের। 'আধুনিক ক্লিসে'গুলি পরিত্যাগ করে কবিতার শরীরে নতুন প্রাণস্পন্দন আনার প্রচেষ্টাই ছিলো 'শতভিষা'র প্রথমতম দাবি।

[সম্পাদকীয় (অংশ) : শতভিষা : ত্রয়োবিংশ সংকলন : ১৩৭২]

কে এসে যেন অন্ধকারে জালিয়ে দিয়ে বাতি
বলে আমার অপার আকাশবলয় থেকে স্বাতী
তোমার ঘরে এসেছে আজ নেমে ;
তবুও দূরে স'রে গিয়ে তুমি
হারিয়ে যেতে চাও কি আত্মপ্রাণে ঘুরে ফিরে ?
অথবা জনগণসেবার ভিতরে শিশিরে
লুপ্ত ক'রে দেবে কি জ্ঞানকামীর মরুভূমি ?
সবের উপর সত্য আগুন—অমেয় মোম শুধু ;
আর সকলই শূন্য আশা, অন্ধ অহুমিতির মত ধু-ধু।

[কে এসে যেন : জীবনানন্দ দাশ : শতভিষা : অষ্টম সংকলন : ১৩৬০]

শোনো তবে সই শৈবলিনী
আমি প্রিয় স্বামী নই বলিনি,
আমি ত কুমার তোমার চুমার প্রতাপ কতো
সইব বলোনা শৈবলিনী
কপালকুণ্ডলারে চায় শিখী চণ্ডত্রত
কাপালিক তার হও নলিনী।

হতে যদি তুমি শৈবালিনী !
বৈশালী-বালী কই, মালিনী
মলিন কল্যা হরিং বন্যা অঙ্ককারে
কই সে হৃদয় শৈবালিনী
দ্বীপের দীপ্তি চোখের প্রদীপ বন্ধ দ্বারে
শ্রীনাগলক্ষ্মী, বৈকালিনী !

হায় বৈশাখী শৈবালিনী
ভক্ষণীলার রসী বলিনী
কোথায় আষাঢ়-আকাশের দ্যুতি-পবন-জালা
শৈলশিখরে শৈবালিনী
কেন এ প্রেমের আয়াস আয়েষা যবন বাল
হংস-বলাকা-সাধ, দলনী ?

[বাঁকাজাল : সঞ্জয় ভট্টাচার্য : শতভিষা : পঞ্চম সংকলন : ১৩৫২]

আমার কৈশোরে একদল পাশ্চাত্য দার্শনিক ‘স্পীশস্ প্রেসেন্ট’ নাম দিয়ে এক চির-মুহূর্তের কল্পনা করতেন ; এবং আমাদের চেতনা সেই রকম সর্বময় নিমেষে অহরহ আবদ্ধ। তাতে যা কিছু প্রত্যক্ষ, তা তো আছেই, যা দূর, যা অনাগত, যা অতীত, তাও অন্তত ভাবচ্ছবিরূপে উপস্থিত ; এবং সেই ‘অবিকল’ লহমী আর সোহংবাদীর লিপিসিদ্ধি বোধহয় এক। তবে তার মধ্যে আমরা খুঁচী হয়ে থাকতে পারিনা : চাঁদ যার সঙ্গে কল্পনা বা বিকল্পনার সম্পর্ক সর্ববাদীসম্মত, সে আমাদের প্রলুব্ধ করে ; সূর্য যার মরীচিকা থেকে উপনিষদের ঋষিরা বাঁচতে চেয়েছিলেন, সে আমাদের বাইরে ডাকে ; অসম্ভূত অমায় নীহারিকা রটায় নতন সৃষ্টির বারতা ; এবং বিজ্ঞানী বলেন যে আমাদের অস্ত্রে ও নাড়ীতে ধরা পড়ে ভূত থেকে ভবিষ্যতে উধাও কালের পদক্ষেপ। কিন্তু নিজের নাড়ী বা অস্ত্রের দোলকে কালযাত্রার পরিমাপ আমাদের চৈতন্যগত নয়, এবং অঙ্কবিশ্বাসের বশেই আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে তথা ভূত প্রকৃতির মধ্যে গতির ও কালান্তিপাতের সম্মান পাই। উপরন্তু সে-সম্মানের শেষেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাক্ষাত নেই,

শতভিষা

আছে বিমূৰ্ত প্রত্যয়, কিংবা ভাবচ্ছবি। তাহলে চির-মূৰ্ত্তে আঁটকে থাকতে
লোহংবাদীর আপত্তি কি ? এবং সে ভোলেই বা কেন যে সে কণ্ঠস্থায়ী, তথা
নান্তিরই অংশভাক্।

[একটি চিঠি (অংশ) : স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত : শতভিষা : পঞ্চত্রিংশ সংকলন : ১৩৭৩]

কোথায়, কোথায় তুমি ? আনন্দের আবেশে তোমার

মাতাল, অথচ মোর ক্রীণ প্রাণে আধার ঘনায়।

মনে হয়, এইতো এখনই আমি

ভুনেছিছ কেমন সোনালী স্বরে কিশোর পুষ্প

তুলেছেন সাক্ষাত্তর পরিপ্লুত স্বর্গীয় বীণায়,

চারিদিকে অরণ্যে শিখরশৈলে তুলে প্রতিধ্বনি।

কিছু দূরে, বহুদূরে, সেখানে তন্ময় সাধকেরা

আজো তাঁর পূজা করে এইমাত্র গিয়েছেন চ'লে।

[ছেণ্ডারলিন অবলম্বনে, স্মৃতিস্মৃত : বুদ্ধদেব বসু : শতভিষা : ষাটশ

সংকলন : ১৩৬১]

কাঙালী ! কাঙালী !

কাছারি, বাজারে, দণ্ডয়ে

মূলধন কী লোভে ভাঙালি ?

মাঠের মোড়ক চলে খুলে,

টিলায়, সমানে, জলকূলে,

এখনো অনেক জায়গা খালি,

কাঙালী, কাঙালী !

অ-সনাক্ত শাক, পাতলা ফুল,

কড়াই, খেজুর, জাম, কুল—

শতভিষা

র'য়েছে গাছের গেরস্থালি
কাঙালী, কাঙালী !

রোদে সেকা, ভেজা, হিমে কাঁপা,
বৃহৎ দিবস রাত ষাপা...
কি হবে গঞ্জের চতুর্বাণি,
ফিরে যা কাঙালী !

ওরে ফেল, ফেল এঁটোপাতা,
তোরে কিছু দিয়েছে বিধাতা—
নর্দমায় নাই বা আঁচালি,
হায়রে কাঙালী !

বৈচে যা উদার বে-দখলে
মরে যা পতিতে স্বচ্ছলে—
ঠিক তোকে নেবে মাটি বালি,
ওরে ও কাঙালী !

[কাঙালী : সুনীলচন্দ্র সরকার : শতভিষা : একাদশ সংকলন : ১৩৬১]

.....গদ্যের পক্ষে বাগ্‌ভঙ্গির অহুসরণ যতখানি প্রয়োজন, পত্নের পক্ষে তার থেকে আরও বেশী প্রয়োজন,.....
.....ছন্দোরচনার উদ্দেশ্য হল বিবিধ উপায়ে প্রস্বর, বতি, মাত্রা ও মিল স্থাপনের দ্বারা ভাষায় একরকম তরঙ্গভঙ্গি বা স্পন্দলীলা (rhythm) উৎপন্ন করা। এই স্পন্দলীলাই ছন্দের প্রাণ। দেখা গিয়েছে ছন্দোরচনায় নির্দিষ্ট নিয়মকানুন না মেনেও কবিতার ভাষায় ছন্দের স্পন্দনটুকু রক্ষা করা যায়। এই প্রকার ছন্দো-বদ্ধহীন স্পন্দনময় ভাষাকে গুচ্ছই বলতে হয়, পদ্য বলা যায় না। তথাপি একটু শিথিল পরিভাষায় কবিতার ভাষায় এই স্পন্দভঙ্গিকেই বলা হয় 'গুচ্ছ কবিতার

শতভিষা

‘ছন্দ’, সংক্ষেপে ‘গগুছন্দ’। এইরকম স্পন্দনময় গগুভাষাতে কবিতারচনার রীতি প্রচলিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে।

[বাংলাছন্দের ক্রমবিকাশ (অংশ) : প্রবোধচন্দ্র সেন : শতভিষা :

ত্রিচত্বরিংশ সংকলন : ১৩৮২]

চেয়েছি আলোর ঘরে এই দিন

দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে—প্রীতা,

মাধুর্য সংসারে মঙ্গলিতা

এই দিন।

সানাই নাই বা থাকে, রঙিন পত্ৰালি শ্লোকধ্বনি,

জেরেনিয়মের সারি, নীচে রাস্তা, কার্নিসের কোণ ঐ জেগে

নীলাক্ষী দিগন্তে ফুল-তোলা

নাইলন জরির পাড় মেঘে মেঘে,

গুঞ্জনিত এরোপ্লেনে দূরদেশী—

তোমার নতুন লগ্ন হোক।

এই দিন

পার হয়ে বহুশ্রুতি জনতার কোটি চিত্রলোক

জটিল সহর চাক শাস্ত মুখে ;

দেশের চন্দনৌ ধূপ-লাগা

প্রবাসী আশ্চর্য খনে

সোনার চাবিতে মনে মনে

দুজনে দরজা খুলো :

সবুজ দেয়ালে শব্দ আঁকা

ইলেকট্রিক আলো নীল সিলে চাকা

অভিনন্দিত ছোট ঘরে :

শতভিষা

উন্মুক্ত সেখানে জেনো এই দিন

চিরদিন,—শ্রিতা,

যুগ্মতারা জলজল

তোমার সংসারে মঙ্গলিতা ।

! [ইয়ং কল্যাণী অজরা মর্ত্য অমৃত গৃহে—অথর্ববেদ : অমিত্র চক্রবর্তী :

শতভিষা : দশম সংকলন : ১৩৬১]

অনেক দিনের চেনা সে আমার মন

জানি তার প্রায় নিজেই হৃদয় সম

যতো কিছু কথা শুনেছি দূর আপন

মধুরতম তো তারই, সেই প্রিয়তম

কাছে যবে থাকে, তবু থাকে কতোদূরে

দূরে যবে যায়, কাছের হাওয়ায় নিশিদিন রাখে ভ'রে

আকাশ যেমন ফাস্তনে সুরে সুরে ।

কতোকাল চেনা, তবুও জানা অশেষ

প্রতিদিন তার—আমারও রূপান্তরে,

আমাদের প্রেমে দৌহার কাল ও দেশ ।

আমাদের প্রেম খরতোয়া আর দুই পাড়ে ধারে ধারে

বটের ছায়ায় গ্রামে হাটে বাটে কখনো পাহাড়ে কোথাও শহরে

কোথাও বা প্রান্তরে

এ-জীবনে বুঝি চেউ ভেঙে ভেঙে ফুরায় না তাই বেশ ।

আমার জীবন বেঁধেছি তো তার ঘাটে

[আলোধ্য (৩) : বিষ্ণু দে : শতভিষা : অষ্টম সংকলন : ১৩৬০]

শতভিষা

তাহলে কেন তিনি এই কঠিন শিল্পের পথ বেছে নিয়েছেন, কেন পুরুষের সম্মান ও রীতি গ্রহণ করেছেন, এই প্রশ্ন আমার মনে অনিবার্য হয়েছিল। কেন নিজেকে পুরুষের সমভূমিতে দাঁড় করানো, পুরুষ ক্ষমতার সঙ্গে টক্কর দেবার জন্তে নিজের শিল্প-প্রতিভাকে কেন দুর্গমে নিয়ে যাওয়া? তাঁর রমণী-সন্তায় কোথায় এই বৈপরীত্যের ভিত? একি কোনো প্রতিবাদ? মানবিক স্তরে তাঁর জীবনের ইতিহাস গুনবার জন্তে আমি উৎকর্ষ হয়েছিলাম। স্বভাবতই আমার পক্ষে তখন তা শোনা সম্ভব ছিল না এবং তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হবার সম্ভাবনাও ছিল না। অতএব আমি কল্পনা করেছিলাম...রাসাতলে যাক আমার কল্পনা, যেখানে রক্তের অতল ঘূর্ণি সেখানে সে কোথায় থই পাবে? আমায় শুধু এইটুকুই বলার যে, সেই সন্ধ্যার কাককক্ষে শিল্পের গুণ সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়ে ওঠা সত্ত্বেও আমাকে বেশী নাড়া দিয়েছিল শিল্পী। সে কি আমি শিল্প ঠিক বুঝিনি ব'লে, না শিল্পের চেয়ে মানুষ আমাকে বেশী স্পর্শ করেছিল ব'লে, করে ব'লে?

[কেন এই কঠিন পাথর (অংশ) : অরুণ মিত্র : শতভিষা :
দ্বিচত্বারিংশ সংকলন : ১৩৮২)]

‘শতভিষা’ নামক ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রটির কয়েকটি সংখ্যা একসঙ্গে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে বিশেষ শক্তি সঞ্চয় ক’রে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে।...এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে ‘শতভিষা’র অন্তর্গত কবিতাগুলি থেকেই বাছাই ক’রে যদি একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহলে বাংলা কবিতার যে স্বতন্ত্র ধারার কথা আমি উল্লেখ করেছি তা পাঠক-সাধারণের কাছে স্পষ্টতর হবে। আপাতত এই গোষ্ঠীর কয়েকজনের প্রতি আমার উৎসাহ না দেখিয়ে পারছি না। যে-কজন কবির কথা উল্লেখ করবো, লক্ষ্য করবার বিষয় তাঁদের কাকুর রচনাতেই জৈব-যন্ত্রণা নেই, অথচ একটা মৌল জীবনবেদনায় তা ওতোপ্রোত। আধুনিক জীবনের বাইরের উপকরণ—যন্ত্র, শহর, শোষণের সংগ্রাম, বিকৃত যৌনাকাজ্ঞা ইত্যাদি এদের কাব্যের উপজীব্য নয়। অথচ একটা স্বস্থ মানব-সম্বন্ধের উদ্ভাপ এদের কবিতায় সার্বজনীন।

স্পষ্টতই সমাজের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, অল্প এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের যোগস্থ খুঁজে পেয়েছেন। কোন উৎস থেকে, কীভাবে—সেটা সমাজ-তাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় হতে পারে কিন্তু নিঃসন্দেহেই এটা চোঁচিয়ে বলবার মতো একটা সঙ্গুণ। যাঁদের যৌবনকাল অসার রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনায়, অনেক অবদমন এবং ততোধিক অপচয়ের বিশৃঙ্খলায় সংশয়ে যন্ত্রণায় অপব্যয়িত হয়েছে, একালের তরুণ কবিদের প্রশান্তি তাদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এঁদের রচনার সম্মুখীন হলে বুঝতে পারা যায় স্বাভাবিকতার কোনো স্থির সংজ্ঞা নেই; সভামিছিল এবং শায়াশেমিঞ্জের পিছনে ছোটাই সকলকালের সব যুবকের স্বধর্ম হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে একালের কবিরা কেউই কিছু চিন্তাহীন আশাবাদ নিয়ে বোকার স্বর্গে বাস করছেন না, মনের যে অস্থখ না থাকলে কবিতাই লেখা যায় না তার লক্ষণ এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিগ্ৰহমান, এবং এঁরা কেউই ভূদেব মুখুজ্যের নতুন সংস্করণ নন। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির ভিতর দিয়ে আগের যুগের কবিরা যেখানে এসে পৌঁছেছিলেন, কালধর্মে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার অস্থকূলতার সেখান থেকেই এঁদের যাত্রা শুরু হয়েছে। তাই আধুনিক হবার প্রয়োজনে এঁদের কাউকে নালা-নর্দমায় নান করতে হয়নি, নৌকো পুড়িয়ে দেবার ভান করতে হয়নি, আশ্রয় নিতে হয়নি উপরচালাকির।

[বাংলাকবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা (অংশ) : অরুণকুমার সরকার :

শতভিষা : অষ্টাদশ সংকলন : ১৩৬৩]

পাষাণে বুক রাখিস, কল্যাণি

তুনিম মন্ত বাঘিণী ডাকে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত

দেখিস জীবন-মরণ লড়াই রক্তমাখা পায়ের ছাপ ;

বুক জুড়ে তোম তবু তৃষ্ণার জল

নরখাদক পশুর রক্ত ধুয়ে।

[নদী : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শতভিষা : সপ্তত্রিংশ সংকলন : ১৩৭৬]

শতভিষা

তুমি ফল পাবে ব'লে
এই বৃক্ষ রোপন করছি।
যখন সবুজ পাতা
ঝিকমিক ক'রে উঠবে
শীতশেষ নরম বোদ্দুবে
তখন থাকবো না আমি
তুমি থাকবে, বাতাসও থাকবে,
ক্ষণিক অচেনা পাখি
ডালে ব'সে ফের উড়ে যাবে।
রোজ একটু জল দিও গাছে,
জল দিও।

[আমার ছেলেকে—১ : অরুণকুমার সরকার : শতভিষা : উনচত্বারিংশ
সংকলন : ১৩৭৮]

একই ভাষায় রচিত দুটি রচনার, অথবা একই ভাষাভাবী দুটি সামাজিক
গোষ্ঠীর কিংবা পরিবারের বা ব্যক্তির ভাষার, কিংবা দুটি উপভাষার যে
পার্থক্য তা কমবেশী উপরের স্তরের। দুটি ব্যক্তির ভাষা যত বিভিন্নই হোক না
কেন যদি তাদের ভাষার অন্তর্গত নিয়মগুলি 'এক' থাকে, তাহ'লে তাদের ভাষাও
এক। এই অন্তর্গত নিয়মগুলিই, যাকে ভাষার ভিতরের স্তর বলেছি তার ভিত্তি।
অন্তর্গত নিয়মগুলি লজ্জিত হ'লে 'ভাষা' কাজ করে না, ভাষার নমনীয়তা তার
উপরের স্তরেই। ভাষার উপরের স্তরের বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্গত নিয়মগুলি
প্রতিফলিত হয়ে থাকে—ভাষার উপরের স্তর তার ভিতরের স্তরেরই রূপান্তর, যা
বলা যায়, ভিতরের স্তর থেকেই উপরের স্তরের বৈচিত্র্য জন্মলাভ করে বা উদ্ভূত
হয়। যেহেতু চিন্তা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ভাষা নিরপেক্ষ না, একটি ভাষা-
সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের বিশ্বজনীন সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গিও সেই ভাষার
অন্তর্গত নিয়মগুলির দ্বারা প্রভাবিত।

[ভাষা : শিল্পের উপাদান (অংশ) : দীপকর দাশগুপ্ত : শতভিষা :
উনচত্বারিংশ সংকলন : ১৩৭৮]

শতভিষা

শিশিরের জল মেখে পথ হেঁটে বিকেল পেলাম

ওগো মেয়ে কাছে তো এলাম ।

এত কাছে আমার নিখাস ঘন জন্মির আঁচল টেনে

বুকে পিঠ দিলে ।

তারপর রাত এলে, নক্ষত্রের ইশারায় চিনে

ওগো মেয়ে, তোমার বিশীর্ণ কোলে মাথা গুঁজে নীলমনে গাঢ়

ঢেউ তুলে

স্বাভী বিশাখার হাওয়া ঝরে গলে তোমার নিঃশ্বাসে

ঘাসেদের ঘুম পেলে আর যদি তোমার শিথিল দেহে

ঘুম নামে মেয়ে

সেইক্ষণে চিন্তা দিও ওগো মেয়ে, চিন্তা দিও আমার হৃদয়ে

সেই চিন্তা ঠোঁটে গুঁজে, ভাবি ঘেন, বিকেলটা কত আগে ছিল ।

[তোমাকে তোমাকেই : শংকর চট্টোপাধ্যায় : শতভিষা : প্রথম

সংকলন : ১৩৫৮]

যদিও শরীর কৃষ্ণাশাড়িতে ঢাকো,

সুদূর দুচোখে কাজলের রেখা আঁকো,

নগরাস্তরের ঠিকানার ঘরে থাকো,—

তুমি বিচিত্র ভূষার সরোবর ।

সরোবর নও ? হয়তো আমার তুল ।

কপালে লুটায় চূর্ণ চূর্ণ চুল ।

উপহার দেবে উপমার শাদাফুল

তোমাকে আমার বিনীত কণ্ঠস্বর ।

[স্বর্গের স্বাক্ষর (অংশ) : অরবিন্দ গুহ : শতভিষা : সপ্তম সংকলন : ১৩৬০]

পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে-থাকা,

ত্রিঙ্গণ্য রুট যখন ভ্রূহুক্ষিত,

পাতাহীন শিউলি-ডালে একলা-একা

পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে-থাকা ।

শতভিষা

চারিদিক ঘুরিয়ে মারে একই ঘনি
আবেগের, অনাবেগের ; এমন কি আজ
বাসনা বাসনা নয়, আশ্লেষেও
নতুনের আশ্বাদ নেই, উষ্ণ প্রথা ;
প্রজনন প্রজ্ঞাপালন যুদ্ধ এবং
সনাতন যুদ্ধরতি, অস্ত্রভাষা ;
পাতাহীন শিউলিগাছের থিন্ন শাথে
পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে-থাকা ।

[পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা : আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত :
শতভিষা : ষট্‌ত্রিংশ সংকলন : ১৩৭৪]

লম্বক ঘরের পাশে আমবাগান, শোনো
তুমি এমন চারলক্ষ সমুদ্র জালিয়ে না ।
সাতলক্ষ সমুদ্রের অবিনীত বিবেকী বিদ্রোহ
ঘরের আসবাব সব অহরহ খানখান করে । আমার সান্ত্বনা
তোমার-ই মাটির বুকে ছিলো । দীর্ঘ সমারোহ
ছায়ার দয়িত্র ভীক সংসারে রেখেছ । সেইখানে শিশুর মতন
সকলের মমতা কাড়ে অবিমিশ্র হাসির ঘোঁতুকে
আজো সে সম্পন্ন শিউলি । শিউলির মালার নিজর্ন
বইএর আলমারি তার ওপারের দেয়ালের বুকে
সঠিক রেখেছিলুম । তুমি ভুল বুঝে
প্রতিবাদী গুরুত্ব চাঁৎকারে সেই নিবিড় সংসার
এবং সে শিশুটিকে অকারণ অপমান করে ।
আমার ঘর-ও ভাঙে, ভাঙে তার সবল আকার ।

[আর্তি : আলোক সরকার : শতভিষা : বিংশ সংকলন : ১৩৬৪]

কবিতা ঘটেছে বহু নানাদিকে । কিন্তু খুব অল্প কবিকেই
বাবার চিকিৎসার অস্ত্র হাসপাতালে যেতে হয় ক্রমাগত

শতভিষা

একমাস—পনেরদিন বা—থুব অল্প কবিকেই
হাসপাতালের মাঠে শাদা জামাগুলি মেলে দিতে হয় ।
দারোয়ান, পেরাদার কানের ফুটোর মধ্যে
টাকাটা দিকিটা চুপে ফেলে দিতে হয় থুব অল্প কবিকেই ।
অথচ, কবিতা ঘটছে বহু এদিকে ওদিকে । কবিতায়
সেঁদিয়ে গেছে অনেকের ভবিষ্যৎ রমনীয় আলোছায়ায়

টানা দিনগুলি

‘স্বথের পায়রা’ বলে পরস্পর মুখ চুষনের আগে

—ওর দিকে বারবার চাইছে সন্দেশে

মাহুষ ঘটছে বলে কবিতাও লেখা হচ্ছে বহু

মাহুষ মরছে বলে অতিরিক্ত বাজ পড়ছে এদিকে ওদিকে ।

[নিশির সঙ্গে আমার গোপন মিস্টিক আলোচনা (অংশ) : উৎপলকুমার
বসু : শতভিষা : ত্রিংশ সংকলন : ১৩৭০]

আক্ষেপ না ক’রে উপায় থাকে না যে ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত হয় না জেনেও
ঘড়ির কাঁটা কৃত্রিম আগ্রহে আবার পিছনে ফিরেছে : বর্তমান নবীন কবিদের
বড়ো একটি অংশ আবার বিগত প্রথম ও তৎপরবর্তী কবিতার কাছে আধুনিক-
তার সহজ পাঠ নিতে উদগ্রীব হয়েছেন। সেই অহুগামিতার ফল এই
স্বকপোলকল্পিত অবক্ষয়, শব্দা দেহাত্মবাদ, বিকারোক্তি প্রবণতা, অতিকথন,
বাইরে থেকে কথা বলা, কুড়িয়ে-পাওয়া অপ্রমে জীবাত্মাকে ঝালিয়ে নেওয়া
এবং ক্লিশে-নিঃস্ব আবেগ অগণিত ইত্যাদি ।....

[স্থির বিষয়ের দিকে (অংশ) : আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : শতভিষা :
উনত্রিংশ সংকলন : ১৩৬৯]

প্রিয় উচ্চারণগুলি শ্রান হলো যে সময়ে, তার
অসতর্ক কোন চিহ্ন ঢেকে দিয়ে যায় নাকি ছবি

শতভিষা

যে ছবি পূরনো খুব গৃহধর্মে ; ছেলেবেলাকার
পঞ্চময়, আজ অবধি কতো ফুল কুড়ালে বৈষ্ণবী !
এ কোন বিশ্বাস নিয়ে ব্যঙ্গ নয় । জীবন মৃত্যু বা
যাই বলো, তার কতোটুকু জানি, তাই যে স্বথের—
তোমার স্বথের অর্থ ভেনে যাবো দুর্দিনের খুঁবা
একক ইঙ্গিত দেখবো কতো শ্রুতি আছে লাজুকের ।

[বৈষ্ণবী : স্বধেন্দু মল্লিক : শতভিষা : একত্রিংশ সংকলন : ১৩৭১]

ঠিক জানি, আবার সে ডাক দেবে । দরজা খুলকো না ।
বলবে করুণ কণ্ঠে কথা শোনো । না, না, ভুলবো না—
কিছুতে ভুলবো না ।

আমার এ-ঘর ভালো । আমি ভালোবেসেছি রাত্ৰিকে ;
তারই প্রতীক্ষায় থাকি । যখন চারদিকে
নিঃশব্দে তরল ছায়া গাঢ় হয়, গোপন গুহার
দরজা খোলে, অন্ধকারে মিশে যায় এপার-ওপার :
অদৃশ্য মূর্তিরা সব ছাড়া পায়, দূর থেকে ডাকে,
কাছে এসে ভীড় করে, সপিণীর মত পাকে পাকে
আমাকে জড়িয়ে ধরে—সেই স্পর্শ পিচ্ছিল ঘৃণিত ;
তথাপি নিজেই সঁপি : আমি নিশ্চতন, সম্মোহিত,
ভেসে যাই রাত্ৰির অতলে—সেইখানে যেন তুমি স্থির
নীলপদ্ম ; কণ্টকমণ্ডল ঘিরে ঢেউ কী অস্থির ।

[নীলপদ্ম : দীপঙ্কর দাশগুপ্ত : শতভিষা : দ্বাবিংশ সংকলন : ১৩৬৫]

শিল্পের অঙ্গনে শিলার কথিত প্রকৃতি এবং শিল্পের যে দ্বন্দ্বিক ক্রিয়া বা
বিভিন্ন ছন্দে আবরণে গোয়ায়েটে থেকে টমাস মান্ পর্ত্ত জর্মন সাহিত্যের
নাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পরিবর্তিত রূপ ও প্রকারে সেই
মৌল ঐতিহ্য যুরোপীয় সাহিত্যে অত্যাধিক কেন্দ্রবিশেষে বর্তমান, তারও স্বরণ
অপরিহার্য । যুদ্ধোত্তর দ্রুত পরিবর্তমান পৃথিবীতে ঐতিহ্য, প্রমূল্যবোধ, সংস্কৃতি

শতভিষা

ও বিশ্বাসের অবক্ষয়ের পটভূমিকায় শিল্পা যেখানে Priest এবং Commissar-
এর মধ্যে বিবেকী সংশয়ে পৌঁড়িত সেখানে অননুভবিত শিল্পই শিল্পীর একমাত্র
বিশ্বাস।

['আলোকিত সমন্বয়' প্রসঙ্গে : তরুণ মিত্র : শতভিষা : ত্রয়োবিংশ

ਸੰਕਲਨ : ੧੭੬੫]

ভা'হলে এশো
 প্রুনো ফাগ দিয়ে
 স্বতির হোলি খেলি ।
 ভালোবাসা
 ওখানে আছে জমা—
 মায়ের সেই জরির বেনারসী
 তোরঙ্গেতে সঙ্কোপনে ভাবে,
 ভাবে শুধু
 চেনাশোনার কথা,
 সে-কথা আর কখনো উব্বে না ;
 ভালোবাসার ওখানে শুধু জমা,
 খরচ কিছু নেই ।

[তা'হলে এমো (অংশ) : সুকুমার রায় : শতভিষা : দ্বাবিংশ সংকলন :

7. 4. 1971

এরা মাঝে মাঝে খুব ভালোবেসে ধীরে ধীরে সহজ বৃষ্টির গল্প বলে ।
উনিশ শ আটাত্ত সালে একবার হয়েছিল, তারপরে বিয়ান্নিশ সালে ।
অবশ্য সাতাত্ত সালে যে বৃষ্টি হয়েছে সেটি আরও ভালো, উত্তরের থেকে
প্রচুর প্রচুর মেঘ এসেছিল, কালো কালো, সকলে তাদের দিকে চেয়ে
বসেছিল সারাদিন সেই ভোরবেলা থেকে বিকেল অবধি,
সব কাঁপ ভুলে গিয়ে ; মেঘদের কাছে আর্ত আবেদন করতে গিয়েও
গলায় আটকে গেছে, চূপচাপ তাকিয়ে থেকেছে ।
অকস্মাৎ বৃষ্টিধারা খেমে গেল, তারপর যা হল তা ভেবে ভেবে এদের জীবন
চ'লে যায় চলে যাবে সেই ষট্টাখানেকের মানে ও প্রয়োজনের কথা
ভেবে ভেবে ।

এভাবে সারাজীবনে যাত্র পাঁচ ছয় বার বৃষ্টিপাত দেখা
এই লোকগুলো আছে, রয়েছে পৃথিবীতেই ঈশ্বরের কাছে।

[বৃষ্টির গল্প : বিনয় মজুমদার : শতভিষা : একচত্বাংশ সংকলন : ১৩৮১]

শতভিষা

সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায়
গানের তোড়ে দম বাধলো গলায়
হারানো তার গানের পিছে হারালো তার প্রাণ
আহা, ভুলে গেলাম কি যেন তার গান !

প্রাণ দিয়েছে দেয়নি তার হাসি
গানের মত প্রাণ ছেড়েছে থাঁচা ।
সেই যে তার মরণাহত হাসি
ঝর্না জানো, তারি নাম তো বাঁচা ।

[ঝর্না-কে : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : শতভিষা : ষষ্ঠ সংকলন : ১৩৫২]

দৃষ্টত সবুজ, শুধু বাতাসের সামান্য অভাবে
দেখানো গেল না গাছে ঘোবনের ঢুলে-ওঠা বিখ্যাত বেদনা ।
তুমি নেই, কখনো ছিলে না, তাই শব্দ শব্দ শব্দ
তবু বোঝানো গেল না কেন যে একাকী
মন্ত্র নিয়ে বসে থাকে দেবতার কাছে পুরোহিত ।

[পাঁচলাইন : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত : শতভিষা : চতুস্ত্রিংশ সংকলন : ১৩৭৩]

গত ২৯ শে 'নভেম্বর 'বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন' ও 'শতভিষা'র পক্ষ থেকে স্টিফেন প্লেগারকে চায়ের আসরে আপ্যায়িত করা হয়েছিল । যারা এই ঘরোয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন—একথা লিখতে আমি প্রলুব্ধ—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কবি, বিশেষত তরুণ কবি এবং অনেকেই আস্তর-অর্থে কাব্যানুসারী । 'শতভিষা'র পক্ষ থেকে কবিকে 'শতভিষা'র প্রতিটি প্রকাশিত সংখ্যা ছাড়াও বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের শাস্তি-প্রতীক একটি সূচিত্রিত মঙ্গলঘট উপহার দেওয়া হয় । শেখোক্ত উপহারের চিত্রকার শ্রীমণীন্দ্র মিত্র । কবি শিল্পীকে উচ্ছসিত অভিনন্দন-জ্ঞাপন করে 'শতভিষা'কে ধন্যবাদ দিলেন । পত্রিকার পক্ষ থেকে তার আজন্ম সঙ্গী ও লেখক ক্রীতরূপ মিত্র সেটি কবির হাতে তুলে দিলেন । প্রাসঙ্গিক সূত্রে শ্রীযুক্ত মিত্র বাংলার সাম্প্রতিক কবিতার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ পরিচয় দান করেন তা

শতভিষা

স্পেণ্ডারকে এতই উষ্ম করিয়েছিলো যে তিনি বক্তাকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পৌঁছে দিয়ে সেই বক্তব্যের সারসংকলন কবিসম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত বক্তার হুচারু কথনশৈলীর প্রশংসায় স্পেণ্ডার অভিভূত হয়ে উঠেছিলেন।

[স্টিফেন স্পেণ্ডার (অংশ) : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত : শতভিষা : দ্বাদশ
সংকলন : ১৩৬১]

অফুরন্ত সন্ধ্যায় আমার
ঘর ভরে আছে।
কোথাও দেখিনা দিশা, নদী ধুধু করে চারিপাশে
ঘুমের জড়িমা। আমি তার
মায়াবী জঠর ছেড়ে দরোজা পেরিয়ে নিরবধি
আকাশতলায় স্থির তটের আশ্রয় পেতে চাই।

[কুয়াশা (অংশ) : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : শতভিষা : অষ্টবিংশ
সংকলন : ১৩৬৮]

ছাঁচড়াচোরেয়া কাল রাতে রান্নাঘর থেকে
বাসনকোসন সব নিয়ে গেছে।
গৃহলক্ষ্মী হুঃসহ মুখরা
যেন বা কতাই দোষী।
তবু অফিসের মূখে খুব তাড়াতাড়ি
কলাপাতে খেতে খেতে
মনে পড়লো
কবে সে স্টীমারে দেখা নদীর ও-পাড়ে
কলাগাছ, আজিনায় নয়শিশু
কৃষকবধূর চোখ ; স্থির শান্ত দূর কুঁড়েঘর।

[চোর : তারাপদ রায় : শতভিষা : ষাটবিংশ সংকলন : ১৩৬৫]

যে চায় তাকে আনিস
 যে যায় তাকে আনিস
 যে চায় তাকে আনিস ডেকে আনিস—
 ঘরের কাছে আছে অনেক মাহুয ।

যে যায় দূরে অনেক দূরে অনেক দূরে দূরে
 অনেক ঘুরে ঘুরে
 যে যায় তাকে আনিস ডেকে আনিস ঘরে আনিস
 ঘরের কাছে আছে ঘরের মাহুয !

হুজুন যেতে উজান পথে উজান যেতে যেতে
 ঘরের মুখে আগুন কেন জালিস ?

[ঘর : শব্দ ঘোষ : শতভিষা : চতুর্বিংশ সংকলন : ১৩৬৬]

আমি জানালা দিয়ে দেখছি
 ঘুরে ঘুরে কাক উড়ছে আকাশে,
 তারো কিছু ওপরে, হ'একটা মন্থর চিল—
 টেলিগ্রাফের তার সরাসরি চলে আসছে
 বাড়ির দিকে,
 এই গ্রীষ্মেও, মুহু মুহু হিম-হাওয়া দিচ্ছে চারপাশে,
 মনে হচ্ছে, খুব কাছেই সমুদ্র ।

[জানালা দিয়ে (অংশ) : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত : শতভিষা : দ্বিচত্বারিংশ সংকলন :
 ১৩৮২]

তারপর শীত এলো । চেয়ে দেখি উত্তরে বাতাসে
 কেবলি হিমের বাদ ; তীক্ষ্ণতার জালা নিয়ে
 ছুটে আসে দহু হাওয়া গাছে, বাসে । এখানে আবার
 আভির করুণ চিহ্ন, মেঘে মেঘে অস্বক্ষণ সজল কান্নার
 স্বর ব্যাপ্ত হয় । আহা, বৃষ্টি-ধোয়া সোনালী আকাশে
 শাপদ যত্নের ছায়া নামে ।

[উপলব্ধি (অংশ) : মানস রায়চৌধুরী : শতভিষা : তৃতীয় সংকলন :
 ১৩৫৩]

অরণ্য কি গ্রামাফোন বাজাতে শিখেছে

নাকি তুমি গোপন আঙুলে

রূপোলি পিনের চাপে ঘুরিয়েছ সবুজ রেকর্ড ?

দৌঘাঘ জোয়ার

নাকি তুমি খুলে দিলে হঠাৎ দুয়ার ?

ঝংকার দিয়ে ওঠে ঘরের বাতাস

উড্ডত চুলের রঙে কেঁপে ওঠে মুখের দুপাশ ।

[সবুজ রেকর্ড (অংশ) : মোহিত চট্টোপাধ্যায় : শতভিষা : চতুর্বিংশ

সংকলন : ১৩৭৩]

প্রতিদিন যথেষ্ট বেলায় আমি উঠি

যেন রাত জাগা নটী ! নিঃস্বপ্ন ঘুমিয়ে খুব ক্লান্ত মনে হয়

আয়নার ঘাই না আমি, আমার আয়নাকে বড় ভয়,

সারারাত কালো ফাগ ছড়িয়েছে পাপ মুষ্টি-মুষ্টি !

[একটি নিজস্ব পাপ (অংশ) : কবিতা সিংহ : শতভিষা : চতুর্বিংশ সংকলন

১৩৬৬]

শিল্প অর্থই নির্মিত শিল্প। শিল্প প্রকৃতির অঙ্কলিপি রচনা করে না, শিল্প প্রকৃতির
দ্বিতীয় বিজ্ঞাস, সম্ভিত উপস্থিতিকে কায়না করে। শিল্প অর্থই মিথ্যার, অলীকের
উপাসনা। প্রকৃতি বড়ো জোর শিল্পের উপাদান হ'তে পারে, শিল্প নয়—প্রকৃতির যা
কিছু সত্য শিল্পী তাকে ব্যবহার করেন, কখনো দুইটি ছবির সমাহারে তৃতীয়
ছবি আঁকেন, কখনো বা তাকে পোশাক পরান, নতুন রঙ দেন, এমনকি নতুন
বেশ। যা কিছু প্রাকৃতিক, তা-ই পরাজয়, সেখানে বিজিতের আজ্ঞাবহ চেতনা
আছে, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠিত পটভূমিতে আত্মপলঙ্কির গৌরব নেই। যা কিছু
প্রাকৃতিক তাই স্থগার, সেখানে হীনতম দাসত্ব আছে, ব্যক্তিত্বের আত্মময় উজ্জীবন
নেই। শিল্প তাই প্রকৃতি নয়, শিল্প অলীকের, অমূর্তের, মিথ্যার অল্পধ্যাননে
একাগ্র।

[শিকড় অভিলাবী চৈতন্য (অংশ) : আলোক সরকার : শতভিষা : উনবিংশ

সংকলন : ১৩৬৯]

কবিতা

পচিশ
কবিদের

বহুরের
নতুন

‘শতভিষা’

থেকে
কবিতায়

নির্বাচিত
সংকলন

জীবনানন্দ দাশ

জার্নাল : '৩৬

বিস্মৃতি ধুলোর মতো জড়ো হয় যেইখানে—

সেই হিম নিস্তরু আধারে

একবার—আধবার—চেয়ে দেখি

আজো আমি সেইখানে তাকে

খুঁজে পাই ;—

নিচের তলায় ঠাণ্ডা রোগা অন্ধকারে

রেলিঙের পাশে

দাঁড়িয়ে রয়েছে ;—

আলোর বেগের মতো প্রাণ

ছিল সেই যুবকের :

স্বর্ধ আর নক্ষত্রের যেন সে লস্কান ।

তবু তার ভালো লাগে আজ স্ববিরতা ;

সেখানে সময় শুধু ধূসর ঘড়ির মুখে কথা

ব'লে ক্লান্ত—ক্লান্ত ক'রে রাখছে হৃদয় ;

ব'সে থেকে ব'সে থেকে ব'সে থেকে মাহুঘের ক্ষয়

সেখানে একটি নারীর জন্ত হয় ।

আমার এ-জীবনের দীর্ঘ—দীর্ঘতর স্তর—অলিগলি ঘিরে

ঈশ্বর বাসনা স্বপ্ন—কতবার গেছে সব ছিঁড়ে ।

শুধু তার প্রতীক্ষা আমাকে

কুশপুস্তলীর মতো বারবার সৃষ্টি ক'রে চলে ।

ব্রহ্মাণ্ডের কত সৃষ্টি—কত প্রলয়ের কোলাহলে

টলে না তবুও তার প্রেমিকের মন ।

তবু সে খাতক, আঁহা, সময়ই প্রকৃত মহাজন ।

জীবনানন্দ দাশের এই কথিতাটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি ।

অজিত দত্ত

ছড়া

কড়া কথা ছড়া ভালোবাসে না ।
তাড়া দিলে ছড়া কাছে আসে না ।
ছড়া আনি তুলিয়ে ভালিয়ে ।
তবু যেতে চায় সে পালিয়ে ।
ছড়া লেখা হয় অনায়াসে না ।
ছড়া লেখা লোজা ভাবো না সে না ।

অরুণ মিত্র

পারাপার

চোখ দুটো আমাকে তাড়া করে। পেছনে কি বন, না, ঝকঝকে শহর ? চোখ দুটো তাড়া ক'রেই আসে। হয়তো কোনো জানোয়ার। কিংবা কোনো মোটর গাড়ি হয়তো। আমি দৌড়তে দৌড়তে মজা গাড়ের ধারে পৌঁছই, কাঠের সঁাকোটার উপর উঠে যাই। মাঝখান পর্যন্ত গেলে সেটা দাপাদাপি জোড়ে, আমি বুঝি অসহ্য হ'য়ে উঠেছি। নিচে কচুরির দামে হিলহিলে বিষ এবং ফাঁকফোকরে রাত গুড়ি মেয়ে। সাবধানে আলতো ভর রেখে আমি বিস্ময়ণ পার হ'য়ে যাই, যেমন সার্কাসে টান-দড়ির খেলা দেখায়। একবার পড়লেই হয়, আরো কয়েকটা নীল ফুল ফুটেবে বৃষ্টিতে আর কবিতার বৃষ্টিতে পচা জল চনমন করবে। তাকেই কি মৃত্যুর মহিমা বলে ?

আমি পার হ'য়ে যাই। এবার ? রাস্তাঘাট ফেটে চৌচির হ'য়ে আছে। চাষবাসের চিহ্নগুলো এলোমেলো ছড়ানো। একটা খড় আমি উঠিয়ে নিই। আহ্.....কি উত্তাপের স্মৃতি ! ভাত ফোটায় গন্ধ, শীতবর্ষার ছাউনি। আমি পায়ে পায়ে ক্রমে এক অন্ধকারে, যেখানে সকালছপুরবিকেলের মুখগুলো আর নেই। অথচ পাতায় বাকলে ধুলোর পরতে শব্দ লেগে আছে। যেন সকলে ঘর ছাড়ার পর এইখানে তাদের হৃদয় রেখে গিয়েছে। তারা কি সঁাকোর দিকে, সঁাকোর মাঝখানে, ওপারে ? তাহলে আমাকেও ফিরতে হবে। হাজা কাঠের উপর শিউরে শিউরে, জঙ্গলে, না, শহরে, সেই চোখ দুটোর সামনে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটি অসমাপ্ত কবিতা

আদিম অন্ধকারের মুখোস-দেবতা !

তোমার একটিই আনন্দ,

আমাদের মুখ স্নান ক'রে দিতে ।

তুমি আমাদের ভয় দেখাও ; দিন নেই রাত নেই

তুমি হু'চোখ লাল ক'রে আমাদের ভয় দেখাও

কেননা, আমাদের পূর্বপুরুষ স্বর্গ থেকে আগুন চুরি ক'রে এনেছিলেন ;

কেননা আমাদের মুখে ক্রীতদাসের শীতের মুখোস নেই ।

তুমি আমাদের পৃথিবীকে আড়াল করো দারুণ অগ্নেমে

আর লেলিয়ে দাও তোমার মাহুযথেকো বাঘেদের ।

তবু মাহুযের মুখের লাষণ্য থেকে যায়

অরুণকুমার সরকার

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি রাত

মাতাল হ'য়ে শুয়েছিলুম ঘাসের ওপর
হাড়কাঁপানো নীতের রাতে ।
সারাটা রাত বুকের মধ্যে হাড়ের মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে
মোচড় দিয়ে গেল
নিখিল বাঁড়ুজ্যে ।

শব্দ শুধু শব্দ সেই শব্দ যেটা
রক্ত এবং শিরায় শিরায় গুমরে গুমরে
জানায় আমি একলা ভীষণ একলা একা
অনেক দূরের বহু যুগের কোন জন্মের
কান্না আটখানা হ'য়ে ছড়িয়ে গেল ভিতর দিকে
বুকের মধ্যে হাড়ের মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে
আমি এবং
আমার কান্না তোমার আঙুল
নিখিল বাঁড়ুজ্যে ।

নরেশ শুহ

সম্পাদক সমীপেষু

পাড়ায় বড়ো হট্টগোল, কিছু শোনা যায় না কে কোথায় কী বলছে, শুনলেও বোঝা কঠিন, বুঝলেও করার কিছু নেই। ভারি অসহায় লাগে নিজেকে : বলুন, আমি এখন কী করি ? কাউকে খবর করতে পারি না, প্রতিবেশীর টেলিফোন অচল, রিসিভার ভাঙা, লাইন তুলে নিয়ে গেছে। তাছাড়া খবর করার মতো সংসারে আছেই বা কে !

ভাড়া-বাড়ির সিঁড়িতে কুকুরের হলুদে পেছাবের ঢল, নামতে উঠতে পা পিছলে যায় : তবুতো আশ্রয় একটা ? এবং কে না জানে যে লোকটা আমি ভীতু ধরনের নিবিবাদী। অজ্ঞাতকুলশীল লোমশ যুবর উদ্যম বুক দেখতে-দেখতে অবোধ পিণ্ডন যুবতী উরু চুলকায়, তাও এমনকি দাঁড়িয়ে দেখার সময় নিই না আমি। অবেলায় এই ধূসর শহরের জটিল রাস্তাঘাটে কোন দিকের কত নম্বর বাস কখন আমার নেওয়া দরকার সেটাই তো আগে আমাকে জানতে হবে ? এসব গোপনীয় কথা কা'কে আমি নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি ?

প্রভাতের শোকসংবাদ হ'য়ে বাসি খবরকাগজের পাতায় হাবিয়ে ফুঁরিয়ে গেছে
হৃদয়ের সব আত্মীয়েরা :

চেনা মনে হয় না হালের কোনো গলা,

জানা লাগে না শহরের কোনো ঠিকানা,

ব্যয়যোগ্য ঠেকে না দোকানের কোনো খাণ্ড।

দাড়ি-গোঁফের ছোপানো ঝোপ থেকে শিশুরা ভ্যাংচায়, যাদের সেদিনও এর ভাই
কি তার ছেলে ব'লে চিনতায়।

শতভিষা

টাক মাথায় পরচুলা পেঁচিয়ে বিনিত্র-পরী মেয়েটি ওমূকের বোঁ কিনা দেখতে গেলে, জানি আরো ফ্যাশাদে পড়ব আমি।

আমার একমাত্র চিন্তা—কোন কৌশল এই মুহূর্তে অবলম্বন করা আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

আমারও দাঁতে ধার নেই,

চোখে দৃষ্টি নেই,

ব্রাণশক্তি শিথিল।

তাতে আমি কী দোষ ক'রেছি? আমি কেন দায়ী হ'তে যাব?

অথচ টের পাই, আড়াল থেকে টিপ রাখছে নাছোড় খুনে এক দাক্ষণ মাস্তান :
রোয়াকে শুয়ে ছুরি দিয়ে সে দাঁত খোঁচায়, আমার কেনা দেশলাই নিয়ে বিড়ি
ধরায় গলির মোড়ে, আমাকে চোখের পাহারায় দাঁড় করিয়ে রেখে ডাকঘর থেকে
দিশিদিকে সে টেলিফোন করে—

উপুড় ক'রে ঢেলে দেওয়া বিখ্যাত এই নীল আকাশের তলায়,

কোন লালবাজারের ঠিকানা খুঁজে

একে নিয়ে আমি গ্রেপ্তার করাতে পারবো জানি না।

আমাকে আইনের ধ্বংসরী একটা ধারা কেউ ব'লে দিন, ত্রায্য ভাড়া দিয়ে
আরো কয়েকটা মাস এই শহরে আমি যাতে থেকে যেতে পারি, বাড়িজমার
কোনো উটকো লোক বিনা নোটিশে হঠাৎ আমাকে যাতে তুলে না দেয়।

অরবিন্দ শুভ

ফুলবাগান

পুকুরের ধারে পাতাবাহারের নতুন চারা,
বহুদিন বাড়ে দেখাশাক্ষাৎ ;
এই নিয়মের রাজস্বে ঋণ বৃষ্টিধারা
লম্বানে ভেজায় হরিণ, কিরাত ।

কোথাও বাগুরার তাগাদা ছিল না, অথচ এসে
পাওয়া গেল এই বিশ্রামঘর ।
কিছু উপদেশ নগদ দিয়েছে দূর বিদেশে
ঘন অঙ্গল, মস্ত শিখর ।

পাকা অহুমতি পেয়েছি ব'লেই একটু বলি,
নিরাপদ দূরে কড়া দেয়াল ;
পুণ্যলগ্নে ধরতে পারিনি রথের রশি,
মনে পড়ে গেল, পুরনো কাল ।

রথের চাকার ব্যাঘাত ঘটেনি, রথের চাকা
নিজের নিয়মে ঘূর্ণমান ।
আমার প্রাপ্য যা ছিল পেয়েছি—কাগজে ঝাঁক
বাতিল ব্যর্থ ফুলবাগান ।

শব্দ ঘোষ

জীবনবন্দী

করুণা চেয়েছি ভাবো ? তোমাদের সমর্থন ? ভুল।

অহুসোদনের জন্ত হৃদয়ে অপেক্ষা নেই আর।

সে জানে তুলের মাজা, সে জানে ধ্বংসের সব সূচী,

এ হাতে ছুঁলে সে জানে ভস্ম হয়ে যাবে ওই মৃথ।

কার কাছে কথা তবে ? কারো কাছে নয়। এ কেবল

যেভাবে জীবনবন্দী বুকচাপা কুঠুরিতে ব'সে

দিনের রাতের চিহ্ন একে রাখে দেয়ালের গায়ে

সেইমতো দিন গোনা রাত আগা মাথা খুঁড়ে যাওয়া,

লোহাতে লোহার ধনি আগানো, বাজানো, বিফলতা।

যে দেখে সে দেখে শুধু একজন খুলে দিয়ে চুল

সবারই পাজর চেপে দাঁড়িয়েছে লোল রসনার

এ কেবল তারই নাচ বলয়ে বলয়ে বুনে যাওয়া

ভালো যদি বলো একে ভালো তবে, না বলো তো নয় !

দীপংকর দাশগুপ্ত

যখনই নিজের কাছে

অনেকদিন তো ছায়ায় মতো ছিলে,
তোমাকে খুশি করতে পারিনি,
ভেবেছিলাম, তুমি আর আসবে না।
কিন্তু নিজের কাছে ফিরে এলেই
দেখতে পাই, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছো দূরে,
নতমুখে।

কখনো বা ট্রেনে যেতে যেতে দেখি,
উন্মুক্ত প্রান্তরে একাকী-বটের ছায়ায়
কাঠবেরালির সঙ্গে ;
দেখি, শুভ্র শরতের শিশির-সকালে
পদ্ম আর শালুকের স্নিগ্ধ উজ্জলতায়
তুলে নিচ্ছো ফুল ;
দেখি, ফাস্তনের বিকেলে

শতভিষা

পাপড়ি-ছড়ানো পলাশের নিচে

হাওয়ায় উড়ছে আঁচল ।

ভেবেছিলাম, তুমি আর আসবে না ।

এইমাত্র তোমাকে দেখলাম,

বুষ্টিভেজা অশ্বখের নিচে

মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছো,

বর্ষার হাওয়ায় ঝ'রে পড়ছে বকুল ।

বার বার ঘুরে ফিরে আসো,

মুখ নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকো

একটু দূরে,

তোমাকে খুঁশি করতে পারে

এমন কিছু আমার নেই,

যখনই নিজের কাছে আসি

মলিন মুখে সজল চোখে

দাঁড়িয়ে আছো, দেখতে পাই ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

একরাশ নামহীন তুমারের মাঝখানে ময়ূর

একাদর্শী নেচে ওঠে। ইওরোপের মাষমঞ্চে
—একরাশ নামহীন তুমারের মাঝখানে ময়ূর
কেলিনির আমারকর্ডে—

এবং আমার শর্তে
ফেরাও সূর্যকে ব্রোঞ্জে
ক্ষোভিত বৃদ্ধের মতো গুয়ানক দ্বর
এই সূর্য

স্বদে-আসলে খুব করে খাটিয়ে নাও ওকে

কারো কাজে না লাগলে সূর্য নিজে-নিজে কষ্ট পায়
আত্মলীনতার কুঠরোগে
পড়ে থাকে, আর তার কণ্ঠে তখনও যে
বিজ্ঞাপনী ঘণ্টা এক সোহহং সদর্পে রটায় ;
একাদর্শী একমাত্র তোমার বেলায়
‘দয়া করো’ চিৎকার করুক ভিক্ষাতুর
এই সূর্য

উদয়াচল একবার কাঁদুক দুর্ভোগে !

জুলীল গল্পোপাখ্যান

সে কোথায় যাবে

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো, যা—

সে কোথায় যাবে ?

নিরুন্ম মাঠের মধ্যে সে এখন রাজা

একা একা হৃন্দুভি বাজাবে ?

ছিল বটে যৌত্রালোকে তারও রাজ্যপাট

সোনালী কৈশোরে ?

আজ উল্লুকের পাল হয়েছে স্বরাট

চৌরাস্তার মোড়ে

দাঁতে দাঁত ঘষাঘষি নোথের টংকার

এরকম ভাষা

সে শেখেনি, তাই এই কপকথায় তার

জন্ম কীভিনাশা !

গায়ে সে মেখেছে ধুলো, গুট ছদ্মবেশে

বোবা ভ্রাম্যমাণ

অদৃশ্য সহস্র চোখ তবু নির্নিমেষে

ছিলা রাখে টান ।

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো, যা

সে কোথায় যাবে ?

যেতে সে চায়নি ? কেউ খুলেছে দরোজা

পুনরায় মহুয়া অভাবে ?

আলোক সন্ন্যাস

প্রণাম

এই আমার প্রণাম প্রস্তুত ছিলো অনেকদিন
আজ তোমাকে দিলাম ।

বিবেচনা ছিলো অনেক দ্বিধা ছিলো অনেক ।

বলতে পারো অভিমান এখন তা-ই মনে হয়
আর কিছুই মনে হয় না ।

সেদিন ছিলো ক্রোধ সেদিন ছিলো প্রত্যাখ্যান ।

আর বারবার ফিরে-আসা তাকিয়ে থাকা মুখ নিচু
পা এগিয়ে যায় না পেছিয়ে যায় না পা ।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতুম স্তব্ধতা গমগম ক'রে বাজছে ।

অতলান্ত পর্বত মালা অঙ্ককার পাইন বন আর কিছুই নয়
কোথাও নেই অশ্রুজল স্নিত হাসির কল্পনা—

শতভিষা

স্তব্ধতা গমগম ক'রে বাজছে আত্মলীন দান্তিকতা ।

আর বারবার আক্রোশ ঘৃণা আর অবজ্ঞা আর

বানিয়ে-তোলা পুতুল রঙ ঢেলে-দেওয়া ছবি

কতদিন একধরনের মগ্নতাও, বুঝতেই পারিনি

ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছিল প্রণাম ভিতরে ভিতরে

পুতুলগুলো স'রে যাচ্ছিল দূরে ছবিগুলো উড়ে যাচ্ছিল

হাওয়ায় ।

আজ হঠাৎ সূর্যাস্তের আলোয় আকাশ উথলে নামলো শূন্যতা ।

আর কতো বড়ো একটা ভয় আর কতো বড়ো একটা কান্না

শূন্যতার ভিতরেই স্পষ্ট দেখলুম পা

পা এগিয়ে যায় না পেছিয়ে যায় না পা, আমার

পিঠ আপনি বাঁকা হলো দিলুম আমার প্রণাম

শাখ কোথাও বেজে উঠলো না—

শূন্যময় দান্তিকতা গমগম ক'রে বেজে উঠলো শুধু ।

সময়েস্ত সেনগুপ্ত

নিজের জন্তু বেঁচে নেই

সারাদিন যেমন তেমন, সূর্যাস্তের পরই হয় স্নান ।
কি করবো কোথায় যাবো
ভাবতে ভাবতে ভাবতে ভাবতে
নানারকম ড্রাম বাস ট্যাকসী পান্টাপার্টি
কিন্তু কোথাও পৌঁছুই না ।
একটা বিছানা আছে শারীরিক,
মোটামুটি একটি বালিশ
যেখানে এখানেো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘুম
কিংবা মৃত্যু, কিংবা
বলা যাবে না এমন কিছু
অভ্যাস হয়েছে, হচ্ছে :
আলমারীর গভীরে প্রত্নতত্ত্বের সমান
গম্বুজ খিলানভাঙ্গা বই
লক্ষ লক্ষ প্রসিদ্ধ অক্ষর—না
আজকাল আর ভাল লাগে না
এই সব স্মৃতি নিয়ে উবু হয়ে বসে থাকতে, অথচ
একদা তো কতো কথা বলেছি তাদের সঙ্গে
সমস্ত সামাজিকতাকে বাইরে রেখে

নাহীৰ মতন ভিতৰে নিয়েই

দয়জা কৰেছি বন্ধ !

এখন

সকাল হলেই দাড়ি কামাই নিপুণ ; ঐ

লৌকিক সাজাৰিতে বিন্দুৰাত্ত ভুল হয় না কোথাও,

আগে মাঝে মধ্যে কেটে ছেড়ে বন্ধ বন্ধতো

ভাবতাম আহ্ !

তাহলে তো ঠিকঠাকই বন্ধ তৈরী হছে !

আমি এখন নিখুঁত ;

তারপর স্নান কৰি, কিছু একটা খাই

শীত-নিয়ন্ত্ৰিত অফিসচেয়াৰে বসে

গুৰু কিংবা ভুল একক দশক শতকের

পৰিসংখ্যান কৰি

মনে পড়ে আমি আমার নিজের জন্ত

বেঁচে নেই। ঘড়ি ডানদিকে যথোচিত ঘোরে

ঘণ্টায় ঘণ্টায় শব্দ করে শোনায়ে মানুষকে, হাঃ

আমি মাত্র দুটি দক্ষিণপন্থী কাঁটা দিয়েই এখনো মাপার নিয়ম ..

যা বলছিলাম

সাবাদিন যেমন তেমন, পূৰ্ণান্তের পর হয় সূর্য

শতভিষা

ভীৰ আক্রাশে জ্বলতে থাকে আশিরপদনথ, বুকের

অগ্নিকুল ভেনট্রিকুলে জাগে

রক্তের লশক্ব ইঁক

স্বরাসারে স্বরাহা হয় না, কণিকের অংশ মাংসে

জাগে অগ্নিমান্দ্য !

ঘাড় বেকিয়ে তাকানো দীর্ঘ হর্মসারির ওপর

দলছুট পাখির মতো

কয়েকটি অচেনা নক্ষত্রকে বসতে দেখে

চীৎকার করি

ঢিল ছুড়ি

তারি নড়ে না ! কোথায় যাবো

এই অন্তের কারণে বাঁচার অরণ্যে আমি কবে

মৃত্যুর বিশ্বাসে পাবো

টুকরো টুকরো অশঅণ্ড বেঁচে থাকার হিসাব ?

স্বতরাং অন্ধকার আসে

বিছানা আমাকে ডাকে

অক্ষরের অঙ্গ থেকে 'আ'-কার 'ই'-কার

হ্রস্ব 'উ' স্বদীর্ঘ 'উ' রায়ে পড়তে থাকে

আমার কিছুই বদলায় না

আমার কিছুই হারায় না

ওধু স্বর্ষ দ্বিতীয় গোলাধে চলে যায় ।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আত্মজীবনীর খসড়া

(শ্রীমান নিখিলেশ গুহ সমালোচকেয়)

আমার ঠাণ্ডা-গলার ডাক

তোমরা কেউ শুনতে পারোনি ।

তাই আমি ফিরে গেছি ।

আমি কিন্তু কাছেই ছিলাম ।

চুল উশ্‌কো, চোখে চশমা, গায়ে হয়তো

একটু বেশি মেদ,

আর পাঁচজন লোকে যেভাবে জীবন বাঁচে, ঠিক সেইভাবে,

পাপ-পুণ্য-কামনা-বাসনা-ঠিক-ভুল, সব একধাঁচে,

বাস থেকে রাস্তার স্তম্ভরী দেখে একইভাবে

হঠাৎ চঞ্চল...

মানছি, কখনো আমি তেমন চিংকার ক'রে

উঠতে পারিনি,

বলিনি, হাজার হাজার ঢেউ বিচূর্ণ স্তনের মতো

আছড়ে পড়েছে পাম-বীচে,

বা এরকম কিছু ।

তবু লম্বা জিনিস আমি ভালোভাবে লক্ষ করেছি,

তোমাদের কুট প্রস্ন আজীবন জেনেছি মগজে ।

আমার আগুন আমি একটু বা ভেতরে রেখেছি,

তফাৎ এখানে—

সর্বস্ব পুড়িয়ে দিবে একটু একটু আলো জ্বলেছি যখনই,

তোমরা কোনো আলো-তাপ-রং দেখতে পারোনি,

কিন্তু আমি তো দেখেছি !

নিঃশব্দ আলোর শ্রোত ব'য়ে গেছে আমার ভেতরে ॥

অধেন্দু মল্লিক

কুয়োমিণ্টাং কুয়োমিণ্টাং

চল্লিশ বাঁক পথে পথে ঘুরে
জোনাকির মতো জলে পুড়ে উড়ে
দেখি রাত শেষ দেহ-লঘুভার
ধূয়ে মুছে গেছে যতো চিৎকার
এদিকে তাকাই ওদিকে তাকাই
এইখানে থামি ওদিকেও ধাই
করি গুঞ্জন গুনগুন গান
কুয়োমিণ্টাং কুয়োমিণ্টাং ॥

শালিখ শুধায় ফড়িং শুধায়
কোন লেখা নেই পূজা সংখ্যায় ?
তবে আর তুই কবিটা কিযেই
মরা ভালো তোর কলম পিষেই
বাঘে থাক তোকে সজ্জাকতে থাক
ওরা বলে ছ্যা ছ্যা ওয়াক ওয়াক—
এমনি তামাসা চলে দিনমান
কুয়োমিণ্টাং কুয়োমিণ্টাং ॥

এর ওর দুয়োরে দিয়ে যাই উঁকি
আলাপ বন্ধ, নেই কোন ঝুঁকি
শত্রু রয়েছে বন্ধুও চের
উত্তর যায় পত্রাঘাতের
বিছানায় বোদ আনলায় হাওয়া
অনন্ত দান অনন্ত পাওয়া

শতভিষা

কমা ক'রো, আমি কমা করলাম
কুয়োমিটাং কুয়োমিটাং ॥

মা আমার বকে ঈষৎ সতত
কি বকিস তুই পাগলের মতো
আমি বলি মাগো চূপ করে শোনো
না হয় দূরের তারাদের গোনো
জীবনে আমার নেই কোন ফাঁকি
নিরেট সত্যে জমে গেছে আঁখি
সেই বোঝে মাগো আছে যার প্রাণ
কুয়োমিটাং কুয়োমিটাং ॥

হা-হা হাসি পায় হো-হো হাসি পায়
আকাশ পথের শেষ সীমানায়
বসেছে বাজার রাজার শহরে
আদরে ধমকে গ্রহরে গ্রহরে
চাবুকে মোহাগে কেনা-বেচা হয়
কারো লোকসান কারো সাশ্রয়
টেঁচায় কপণ থোয়া গেছে দাম
কুয়োমিটাং কুয়োমিটাং ॥

বেজেছে ঘণ্টা তবে সখা যাই
বলার মাত্র এই কথাটাই
কৃতও সত্য কৃতিও সত্য
তুই দে উড়িয়ে তথ্যাওথা
কে জানতে চায় তুই কি প্রাচীন
জীবিত কি মৃত অমর নবীন
সেটা নিজস্ব যেন তো'র স্বান
কুয়োমিটাং কুয়োমিটাং ॥

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ঋত্বিক ষটক

নক্ষত্রমালার দিকে উড়ে যায় একটি মাহুঘ,
তার নীল জামা উড়ে হয়ে যায় প্রকৃত আকাশ—
সেই আকাশের নীচে অগ্নি সব মাহুঘেরা থাকে ।
গ্রীষ্ম ও শীতের ফাঁকে, নিটোল কাজের ফাঁকে ফাঁকে
হঠাৎ দেখেছে তারা বা হঠাৎ দেখতে চেয়েছে—
নক্ষত্রমালার দিকে উড়ে যায় একটি মাহুঘ ।

নতুন নক্ষত্রোপম সেই মাহুঘের দিকে চেয়ে
কখন ধানের বুক টনটন হুধে ফুলে ওঠে,
ঈর্ষায় স্থনীল হয়ে আসে সপ্ত সাগরের মূখ,
কুয়াশার অভিমানে ঢেকে যায় সম্পূর্ণ পাহাড়,
নীলিমায় ভাসমান সেই মাহুঘের দিকে চেয়ে
মাহুঘ সমস্ত ভুলে নারীকে 'নীলিমা' বলে ডাকে ।

পৃথিবীর কাছে ছিল । আমাদের চেয়ে কিছু কাছে ।
আয়তনবান হয়ে স্বদেশের মানচিত্র হয়ে
বহুতা নদীর ঢলে, উদার সবুজে, রুক্ষ মাঠে
ভাঙা বাঙলার রক্তে ললাটে উদয়ভাসু জেলে
গ্রেমের, জালায় মত গভীরে আসক্ত হয়ে ছিল ।

আকাশ কি ভুল ক'রে এসেছিল পৃথিবীর কাছে ?
আকাশের ঘাসে ঘাসে তার নীল জামা গুয়ে আছে ।

তারাপদ রায়

ফুল হবে

আমরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনি
মাধবীলতার কেটে ফেলা ডাল
সবাই বলে লাগিয়ে দিলেই গাছ হবে,
গাছ হবে, ফুল হবে ।
কিন্তু দুঃখের বিষয়
আমাদের যত্নে লাগানো গাছে
কোনো শিকড় গজায় না,
পাতা শুকিয়ে ঝরে ঝরে শুকনো কাঠির মত
আমাদের মাধবীলতার গাছ,
আমরা বারবার রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনি ।

মঞ্জুশ্রী দাশ

একটি কবিতা

কালো জলে যখন ছিটেফোটা ঝিলিক

ভেসে যাওয়া লিলির মত

কিছু সৌগন্ধ কুড়িয়ে পেয়েছি

রাত্রির ভেজা বাতাসে

কুঁড়ি

একটু একটু খুলছিল।

উইলো গাছের ঝরো-ঝরো শাখায়

কেমন এক নৌডের আশ্বাদ

মুঠো মুঠো বরছিল।

মুখে লাগছিল

শিশির থেকে কিছুটা কনিয়াক সময়

নদীর হলুদ চলা

ঘাসের কাছে উপচে পড়ছিল।

খোয়াই-এর আশেপাশে মুচকুন্দ পাতায়

বৃষ্টির ছাঁট

চারধারে বৃষ্টির ছটা।

ফোঁটা ফোঁটা নিবিড় গাছের ছায়া

পুঁই মাচানে—সরু মেঠো পথে—

জলপাইবন আর পিয়া শালপিয়ালের

আনাচেকানাচে

গোধূলি ঘাসের কোন নীলচে গেলান থেকে

বাতাবীলবুর মত আশ্বাদ

মোরগ ফুলের পাপড়ির ভেজাভেজা স্বর

মুঠো মুঠো কুড়িয়ে পেয়েছি।

শান্তিকুমার ঘোষ

অভিযাত্রা

তিমি উপসাগর ছাড়িয়ে কবে শুরু হয়েছে যাত্রা
পিছনে প'ড়ে রইলো দুর্গের মতো বরফের পাহাড়
গ্রীষ্মের আরম্ভে তখন সিন্ধুঘোটক খেলা করছিল জলে
বরফের উপর মিছিল বেঁধে হেঁটে গেল পেঙ্গুইন
হিমবাহের মধ্য দিয়ে টানা পথ গেছে দক্ষিণ দিকে
কালো হোঁরা আর তেলের সন্ধানে

একে-একে নেমে এল তুষার-ঝঞ্ঝা, হাড়-কাঁপানো শৈত্য
অভিযাত্রার পথে
কুয়াশা অঙ্ককার ক'রে ফেললো দিক-দেশ
তবু এগিয়ে চলে দল
একটার পর আরো একটা.....
কেননা, জলদস্যুর রক্ত তাদের ধমনীতে
যদিও ঝড়ে অকেজো হ'য়ে গেছে জাহাজ
তুষারে ডুবে যাচ্ছে পা
অসাড় আঙুল
যদিও স্নেজ বুঁকে পড়েছে খাদের উপর
খানিক আগে যেখানে অদৃশ্য হ'ল শেষ মস্কোলিয়ান টাটু

তবু চুপকৈর মতো টানছে মেরুকেন্দ্র
টানছে নিস্তব্ধ চিবশীতের গোটা রাজ্য
এমন কি প্রিয় কুকুরগুলো চাইছে
সবার আগে পৌঁছিতে মেরুবিন্দুতে

সামন্তল হক

প্রতিবাদ

অরণ্যে ফোটারো জ্যোৎস্না বলো কার বিরোধিতা আছে
পাতালে ওড়াবো পাখি বলো কার বিরোধিতা আছে
আমি কি ঝাঁকিনি ভুলে চুষকের যোগ্য ব্যবহার
আমি কি ধরিনি দাঁতে হলুদ শস্যের ব্রহ্মগ্রীবী
মরুভূমি নিঙড়ে নিয়ে সমুদ্রকে দিয়েছি অঞ্জলি
বৃক্ষের শিকড় কেটে মালা গেঁথে বনদেবতাকে
উপহার দিয়ে বর পাই পুষ্পশোভিত পৃথিবী
সত্যকে দিয়েছি দীক্ষা ছাথো হাতে সোনার ত্রিশূল
অরণ্যে ফোটারো জ্যোৎস্না বলো কার বিরোধিতা আছে
পাতালে ওড়াবো পাখি বলো কার বিরোধিতা আছে
হঠাৎ আড়াল থেকে ব্রহ্মণ্য গজর্ন শোনা যায়
বুনো তেতো কচুপাতা বলে আমি বিরোধিতা করি
জলের গজর্নে যেন রোদের বারান্দা ভেঙে পড়ে
পচা ডোবা বলে ওঠে আমি এর বিরোধিতা করি
আর কাঁধে অন্ধ খজ বুদ্ধি মাকে ঝাঁকড়ে ধরে রেখে
কবিতাও বলে ওঠে আমি এর বিরোধিতা করি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোধূলিধূলোয়

মুখে ভূষা কালি, মাথা অর্ধেক কামানো, খচরের পিঠে পিছুমুখো—

তিন দিকে একশো উল্লাস—

সোজা দিয়েসো ফটক পার করে—এইভাবেই

আড়াআড়ি বাঁধা হাত, এইভাবেই বৈরিতার মোকাবিলা—আর

মাৎস্য বা জিঘাংসা নেই : শত্রুর জরিপাড় কাঁচের পর্দায় ভেগে আছে—

স্বর্ণগর্ত

চলেছে উটের সার সীমানা ডিঙিয়ে, পেটকোঁচড়ের মধ্যে আলো……

আজকের মতন

ঝরকা বুলছে, ঠিক ৫টা ২৬ শে

সূর্যের দফতর বন্ধ ! ভয় নেই, বিদ্যাহীনতা রুখে আনাচেকানাচে জেনারেটর……

দেবাজ

খুলতে বেরিয়ে পড়ল সান্দ্যমানা পূর্ণ যুবতী—হাস্যমুখী……বিশ শতাংশ শতাব্দী

মেয়েদের হালফ্যাশন, না-হোক অর্ধেক ছাড় দিয়ে

আন্ত লোম, তেজীয়ান ওবুধ ……

কাঁচের পাতের মতো শান্ত পাড়া—অগভীর কাকচক্ষু মীনপথ—আর

কিছু নেই—মাৎস্য, অন্তর্ঘাত, ছুঁচ পড়ার আওরাজ কানে বাজে—

ঠিক ৫টা ২৬ শে-ই দোরে দোরে—অন্ধকার বুলছে,

খাঁ খাঁ পথ……

কোথায় গিয়েছে সব ?—সার্ববাহ, পুঁটির রূপালি, যুবতীর

মোমকাঁপা ঠার রেণু রেণু হয়ে উড়ে যায় গোধূলিধূলোয়

ফটক পেরিয়ে—আবো—শহরতলির গৈয়ো পথ নিঃসঙ্গ জন্তুর মতো স্নান

চলেছে, সর্বাঙ্গ তারও গোধূলিধূলোয় ভরে গেছে……

সত্যেন্দ্র আচার্য

মধ্যাহ্নেই রজনীগন্ধা

(শংকর চট্টোপাধ্যায়-এর স্মৃতি-কে স্মরণে রেখে)

সন্ধ্যায় সাজাব ফুল কথা ছিল
মধ্যাহ্নেই রজনীগন্ধা কিনে আনি ।
বিপুল সম্ভারে বসিয়ে রেখেছি মূর্তি
সিংহাসনে । ঋষির সম্মানে ।
সবাক চিত্রের নিচে
নীরব দর্শক বসে গেছি ।

অতন্ত্র শৃঙ্গার মত অকম্পিত ছায়া
জুড়ে থাকে দর্পণ । সৃষ্টি বেদীমূলে
দুঃসাহসিক স্পর্ধায় নিরুপম দ্যুতি হয়ে জলে ।
দর্পণে তাকালে চোখে পড়ে—
বৃহদারণ্যের বনস্পতি গতিরুদ্ধ । তারপর
অনন্ত আলোকে আনন্দের ধারা
ছড়িয়ে দিতে দিতে
বনস্পতির ভালবাসা আগামীকালের স্মৃতি হয়ে গেল ।

বন্ধ দরজা খুলে কোনদিন মুখোমুখি দাঁড়াবে না সে
বন্ধ কপাট খুললেই চোখাচোখি ।

কালীকৃষ্ণ গুহ

দেখা

(অশোক দত্তচৌধুরী-কে)

অনেকদিন পর আমাদের দেখা হ'লো ।

‘কবিতা লিখে কিছুই হয়নি আমাদের’ এই কথা ব'লে তুমি কঁজো হ'য়ে

হেঁটে যেতে লাগলে

‘কবিতা লিখে কিছুই হয়নি আমাদের’ এই কথা ব'লে আমি কঁজো হ'য়ে

পাশাপাশি হেঁটে যেতে লাগলুম ।

চারদিকে তখন চৈত্রমাস সূচিত হ'য়েছে—অন্ত কোনো ভাষা নেই—স্মৃতিহীনতার

মতো চৈত্রমাস ।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

পশুপক্ষী বিষয়ক

উট

কী ভীষণ একা তুমি, চলমান নিস্তব্ধতা— যেনবা পতনশীল নক্ষত্র

শূন্যেতে ঝরে যায়...

সহযাত্রী নিজেরই দেহের ছায়া—ক্লান্তিতে মগ্ন, হাঁটো অনাসক্ত

দৈবের নির্ভর

অস্পৃশ্য জেনেই দূরে সরে গেছো মাহুষের, জীবিতের বিস্তীর্ণ মৃত্যুর খুব কাছে ?

নগর বা দেবালয় থেকে দূরে অনন্তের কোলে শুয়ে থাকি বিশ্বের নিষ্কাম নির্জনে ?

গৃঢ় কোনো অভিমানে ? কে জানে পৌঁছোবে তুমি কোনোখানে কোনোদিন !

কিসের সন্ধান

পোড়াও শরীর, তৃষ্ণা আকণ্ঠ বহন করো ? জলন্ত বালুকা পায়ে দলে

হাঁটো আদিগন্ত জুড়ে ঘুরে ঘুরে : ঝড়ের কঠিন ক্রোধে হৈর্ষ্য না হারিয়ে

হও মুখোমুখি, আর

শতভিষা

স্থণাকে শাসন করো বিপুল বিরুদ্ধে যুদ্ধ—এইভাবে বস্ততা জানাও
দৈবে, হৃদৈবে, প্রভুত্বকারী মাহুকের কাছে ;

এমত বিয়াবহীন পা ফেলা, টিকিয়ে রাখা অস্তিত্ব নামীয় ছেঁড়া শোশাক
নিঃশব্দে ধুঁকে ধুঁকে

পায় হয়ে যাওয়া স্বর্ণমুহূর্তের ফলভারে নতজীবনের পাহাড়পাদপের দেশ

অমকমে

বৈরপ্রকৃতির মুক্ত আপাতসম্মোহে আত্মবিসর্জনই কাম্য বলে মনে হয় ; .

মরে

জীবনে জৈবিক রীতি ; সস্তার সার্বিক স্বত্বসস্তার ক্রমশ মৃত ;

পাণ্ডুর বিধানের মর্ষকারী

একক সস্তার ভার গুরুভার মনে হয় ; হুয়ে পড়ে, পদে পদে মরে !

‘কে নেবে দুর্বল বোঝা অভিশপ্ত অস্তিত্বের ?’—প্রতিধ্বনি ফেরে

শূন্য চরাচরে, নিঃশব্দ প্রান্তরে !

রক্তেশ্বর হাজরা

পার্ক—বিকেল

শিশুরা বেড়াতে গেছে পার্কে বিকেলে
সকল জমেছে খুব পাতাদের
দেহের উপরে রোদ্‌—পড়ে আছে স্পষ্ট দৃষ্টমান
যেহেতু অবলা তাই প্রধানত ভ্রমণের বেলা
পাতার শরীরে হাওয়া পার্কে—বিকেল
সকল জমেছে খুব
পাখিদের
প্রত্যাবর্তনের
সময়ও হয়েছে—

শিশুরা বেড়াতে গেছে পার্কে বিকেলে
সকল কমেছে খুব
রোদ্‌র
যাবার সময় হলো—স্পষ্ট দৃষ্টমান
বুড়োরা হয়েছে আরো বুড়ো
তথাপি ঘোষণা করে কারা
সময় হয়েছে
পাখিদের
প্রত্যাবর্তনের—

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

লাল-পিঁপড়ে

লাল-পিঁপড়ে, যখনই তোমাকে দেখি
 মনে পড়ে আমার পিঁপড়ে জন্মের কথা ।
 তোমার চেয়েও কত আন্তে আন্তে আমি
 ঠেলে নিয়ে যেতাম ছোট্ট এক চিনির দানা
 আর এইটুকু এক ছোট পিঁপড়ে-বোঁ
 অপেক্ষা করতো কখন, কখন ফিরে আসবো
 ঝুঁকুয়ে ঘরে,
 কোনদিনই এসে পৌঁছতে পারতাম না আমি ।
 লাল-পিঁপড়ে, আমি সেই জন্মের কথা লিখিনি কখনো,—
 আজ যখনই তোমাকে দেখি, আমার মনে পড়ে
 আর একটা সামনের জন্ম, পিঠের দুপাশ দিয়ে
 ঝুলে পড়েছে বিশাল চিনির বোঝা, টলতে টলতে
 এগিয়ে চলেছে বলদ, পৃথিবীটা হয়ে উঠেছে
 বিশাল, চৌকো এবং লম্বা আর তার ঠাণ্ডা মরা চোখের ভেতর
 ভেসে উঠছে তার গত জন্মের কথা, যখন
 সে হাঁটতো ছ'পায়ে, যখন
 তার দুটো হাত ছিল, যখন
 খবরের কাগজ না এলে কিড়মিড় করে উঠতো দাঁত, যখন
 হাজার হাজার ঘণ্টা অদ্ভুতভাবে বেঁচে থেকে
 একদিন তাকিয়ে থাকতো লাল-পিঁপড়ের দিকে, যে ছিল
 তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী পরিষ্কার, যে
 করতো কাজের মত কাজ—একটা চিনির দানাকে
 ঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণে নিয়ে যেতো
 আর ফিরে এসে
 আবার বেরিয়ে যেতো আরো একটা চিনির দানার খোঁজে ।

পায়ের মণ্ডল

মন্দির

একলা মন্দির

তার চূড়ায় পড়েছে চাঁদের আলো

হলুৎ জোৎস্না—

প্রার্থনার সময় পার হয়ে যায়

কেউ আসে না

তখন ছিল এখন নেই

পথ

সেই পথ

হারিয়ে আছে ঘাসের আড়ালে

আলো জলে না

শাঁখ বাজে না

ফুল না ধূপ না

প্রার্থনার সময় পার হয়ে যায়

অশোক দত্ত চৌধুরী

সেই ঘর

(প্রিয় কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়-এর অকাল মৃত্যুর উদ্দেশ্যে)

এই বেঁচে থাকা, যতদিন আসে হাওয়া বিকেলে অলস
একটি দুটি পাখী অথবা সেই কাক অভুক্ত দিনমান, উড়ে আসে
খুঁটে খুঁটে থায় হলুদ বাদাম, চারিধার।
আর যেন সেই ঘর, ক্রমশ ছায়ার দীর্ঘায়ত হাত
স্পর্শ করে সোনালী কলম, ডায়রীর শেষ লেখা
যে-রকম সেও জেনেছিলো একদিন, চৌকাঠে দু-এক পাটি চটিজুতো
পড়ে থাক নিৰ্জীব, আমাদের ছেড়ে যেতে হয়, হবে

কেউ নেই, এক বিকেলের থেকে অন্য বিকেল দীর্ঘ করে ছায়া
আরো কতদিন
মাঝে-মাঝে মনে হবে সেই ঘর, ঘুম, মৃত্যুর নির্বেদ।

রাণ। চট্টোপাধ্যায়

ভেজা গাছ, নক্ষত্রে মিশে যায় সুখ

সুখ এখন ধরাশায়ী তোমার হাতে
বৃষ্টির ভেতর ভিজে যায় শরীর, ঘরে ফিরি—বিদ্যুৎ চমকায়
প্রতিচ্ছবি কাঁপে—অন্ধকার রাত ভেজা গাছ থেকে বরে পল্লব
দুঃখ পারিজাত মালা হয়ে মিশে যায় কোথায় ?

ভয় নেই কেউ তোমার সুখ ছিনিয়ে নেবে না
আমি নিয়েছি রাত তোমায় দিলাম সঁজুতি ব্রত
আহত পাখির ডানায় তুমি দিও ডেটল...

আমার প্রতীক্ষা স্থখের জন্ত, ভেজা গাছ
যৌবন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া প্রসিদ্ধ রমণী,
অলস দিন যায়
বৈশাখের শেষে খমখমে আকাশের মুখ, ঝড় ওঠে
ধূলোর ঝড়, আমার মন খারাপ করে

শতভিষা

অকাৰণ হেঁটে ঘাই সীমান্ত অবধি, দেখি নক্ষত্রে মিশে যায় স্বথ !

কেউ ভাকেনা আমায়, বুকে রাখে না হাত
বলে না তুমি রাজা হবে, রাজা, রাজা,
এখন তাই শুয়ে থাকি বিকেল বেলায়, ফিরে আসে শৈশব
ছোট্ট ঘরে যা যখন পুরান তোরঙ্গ খুলে
স্বথ বার করতেন, শৈশবের স্বথ
যখন লাঠিম নিয়ে চলে যেতাম সাহেব বাগানে
কে যেন আমায় বলতো ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার ভেতর
ভেজা গাছ থেকে টুপ-টাপ দুঃখের শব্দে
তুমি রাজা, দুঃখের রাজা, রাজা...

স্বথ এখন ধরাশায়ী তোমার হাতে
আমি দেখি ভেজা গাছ, দূরে অল্পষ্ট ছায়া স্বথের বয়স
নক্ষত্রে মিশে যায়...

স্বামী মজুমদার

আমার করার যা তাই করছি

আমার করার যা তাই করছি, এবার তোমার দায়
কেমন ক'রে রাখবে তুমি, কেমন ক'রে পথের মধ্যে আমায়
নিয়ে যাবে রোদু'রে হোক, বৃষ্টিতে হোক, কিংবা
অমাবস্তা আর পূর্ণিমায়, আমার দারুণ সুখের দিনেও ভাবা
তুমিই আমায় নিয়ে চলো তোমার ছায়ার নিচে
আগলে আছি দিন-রাত্তিরে, গুরু হয়ে, স্তম্ভ হয়ে নিজে
রক্ষা করছ সব মুহূর্তে, আমার ভয়ের দিনে হাসছ দূর
থেকে, আমার কাজের বেলা যখন হঠাৎ বেল্লুর
বেজে ওঠে, বুঝি তুমি ইচ্ছে করেই খেলছ আমায় ঘিরে
আমার করার যা তাই করছি, এবার আছি তোমায় দিকে ফিরে
এবার তুমি শান্তি নামাও, স্পষ্ট ক'রে এবার জীবনভর
প্রাণে আমার তোমার আলো নামুক নিরন্তর ।

রথীন্দ্র মজুমদার

স্মৃতি, তুমি স্থির হও

তোমাকে কোথায় রাখি ?

বুকের ওপর উঠিয়ে নিয়েছি যেন মৃতি

নামাতে পারিনা...

খেলা ? বাল্যকাল চলে গেছে, কবে ?

স্তরে-স্তরে স্নায়ু-শিখা নিশ্বাস, উত্তাপ জ্বলে, নেভে

আজ বাতাস উঠেছে

ডাল-পাতা, শিরায়, শরীরে ঢেউ

ভিতরের দিকে রক্তে চলে যাই

ফুঁ দিই বাশি —

দাঁতের কামড়, কোথায়, কে ডাকে ?

আমাকে দেখতে দাঁও দীর্ঘকাল আড়ালে রয়েছি

তবক ছিঁড়তে চাই দুই হাতে, তবকের পরের তবক :

জিভে, ঠোঁটের চোবনে শাস, শুক্ক সস্তাটুকু

অন্ধকার রক্তে কাঁপে প্রাণ

একটু সময়, রাত যায়-যায়, আরো একটু, কয়েকটি মুহূর্ত

ভেসে যেতে যেতে টান শিকড়ের বিছাৎ বললে ওঠে...

কে এসেছে, রোমকূপ-জাগা-বুকে মূখ, চেখে জল ?

স্মৃতি, তুমি স্থির হও !

শতভিষা

পার্থ রাহা

তখন রাত্রি নেমেছিল

তখন সমস্ত আকাশ জুড়ে রাত্রি নেমেছিল

আর সময় সে সময়

তার বিশাল ছায়ায়

প্রত্যেক মানুষ তার বুকের ভিতরের

চোদ্দ বিঘা জমির

তার নির্ধারিত রমণীয় প্রাত্যহিক ব্যবহার

দলিল-দস্তাবেজ হিসেব নিকেশ

বংশানুক্রমিক সিন্দূকের

দরজা খোলার শব্দে

হুশো ছত্রিশটা অস্থি-র

সম্মিলিত আর্তনাদ

প্রত্যেক মুহূর্তে যেন প্রত্যেকেই নতুন জন্মের স্বাদ

নিতে চায়

অথচ রাজ্যের ছায়া আঁধো

টেলিগ্রাফ তারের মত

এদেশ-বিদেশ জুড়ে লাবেকি সটান

কে জানে কখন বুকের ভিতরের সেই

সমস্তে লালিত লাল হিসেবের খাতা

বিরাট সিন্দূকের কোন

অঙ্ককার কোণে

একমাত্র নিজেকেই চিনে নিতে হয়

হয়তো সে ভাঁজ করা লাল খাতা কোনদিনই

সিন্দূকের দরজা পেবিয়ে

হিসেবী চোখের সামনে

কোনদিনই ধরা দেবে না

অথচ প্রত্যেক মুহূর্ত জুড়ে অস্থির ঘটনাবলী চিরদিন স্থির হয়ে আছে।

অশোক চট্টোপাধ্যায়

বিষয়

কেউ কেউ স্বাভাবিক নয়

সমস্ত বয়েস আর শ্রোতের আড়ালে

কোন সহজ সবুজ ঝোপ জেগে থাকে

হাওয়া থাকে রোদ থাকে পাখী গান গায়

পাখীর অফিস নেই বাড়ী নেই রাত নেই

মাঝরাতে ট্যাক্সি পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন নেই

ঘড়ি নেই এবোপ্লেন নেই

পাখী প্রবন্ধ লেখে না

কিন্তু এসব কোন বিষয় নয়

সেই রাজবাড়ী সাজানো বাগান

শ্রাওলাধরা উলঙ্গ রমণী

সেহুগুলো ভেঙে গেছে

পূর্ভমন্ত্রী অত্যন্ত তৎপর

কিন্তু এসব তাঁর বিষয় নয়

যেখানে পাখীও ওড়েনা

সময় শুধু সময়ের বিরুদ্ধতা

কথায় কথায় গড়ে ওঠে

রাজবাড়ী বাগান মন্দির মন্দিরের কারুকাজ

কিভাবে সমস্ত কিছু গড়ে ওঠে ভেঙে যায়

আবার ভাঙার জন্ত গড়া শুরু হয়

এসবই সহজে ঘটে তবু এসব কোন বিষয় নয়

যা দিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়

‘শতভিষা’

সুব্রত রায়

এই দিন ১৯৭৬

কঠোর বিরোধ তাঁর সপরিবার, উত্তাল এ কোন্ ঝলসানো
অশান ?

চণ্ডাল বিকোর না কাঠ, শুধু ধু ধু চিতা সর্বাঙ্গ হুন্দর ।

কে কাকে পোড়াবে এবার ?

—দেশ ছেড়ে কিনা তর্ক করে না ; অশান ছাড়ারও পাড়ি !

এ বকম মাঝে হ’লে নিরাশ্রয়,

আর্তনাদ থেমে যায় পুরোপুরি ভাবে ।

এই দিন ব্যথার গৌরব নিয়ে চলেছে ।

প্রমোদ বসু

ঐশ্বরিক অনুভূতিমালা

প্রভু আড়াল করলেন ঐশ্বর্য, আলো ধরলেন
অহংকারের মুখে

গর্বোদ্ধত চোখ হারিয়ে ফেললো দৃষ্টি
গর্বোদ্ধত বুক গুড়ে হল ছাই

প্রভু নিঃস্ব করলেন স্বপ্নের আধিপত্য
ঘুম চাইলো ভুল
যার ভুলই বিস্মরণ

স্বতি দেখলো তাঁর গোপন সর্বজ্ঞ কাঙালী বসন !

শেখর গঙ্গোপাধ্যায়

পারাপার

মাঠটুকুই বিপদ ।

সারাক্ষণ সূর্যের অক্ষান্ত হিংস্রতা

দহন করে শব্দকে নির্মম ।

তার ওপারেই আছে বাড়ির

স্নিগ্ধ অবকাশ, সন্ধ্যার

নির্জন শান্তি ।

কামিনী ফুলের ম-ম গন্ধে উত্তাল জ্যোৎস্না ।

এপারে ঘোরলাগা অশেষ দুপুর

চোরাগর্ভের ফাঁদ পেতেছে নিষ্ঠুর,

রক্তপাতহীন হত্যার শেষ উপকরণের চিতা

জলছে আমাদের সব থেকে দুঃখের দিনে,

অথচ ওদিকে

স্বর্ণার রূপোলী অবসরে মুখ দ্যাখে প্রিয়তম চাঁদ,

মাঠটুকুই বিপদ ।

গৌতম বসু

চিঠি

১.

খোলা বই, গত পুজোর পাপড়ি ।
বন্ধ বই, মলাটের পুরোনো খবর ।
মলাটের পুরোনো পাপড়ি, গত পুজোর খবর
পদ্ম কাঁচ, গর্ভে বাদামী জ্বলছে ।

২.

হিমচোখে সেও এনেছে
হাত ভ'রে বালির নিশ্বাস
প্রতিদিন ; দোরগোড়ায় এলোমেলা ছাঁট
কেউ আনন্দ নই এতো সহজ প্রবেশ
কেউ আর কথা নই

৩.

মেঘলা ছুটি,
দেখা হবে আরাধনায়
ভূমি মন্ত্র ডেকে আনো, সিঁড়িতে দুপুর ব'সে
পরিচয় খসে আসা একরাশ পাতার প্রণাম
অচেনায়
উদগ্র চুড়ায় বেড়ে ওঠে ঋণ
গোলপোষ্ট, পরিত্যক্ত চাট
পরিত্যক্ত শবের মতো মাঠ—
পেরিয়ে যান ধর্মরাজ, পায়ে পায়ে বিশোক কুকুর

অভিরূপ সরকার

আবর্তিত ভ্রমণ

আমপাতা, মৃগয় পাথর, সহজ আগুন
কতদিন ঢেউ জলছে, কতদিন শৃঙ্খলা জলছে
আমপাতা, বিস্তীর্ণ পাথর, ক্রান্ত আগুন
অনেক মাসলিক পেরিয়ে এলুম।

কবে একদিন বৃষ্টি হলো
এখনও একটা মাধবীলতার একা-একা নিরাসক্ত উত্তম
ঋতুবদল, তাও শেষ নেই, ধুলো ঘুরছে
আবর্তিত মাসলিক, পঙ্কু মাটি একটা, বৃষ্টি

(২)

ঘরের ভিতর আমরা যখন এ-ওকে ডাকছি,
ঝড় উঠলো। দেখতে পেলুম না কেমন ক'রে
বৃষ্টি এগিয়ে আসছে, ধুলো-ছাই, সবুজ বনানী উড়ছে
ঘরের ভিতর আমরা যখন

এ-ওকে ডাকছি, আমাদের জন্মদিন বড়ো হলো।
বিকেল হলে দিঘি অন্ধি হেঁটে যাওয়া, ফেরার পথে
ধানক্ষেত, নিজ'নতা, মগ্ন ধানক্ষেত
ধুলো আমার রাখাল, আমি চাইব না।

স্বরাজিৎ ঘোষ

অসামাজিক

আমরা ছুঁজনে থাকি বসবার ঘরে থাকে তিনটে চেয়ার
কখন অতিথি এলে ব্যবহার হবে বলে চুপচাপ শূন্য সেজে থাকে
কেউ কারো আত্মীয় হয় না। শুধু যারা যারা এসে বসে
তাদের ওজন মতো কাৎ হয়, হেলে পড়ে আনন্দে প্রগল্ভ হলে ওঠে।
আর যখন সপ্তাহব্যাপী ব্যস্ত থাকি নিজেদের বাগানের কাজে
গৃহিণী সমুদ্র হয়ে আনাচ কানাচ ভ'রে রাখে
বহুদিন বাইরে বাই না বাইরে থেকে মানুষ কি সৌহার্দ্য আসে না
তখন গভীর রাতে কারা যেন জড়ো হয় বসবার ঘরে,
সকলে জায়গা পায় না কেউ কেউ মেঝের ওপরে জোড়াসন
কেটে বসে, শুরু হয় ফিস্‌ফিস্‌ গভীর আলাপ.....

সকালে দরজা খুলে ঢুকে দেখি ছুঁজন চেয়ার খুব গলাগলি
বসে আছে তৃতীয়টি জানলার ধারে মুখ ঘুরিয়ে পেছন ফিরে
যেন গতরাতে লভাশেষে এ'রকম অবস্থান সাব্যস্ত হয়েছে।

বিশেষ নিবন্ধ চিঠিপত্র আলোচনা

সময়েন্দ্র সেনগুপ্ত প্রবোধচন্দ্র সেন শম্ভু ঘোষ দীপংকর দাশগুপ্ত
আলোক সরকার অভিক্রপ সরকার হুজুং ঘোষ

একটি ব্যক্তিগত গল্প রচনা

পৃথিবীতে কোনো বিতর্ক চাকুরী নেই, শুধু ছুটিও কি আছে ! আজকাল ছুটি শব্দটাকে তো আমার প্রায় গুজবের মতো মনে হয় । এবং গুজবে যখন কান দিতেই হবে তখন ছুটির জন্ত একটা ক্রমবর্ধমান আকুলতা, একটা গোপন লম্ভাবনা বাঁচিয়ে না রেখে উপায় নেই ।

আমার আটবছরের ছেলে প্রতি শনিবার রাতে শুতে যাবার আগে বলে, কাল রবিবার, কাল আমার শুল ছুটি । অর্থাৎ তার মা তাকে কাল অগ্ন্যাদি দিনের মতো সূর্যের সঙ্গে ডেকে তুলবেন না । অথচ আমি তো জানি হুচারদিন অসুখবিসুখ বা যে কোন কারণে তাকে শুলে যেতে না দিলে সে হাঁপিয়ে ওঠে, ডাকঘরের বিষয় অমলের মতো জাননা দিয়ে কলকাতার অবশিষ্ট আকাশকে ত্যাগে । স্তব্ধতার রবিবারকে ভালবাসলেও তার মনে ছুটি সম্পর্কে কোনো স্থির ধারণা গড়ে ওঠেনি । এই অস্থিরতারই কি অপর নাম শৈশব ! একটা বয়সের পরে আমরা কি সবাই অল্পবিস্তর শৈশবে প্রত্যাবর্তন করি না । গাঁয়ের অঞ্চল প্রধান নদীটির পাশে মনভ্রমণে বেরিয়ে বলি নদী আমার সেই কিশোর সাঁতার মনে আছে ? বালকলখা গাছটির নিচে বসে জানাই গাছ আমি তেমন ভাল নেই, তুমি কেমন ? নদী কথা বলেনা, তবে স্রোত ও নৌকা দেখে বুঝি এখনো পারাপার চলেছে ছুটিহীন মানুষের । গাছের ফুল দেখে ভাবি এবারেও বসন্ত এলো । হয়তো এসবই ঘুমের মধ্যে ঘটে, কিন্তু এ সেই ঘুম যার মধ্যে স্বপ্ন নামক আগরণটি রয়েছে । রয়েছে বলেই মেঘের কোলে রোদ হাসলে, বাদল টুটে গেলে ছুটির কথা মনে পড়তে পারে । অথচ ছুটি নেই, পরিপূর্ণ একটি স্বাধীন রবিবার, একটি নিটোল হালিডে আজ কতদিন কাছে আসেনি । কী ভীষণ ভালবাসতাম মানুষজনের সঙ্গ, বন্ধুর সঙ্গে তুলকালাম আড্ডা দিতে দিতে একবারও মনে পড়তো না ঘড়ি নামক গরীব সময়রক্ষীটির কথা । তখনতো আপাদমস্তক ঘোঁবন, চলে যায় মরি হায় ঘোঁবন নয় একেবারে দাক্ষন দহন জালা । চতুর্দিকে ছন্দ, ধ্বনি, শব্দের কস্তুরী, প্রতিটি পথের মোড়ে রবীন্দ্রনাথের গান । মনে হ'তো আমরা সবাই আছি, লবাই এরকমই থাকবো প্রিয় হোমো সেপিয়েন ।

কিন্তু তারপরই একটানে গভীর সেই নিরাকার দিনযাপন থেকে কঠিন কঠোর

সংসারের সাকারে উঠে আসা! আজ বুঝতে পারি কি প্রবল ছিল সেই কারেন্সীপ্রবণ পৃথিবীর টান। একেবারে সটান দাঁড় করিয়ে দেখা চাকুরী নামক ধর্মাবতারের মুখোমুখী। দাঁড় করিয়ে দেখা না বলে বোধ হয় দৌড় শুরু করানো বললেই ভাল হতো। কেননা তারপর থেকেই আমি কেবলই দৌড়াচ্ছি, আর সে কি দৌড়, মাটিতে ছায়া পড়ছে কিনা তাও লক্ষ্য করবার সময় নেই। অথচ ছায়ার মতো কাছাকাছি থাকে ছেলে এখনো নতুন নতুন রবিবারের স্বপ্ন দেখে শনিবারে নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে যায়। রবিবার আসে। বিশাল এই কলকাতা সহরের অভিভাবক যে একটা রোগা নদী সেটা তাকে বিশ্বাস করাবো ভেবে গঙ্গাতীরে বেড়াতে নিয়ে যাই, দেখাই পণ্যবাহী জাহাজের বিদেশী মাস্তুল, বহুবার বলা আমার শৈশবের প্রাক্তন নদীটির গল্প আরো একবার বলি। এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে অত্র নদীর গল্প বলতে বলতে মনে পড়ে সেই অসম্ভব কাশফুল, চরের নতুন মাটিতে চীং হয়ে শুয়ে থাকা এক স্থল পালানো নটবালকের কথা। দুচোখে ছোট ছোট অবাক অবিশ্বাস মাথিয়ে স্থল পালানো অতীতের দিকে স্থল না পালানো বর্তমান তাকিয়ে থাকে। এভাবেই রবিবার আসে, চলে যায়। জন্মদিন থেকে আমার দৃষ্টি বাড়ে। অপঠিত থাকে একমাস আগের কেনা বই। অভিমানী রেকর্ডগুলোয় ধুলো গাছ হয়। গানের ভিতর দিয়ে কোথাও যাওয়া হয় না। আমার রয়েছে কাজ, আমার রয়েছে বিশ্বলোক। কাজ মানে হয়তো কালকের একজিকিউটিভ মিটিং-এর প্রিপারেশন, আর বিশ্বলোক বলতে চোখের মণির মতো প্রিয় দুই শিশু, তাদের জননী, আমার আজন্মের চেনা পরিজন। আলমারির কাঁচের ভেতর থেকে কত প্রিয় কবি, কত ভাষাসিদ্ধ পুরোহিত আমাকে ডাকেন, আমি একবারও তাকাই না সেই মোহের দিকে। ছুটি কার আছে? গ্রহ, তারা, ধমনীর বহমান রক্ত, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস কারো ছুটি নেই। তাছাড়া আমি চল্লিশোর্ধ, পৃথিবীতে প্রায় তো প্রবাসী হয়ে এলাম। প্রতিটি ভুলের জন্ম এখন ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়, কষ্ট দিতে ইচ্ছে হয় না কাউকেই। সাতদিনের উদ্বেগান দৌড়ের পরেও তাই ছেলেকে বেড়াতে নিয়ে যাই, রবিবারীয় বাজারের প্রতিটি জিনিস জীব কথামত কিনে আনি। তার ভুল মাপের কেনা অজ্ঞাতব্য নির্বিকার ফেরৎ দিয়ে বদলে নিয়ে আসতে দ্বিধা বোধ করি না। প্রায় প্রবাসী হয়ে ওঠা এজীবন আর কারো সঙ্গে বদলানো যাবে না। অপ্রয়োজনে

কথা বলতে তাই লাগে না ভাল। তবু কারণ অকারণে ছোট ছেলে আপনমনে গান গায়, সেই সুরের ভগ্নাংশে ঘরের মধ্যে উৎসর্গে গঠিত এক ভগ্নকর স্বদ্বন্দ্ব ! লোভীর মতো তার অংশ চাই, কিন্তু কাছে গেলেই লজ্জায় সে মুখ লুকায়। আমি তাকে না থেমে গেয়ে যেতে বলি, চুপ করে থাক। তার দুই চোখ হাসে। ওকে কোলে নিয়ে ঠাকুরঘরে যাই, ওর দাছ দিদা অর্থাৎ আমার মা বাবার ছবির পাশে প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবি ; আশেপাশে বংশাঙ্কুরে জন্মে ওঠা আরো নানান ভারতীয় ভগবানের ছবি। আমার স্ত্রীও ঘরে ঢুকে ওকে গাইতে বলে, আশ্চর্য্য উচ্চারণে রামকৃষ্ণের প্রিয় একটা গান। কিন্তু গানের বদলে হঠাৎ ছেলে মাকে জিজ্ঞেস করে ‘মা দাছ দিদা কি ঠাকুর ? দাছ দিদার ছবি কেন ঠাকুরের পাশে রেখেছো মা ?’ মা বলেন, ‘যাঁরা বেঁচে নেই তাদের ছবি ভগবানের পাশে রাখতে হয়।’ ছেলের প্রশ্ন ‘ভগবান কবে মরে গেছে মা ?’

দার্শনিক, অদ্ভুত, কিন্তু আমি তড়িতাহতের মতো কেঁপে উঠি পবিত্র এই প্রশ্নে। তৎক্ষণাৎ শিশুকে কোলে নিয়ে ছাদে যাই। খুব আন্তে বলি ‘দাছ দিদার তো ছুটি হয়েছে বাবা, তাই তাঁরা তাঁদের বাড়িতে গেছেন ; দেখো একদিন আমারও ছুটি হবে।’

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

চিঠিপত্র

[শতভিষার ষিচদ্বারিংশ সংকলনে প্রকাশিত শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত-এর প্রবন্ধ “বাংলা ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ এবং তারপর” প্রসঙ্গে মাস্তবর প্রবোধচন্দ্র সেনের মূল্যবান চিঠিটি এবারে প্রকাশিত হলো। কথা প্রসঙ্গে শ্রীমেন শ্রীযুক্ত নীরেজনাথ চক্রবর্তী ও শঙ্খ ঘোষ-এর ছন্দ বিষয়ক রচনার প্রতিও দু-একটি সন্তব্য করেছেন। আমরা চিঠিটি তাঁদের দেখিয়েছিলাম। শ্রীচক্রবর্তী কোন উত্তর দেননি। শঙ্খ ঘোষ এবং দীপংকর দাশগুপ্ত-এর উত্তর দুটি এখানে প্রকাশিত হলো। ঐ একই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে শ্রীপবিত্র সরকারের যে চিঠিটি গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো তার যে উত্তর লেখক দিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে শ্রীসরকার একটি প্রত্যুত্তর পাঠিয়েছেন। লেখকের এবারের উত্তরসহ সেই চিঠিটি শতভিষার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রতিদিন আমাদের দপ্তরে বিভিন্ন লেখার বিষয়ে অজ্ঞান চিঠিপত্র আসছে। যোগ্য লেখাগুলি যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক—শতভিষা]

*

উদীয়মান ছান্দসিকদের প্রতি—

শতভিষায় (১৮৮৭ আবার) প্রকাশিত ‘বাঙলা ছন্দ’ প্রবন্ধটি সম্পর্কে সেদিন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে বড় ভাল লেগেছিল। বোধ করি তোমাদেরও ভাল লেগেছিল। তাই তো অনুরোধ করেছিলে আলোচনার সারমর্ম লিখে দিতে। দ্বিধাস্থিত মনে সম্মতিও জানালাম। দ্বিধা কেন না মুখে বলা যত সহজ, লেখা তত সহজ নয়—বিশেষতঃ এই বয়সে যখন ‘পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরুণীতে।’ কিন্তু কথা যখন দিয়েছি তখন লিখতেই হবে। কিন্তু কলম নিয়ে যখন বসলাম তখন হাড়ে হাড়ে টের পেলাম চিত্রগুপ্তের হিসাবের খাতায় আশি সত্যিই আশি-আশি করছে। মন এগিয়ে চললেও হাতের কলম এগোতে চায় না। বসনা চালনা যত সহজ, লেখনী চালনা তত সহজ নয়।

* শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত ও শ্রীমালোক সরকারকে লেখা চিঠি।

তাই ঠিক করেছি সংক্ষেপে কাজ মেয়েই কথারক্ষা করব। অর্থাৎ লাঠি না ভেঙেই সাপ মারব। উদ্বেগটা মহৎ সন্দেহ নেই।

প্রথম চিন্তা কাজের কথাটা শুরু করি কি দিয়ে। প্রবন্ধটা পড়ে এক দিকে যেমন মনটা খুসিতে ভবে গিয়েছে, অন্য দিকে মনটা তেমনি কতকগুলি বিষয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে ‘গুঞ্জরিয়া কহে—নহে, নহে, নহে।’ কাজেই স্থির করেছি—‘মনেরে আজ কহ যে, ভালো মন্দ যাহাই আত্মক সত্যেরে লও সহজে’। কিন্তু ভাল আগে, না মন্দ আগে? সেও এক সমস্যা। শেষে কপাল ঠুকে ঠিক করলাম বাঙালির ভোজের নীতি অনুসরণ করাই সমীচীন। শুরু দিয়ে শুরু, আর মধুরেণ সমাপয়েৎ। এই চিরস্তর নীতি অনুসরণ করলে কারও কিছু বলার থাকে না। বিশেষতঃ পরিবেশনের শেষাংশে যখন ঢালাও উপকরণের সমাবেশ।

প্রথমেই মনে এল আমাদের আধুনিক ছান্দসিকরা কি সত্যিই প্রগতিশীল? কেমন যেন সন্দেহ হয়, যুগে প্রগতিবাদী হলেও চিন্তায় তাঁরা প্রগতিশীল নয়। প্রাচীন ভারতের এক রাজাকে সেকালে বলা হত ‘ধর্মবাদী অধ্যমিকঃ’। আধুনিক বাঙলা ছান্দসিকদেরও কি তেমনি বলা যায়, কথায় প্রগতিবাদী হলেও চিন্তায় তাঁরা প্রগতিহীন? একজন অন্তায়মান জরাজীর্ণ ছান্দসিকের পক্ষে উদীয়মান তরুণ ছান্দসিকদের সমক্ষে এমন নির্মম মন্তব্য করা হয়তো খুবই দুঃসাহসের, এমন কি নিবৃদ্ধিতার কাজ বলে গণ্য হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পরপারের দিকে যে এক পা এগিয়ে দিয়েছে তার আর ভয় কিসের? অতএব—‘ভালো মন্দ যাহাই আত্মক সত্যেরে লও সহজে।’ প্রথমেই বলতে হয় কথায় প্রগতিবাদী হওয়া সহজ, কিন্তু চিন্তায় প্রগতিশীল হওয়া সহজ নয়, বরং কঠিন শ্রম, অধ্যাবসায় ও সাহসের কাজ। আধুনিক ছান্দসিকদের চিন্তায় তারুণ্যোচিত সাহসের পরিচয় পাই না, তাঁদের মন যেন বার্ষিক্যস্থলভ ভীকৃত্যগ্রস্ত। ভাবলে অবাক হতে হয় এঁদের তুলনায় সুপরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তা কত বেশি প্রগতিশীল ছিল, তাঁর মন কত সহজে সাহসিকতায় পূর্ণ ছিল। এবার দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টা বোঝাতে চেষ্টা করি।

ছন্দশাস্ত্র একটি পরিভাষা-নির্ভর প্রাকরণিক বিজ্ঞা। তাই পরিভাষা-প্রয়োগে অন্তর্কর্তা ষটলে ছন্দশাস্ত্রের কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে যায়। দীপংকর দাশগুপ্তের লেখায় এই অন্তর্কর্তাই ষটেছে বারবার। তার একটা লক্ষণ দুই

চিন্তাধারার দু-রকম পরিভাষার একত্র সমাবেশ ঘটানো। ফলে দুই নৌকায় পা-
রাখার যা অনিবার্য পরিণাম, তাই ঘটেছে নানা স্থানে। তিনি স্পষ্ট ক'য়েই
বলেছেন—“এই প্রবন্ধে ‘অক্ষর’ শব্দটি সর্বদাই ‘Syllable’ বোঝাতে ব্যবহৃত
হয়েছে।” কিন্তু তিনি ‘অক্ষরবৃত্ত’ শব্দটি তো syllabic অর্থে প্রয়োগ করেন নি।
কি অর্থে যে করেছেন তাও কোথাও বুঝিয়ে বলেন নি। এই নামে যে ‘ছন্দের
সঠিক প্রকৃতি চেনা যায় না’, তাও অস্বীকার করেন নি। তবু তিনি এই নামটিই
বহাল রেখেছেন তার কারণ “নামটি অত্যন্ত পরিচিত”। এই মনোভাব কি
রক্ষণশীলতারই পরিচয় নয়? নীরেন্দ্র চক্রবর্তী এবং শঙ্খ ঘোষের আলোচনাত্তেও
এই রক্ষণশীলতাই সুপ্রকট। অথচ বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অসংকোচেই বলেছেন
(১৯৩২)—“আক্ষরিক [অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত] ছন্দ ব'লে কোনো অদ্ভুত পদার্থ
বাংলায় বা অথ কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র।...অক্ষরের
সংখ্যাগণনা ক'রে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না।” মজা এই যে,
সিলেব্ল্ অর্থে ই হক আর প্রচলিত বাংলা অর্থেই হক, অক্ষরসংখ্যা গণনা ক'রে
যে তথাকথিত ‘অক্ষরবৃত্ত’ ছন্দেরও মাত্রাসংখ্যা নিরূপণ করা যায় না, এ বিষয়ে
নীরেন্দ্রনাথ, শঙ্খ ঘোষ ও দীপংকর, তিনজনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত। অথচ
উক্ত তিনজনই অক্ষরবৃত্ত নামটিকে প্রথম মমতা সহকারে আগলে রেখেছেন।
কিমার্চর্ম্ম অতঃ পরম্। প্রচলিত রীতি-নীতি বা পরিভাষার প্রতি এই যে মমত্ব-বাধ,
তাকে আর যাই বলা যাক প্রগতিশীলতা বা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি বলা যায় না।

দীপংকর open ও closed syllable অর্থে যথাক্রমে মুক্ত অক্ষর ও বদ্ধ
অক্ষর কথা-দুটি ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় ভাষায় যুক্তাক্ষর ও অযুক্তাক্ষর
আছে, যুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর বলে কোনো বস্তু ভারতীয় ভাষায় নেই। যুক্তাক্ষর ও
অযুক্তাক্ষর কথা-দুটির ইংরেজি হতে পারে, এটুকু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে
অক্ষর শব্দ সিলেব্ল্-এর প্রতিশব্দ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। বস্তুতঃ ভারতীয়
মনে আধুনিক সিলেব্ল্-এর কোনো ধারণাই ছিল না। ফলে ভারতীয় ভাষায়
মুক্তবদ্ধ-নির্বিণ্ণে সিলেব্ল্-বোধক কোনো শব্দের অভাবও অহুভূত হয় নি।
অক্ষর শব্দের দ্বারা অনেক সময় open syllable বোঝালেও কখনও closed
syllable বোঝায় না। ‘প্রাণী’ শব্দের ‘প্র’ যুক্তাক্ষর, ‘তী’ অযুক্তাক্ষর; দুটিই
open syllable। ‘তীত্র’ শব্দেও দুটি অক্ষর—তী, ত্র, যথাক্রমে অযুক্ত ও যুক্ত;

দুটিই open। কিন্তু ‘তীত্র’ শব্দের উচ্চারণরূপ (‘তীব্’ ‘ত্র’) অনুসারে এই শব্দের দুটি উচ্চারণ বিভাগের কোনো ভারতীয় নাম নেই। শব্দের উচ্চারণ বিভাগ মানেই syllable। আমি তাই syllable অর্থে ‘দল’ শব্দ ব্যবহার করি। ‘দল’ শব্দের ধাতুগত আসল অর্থ অংশ, খণ্ড, বিভাগ, সোজা বাংলায় টুকরো। ‘তীত্র’ শব্দকে উচ্চারণ অনুসারে ভাঙলে পাই ‘তীব্’ ও ‘ত্র’ এই দুই টুকরো। সুতরাং তীত্র শব্দের এই দুই টুকরোকে (অর্থাৎ উচ্চারণবিভাগ বা সিলেব্লকে) দুই দল বলা অসংগত নয়। তাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধানের নির্দেশ অব্যাহতই থাকে। ফলে ‘দিন’, ‘মেঘনাদ’, ‘বিক্ষ্যাচল’ ও ‘রবীন্দ্রনাথ’ শব্দকে যথাক্রমে একদল, দ্বিদল, ত্রিদল ও চতুর্দল শব্দ বলে বর্ণনা করলে কারও মনে খটকা লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু উক্ত চারিটি শব্দকে যথাক্রমে একাক্ষর, দ্ব্যাক্ষর ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করলে বিভ্রান্তি ঘটা অবশ্যসম্ভাবী। দীপংকর বলেছেন—

“ভাষাবিজ্ঞানে ‘অক্ষর’ শব্দটি syllable-এর একটি স্বীকৃত পারিভাষিক শব্দ।”

আমার প্রশ্ন স্বীকৃত কবে থেকে ও কোন্ যুক্তিতে? আমি মনে করি ‘অক্ষর’ শব্দ সিলেব্ল-এর পারিভাষিক প্রতিশব্দ বলে স্বীকার্য নয়, কারণ তার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। অক্ষর-কে সিলেব্ল অর্থে গ্রহণের পক্ষে কেউ কখনও কোনো যুক্তি দেখিয়েছেন বলে আমার জ্ঞান নেই। আমি যতদূর জানি আচার্য সুনীতিকুমারই ভাষা-বিজ্ঞান আলোচনায় সর্বপ্রথম ‘অক্ষর’ শব্দকে সিলেব্ল অর্থে প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তার অক্ষকূলে কোনো বিচারসহ যুক্তি দেখান নি। তার বয়সও খুব বেশি নয়, বোধকরি পঞ্চাশ বছরও হয় নি। সুনীতিকুমারের অক্ষবর্তী ভাষাবিজ্ঞানপন্থীরা ছাড়া আর কেউ অক্ষর শব্দকে সিলেব্ল অর্থে প্রয়োগ করেন নি, এখনও করেন না। যারা ‘অক্ষর’কে সিলেব্ল-এর ‘স্বীকৃত’ প্রতিশব্দ বলে মেনে নেন তাঁদের মনোভাব রক্ষণশীলতারই পরিচায়ক, প্রগতিশীলতার বা বিচার-পরায়ণতার নয়। আর যদি একান্তই ভাষাবিজ্ঞানের দোহাই দিতে হয় তবে আমি বলব, তা হলে সিলেব্লবোধক ‘অক্ষর’ শব্দটা একান্তই ভাষাবিজ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যেই থাকুক, হৃন্দের এলাকায় তার অনধিকার-প্রবেশ কেন? যদি তর্কটা এই হয় যে—ছন্দশাস্ত্রও তো ভাষাবিজ্ঞানেরই অঙ্গ, তা হলে আমার পাণ্টা উত্তর হবে—ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ‘অক্ষর’ শব্দের বদলে ‘দল’ শব্দ চালানোই যুক্তি-সংগত। কারণ সিলেব্ল বোঝাবার পক্ষে ‘অক্ষর’ শব্দের চেয়ে

‘দল’ শব্দেরই যোগ্যতা বেশি। মোট কথা, ভাষাবিজ্ঞানেই হক আর ছন্দশাস্ত্রেই হক, আমি ‘অক্ষর’ শব্দকে নিবিচারে সিলেব্ল্ অর্থে মেনে নেবার পক্ষপাতী নই; কেন নই, তা অগত্যা আলোচনা করেছি।

মজার কথা এই যে, আধুনিক ছান্দসিকদের মধ্যে মতবৈষম্য দেখা যায় যথেষ্ট, তাঁদের বিচারপরায়ণতা তথা প্রগতিশীলতার তারতম্যও কম নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। দীপংকর যাকে বলেন মুক্ত অক্ষর ও রুদ্ধ অক্ষর, নীরেন্দ্রনাথ তাকেই বলেন মুক্ত সিলেব্ল্ ও রুদ্ধ সিলেব্ল্ আর শম্ভু ঘোষ বলেন মুক্তদল ও রুদ্ধদল। দেখা যাচ্ছে সিলেব্ল্ অর্থে ‘দল’ শব্দ গ্রহণে নীরেন্দ্রনাথের দ্বিধা আছে, শম্ভু ঘোষের নেই। অস্তান্ত বিষয়ের বিচারেও মনে হয় ছন্দবিচারের ক্ষেত্রে শম্ভু ঘোষের মনোভাবই যেন মোটের উপর সর্বাধিক যুক্তিনিষ্ঠ। কিন্তু এই শম্ভু ঘোষও যখন বলেন—“অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত নামগুলি আয়ে কিছুদিন বাঙলা ছন্দ-বিচারের আসর জুড়ে থাকবে বলে অহুমান করা অসংগত নয়” তিনিও তাই চালাতে চান—তদা নাশংসে বিজয়ায় সজয়। হায় রে, বিচারযুক্তির পথে বলিষ্ঠ পত্তক্ষেপে এগিয়ে যেতে বুদ্ধ ছান্দসিকের দ্বিধা নেই, কিন্তু সাহসিকতায় তরুণ ছান্দসিকেরও কেন এই দ্বিধাজড়িত চরণক্ষেপ? কেন তাঁর কল্পিত কণ্ঠে এই ভীক্স স্বীকারোক্তি? হায় শম্ভু, তুমিও যদি বলিষ্ঠতর লেখনী হস্তে এগিয়ে না আস তবে এই বুদ্ধ ছান্দসিক বল পাবে কোথায়? নিক্রদেশ ব্যতীর পথে তাঁর কানে কি একটুও সাহসিকতার বাণী পৌঁছবে না? শুধু শম্ভু কেন? নীরেন্দ্রনাথ, দীপংকর, বীরেন রক্ষিত, নির্ভীক ছন্দচিন্তার স্বরব্রহ্মি তো তোমাদের হাতেও। তোমরাই বা কেন, কোন্ অজানা জুজুর ভয়ে এমন দ্বিধাযুক্ত? তোমরাও কি শাবিত চিন্তার খড়গাঘাতে রক্ষণশীল সংস্কারের জড়তাকে ছিন্ন করে নিঃসংকোচ বিচারনিষ্ঠার পথে এগিয়ে যেতে পার না? তোমাদের কণ্ঠে তো নিয়তই ছন্দোমুক্তির বাণী শুনতে পাই উচ্চগ্রামে, কিন্তু চিন্তামুক্তির ক্ষেত্রে তোমাদের কণ্ঠস্বরে এমন ক্ষৌণতা কেন?

ওই দেখ, চিঠি লিখতে বসে চিন্তার বলগা কখন যে আলাগা হয়ে গেছে, আর কলম ছুটেছে অপথে বিপথে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। এবার মূল কথায় ফিরে আসি। নীরেন্দ্রনাথ, শম্ভু ঘোষ, দীপংকর, তিনজনেই লেখেন ‘স্বরবৃত্ত’। কিন্তু ‘স্বরবৃত্ত’ কথাটার মানে কি, কেন স্বরবৃত্ত নাম দেওয়া হয়েছিল, আর কেনই বা

তার বহলে এখন 'দলবৃত্ত' বলা হয়, তার কোনো আভাসও তাঁরা দেন নি তাঁদের আলোচনায়। নীরেঙ্গনাথ বলেছেন, যে রীতির ছন্দ মূলতঃ সিলেব্-মাত্রার হিসাবেই গঠিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় তারই নাম স্বরবৃত্ত। এ রীতির ছন্দকে সিলেব-বৃত্ত' না বলে 'স্বরবৃত্ত' বলা হবে কেন, তা তিনি বলেন নি। সিলেব্কে 'দল' বলতে শব্দ ঘোষের দ্বিধা নেই। কিন্তু তবু এ রীতির ছন্দকে 'দলবৃত্ত' বলতে তাঁর দ্বিধা! তাও এক বিষয়। আমার চেয়েও বয়সে কিছু বড় দিলীপ-কুমার এ বিষয়ে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, শব্দ ঘোষের সে সাহসটুকুও হল না কেন ভাবলে দুঃখ ও নৈরাশ্র বোধ হয়।

'মাত্রা' শব্দের প্রয়োগেও ওই একই শৈথিল্য দেখা যায়। 'নীরেঙ্গনাথ বাংলা ছন্দের রীতিভেদে দু-রকম মাত্রার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন—অক্ষর-মাত্রা ও সিলেব-মাত্রা। অর্থাৎ তিনি 'মাত্রা' শব্দকে unit of measure অর্থেই ব্যবহার করেন। তাঁর মতে কোনো কোনো ছন্দের মাত্রা 'অক্ষর' (বিশুদ্ধ বাংলা অর্থে), আর-এক শ্রেণীর ছন্দের মাত্রা সিলেব্। মানে এক শ্রেণীর ছন্দকে বলা যায় অক্ষরমাত্রক বা অক্ষরবৃত্ত, আর অন্য শ্রেণীর ছন্দকে বলা যায় সিলেব-মাত্রক বা সিলেববৃত্ত। এ পৰ্যন্ত তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা হ্রস্পষ্ট, বুঝতে কষ্ট হয় না। তার পরেই পাঠকের মনে খটকা লাগে। প্রথমতঃ মনে প্রশ্ন জাগে সিলেব-বৃত্তকে 'স্বরবৃত্ত' বলা হয় কেন? তার উত্তর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, নীরেঙ্গনাথের মতে অক্ষরমাত্রক ছন্দেরও দুটি শাখা। এক শাখায় 'পশ্চিম' শব্দে 'প' 'শ্চি' 'ম্' এই তিন অক্ষরমাত্রা (বাংলার চিরাগত রীতি অনুসারে), আর অন্য শাখায় 'পশ্চিম' শব্দে চার অক্ষরমাত্রা—'প' 'শ' 'চি' 'ম্' (ববীজ্রস্বীকৃত রীতি অনুসারে)। এ ক্ষেত্রে মনে প্রশ্ন জাগে অক্ষরমাত্রক ছন্দের দুই শাখায় অক্ষর সংখ্যা গণনায় এই পার্থক্য ঘটে কেন? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, বাংলার ছন্দে এই শাখাই যদি অক্ষরমাত্রক হয়, তবে এই দুই শাখাকেই 'অক্ষরবৃত্ত' না বলে এক শাখাকে 'অক্ষরবৃত্ত' আর অন্য শাখাকে 'মাত্রাবৃত্ত' বলার সার্থকতা কি? নীরেঙ্গনাথ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে ববীজ্রনাথও 'মাত্রা' শব্দটি unit of measure অর্থেই ব্যবহার করেছেন সর্বত্র, সমভাবে। তবে তিনি সিলেব-মাত্রা বা সিলেব-মাত্রক ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এই শ্রেণীর ছন্দকে তিনি বলতেন 'বাংলা প্রাকৃত' রীতির ছন্দ। অন্য দুই শ্রেণীর

ছন্দকে তিনিও এক সময়ে অক্ষরমাত্রক বলে মনে করতেন, তাই ওই দুই শ্রেণীকে দুই নাম দেন নি। উভয়কেই তিনি বলতেন 'সাধু' রীতির ছন্দ। এই হিসাবে তাঁর মনোভাব ছিল অধিকতর যুক্তিসংগত। পরবর্তীকালে তিনি 'অক্ষরমাত্রা'র ধারণা ত্যাগ ক'রে ছন্দের পরিমাপ করতেন 'ধ্বনিমাত্রা'র হিসাবে। যাকে আমি বলি 'কলা' (mora), তাকেই তিনি বলতেন 'ধ্বনিমাত্রা'। উচ্চারণভেদে এক শ্রেণীর সাধু ছন্দে 'পশ্চিম' শব্দে তিন ধ্বনিমাত্রা, অত্র শ্রেণীর সাধু ছন্দে ওই শব্দই হয় চার ধ্বনিমাত্রা।

দীপংকরও 'মাত্রা' শব্দকে unit of measure অর্থেই প্রয়োগ করেন। যেমন, তাঁর মতে 'অক্ষরবৃত্ত' পয়ারে থাকে ৮+৬ মাত্রা। কিন্তু কোন্ বস্তুকে তিনি মাত্রা (unit) হিসাবে গ্রহণ ক'রে পয়ার-পঙ্ক্তিতে ১৪ মাত্রা গঠন করেন তা বোঝার উপায় নেই। 'অক্ষরমাত্রা' নিশ্চয়ই নয়, কারণ তাঁর মতে 'অক্ষর' মানে সিলেবল্। তবু তিনি এই ছন্দোত্তীতিকে কেন 'অক্ষরবৃত্ত' বলেন বোঝা কঠিন। যে ছন্দোত্তীতিকে তিনি বলেন 'মাত্রাবৃত্ত', তার unit কি তাও বোঝা দুঃসাধ্য। আর যে ছন্দোত্তীতিকে তিনি বলেন 'স্বরবৃত্ত', তাকেই কেন তাঁর স্বীকৃত পরিভাষায় 'অক্ষরবৃত্ত' বলা হবে না তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শব্দ ঘোষের দ্বারা অসামান্য শ্রুতিধর ছন্দোদর্শী ছন্দের বিশ্লেষণে যে বিস্ময়কর বিচারপরায়ণতা ও ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, পরিভাষা নির্বাচন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর সে বিচার প্রতিভা ও ধীশক্তি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে সনাতন নাম-মালার আড়ালেই আশ্রয় গ্রহণ করল, এটা শুধু যে ক্ষোভের বিষয় তা নয়, তার ফলে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিও শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর ছন্দপ্রতিভার এই দ্বিমুখী আচরণের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নি।

এই তো গেল প্রধান পরিভাষাগুলির কথা। এবার দীপংকরের কয়েকটি গোঁণ পরিভাষার কথা বলি ! 'বৃত্ত' শব্দের প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্র মতে ছন্দের দুটি প্রধান শাখার নাম অক্ষরবৃত্ত (বা বর্ণবৃত্ত) ও মাত্রাবৃত্ত। 'বৃত্তছন্দ' নামে স্বতন্ত্র শাখার অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি সব ছন্দশাস্ত্রেই 'ছেদ' ও 'যতি' অভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। অভিধানেও তাই। ভাবযতি ও ছন্দোযতির জন্ত দুই নাম অনাবশ্যক,

অভিন্নার্থক দুই শব্দকে দুই ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করলে বিভ্রান্তি ঘটে। এক জাতীয় গাছকে বৃক্ষ আর অন্য জাতীয় গাছকে তরু বলা চলে না। ইংরেজিতে sense pause ও metrical pause-এর জন্ত দুই নাম দরকার হয় না। বাংলাতেও ভাবযতি ও ছন্দোযতি বললেই কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে না। ‘স্বর-প্রস্বর’ কথাটা সূষ্ঠ নয়। ‘স্বর’ শব্দ আসলে ‘স্বর’ শব্দের তদ্ভব রূপ। তাই ‘স্বরলিপি’ না বলে ‘স্বরলিপি’ বলা হয়। কিন্তু ‘স্বর প্রস্বর’ কথাটা বিভ্রান্তিকর। ‘গীতিপ্রস্বর’ বললেই উদ্দিষ্ট অর্থ (pitch accent = musical accent) বুঝতে কষ্ট হয় না। Duration accent স্বতন্ত্র বস্তু। বাংলায় বলা যায় ‘ব্যাপ্তি প্রস্বর’। ‘পর্বাঘাত’ বলবার প্রয়োজন কি? পর্ব প্রস্বর (Foot accent বা foot stress) বললেই তো পর্বসূচক প্রস্বর বোঝা যায়। ‘পর্বাক্ষ’ শব্দটাকে সূষ্ঠু মনে করি না। ‘উপপর্ব’ বললেই অভিপ্রেত অর্থ বোঝা সহজ হয়, অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে না। সবচেয়ে আপত্তিজনক উক্তি “অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্ত”। কাঁঠালের আমসদৃশ যেমন অসম্ভব, অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্তও তেমন অসম্ভব। দীপংকর নিজেই বলেছেন, “তখনকার মাত্রাবৃত্ত ছিল প্রকৃতপক্ষে অক্ষরবৃত্ত”; অন্যত্র বলেছেন, “অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্তকে আমরা মাত্রাবৃত্ত মনেই করি না।” তাই যদি হয় তবে অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্ত নামে কোনো অদ্ভুত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজনই বা কি? “অক্ষরবৃত্ত-দু-রকমের—পয়ারভিত্তিক ও অ-পয়ারভিত্তিক”—এই উক্তিটাও বিভ্রান্তিকর। মনে হয় দীপংকরের মনে ‘পয়ার’ নামের অর্থ নিয়েই একটা বিভ্রান্তিকর জটিলতা দেখা দিয়েছে। ‘পয়ার’ আসলে দ্বিপদী চৌপদীর স্থায় একটা ছন্দোবন্ধের নাম। কেন না, আট-ছয় মাত্রার দ্বিপদী ছন্দোবন্ধেরই প্রচলিত নাম ‘পয়ার’। আজকাল আট-দশ মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদী বন্ধ ‘মহাপয়ার’ নামে পরিচিত হয়েছে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ও পরে বুদ্ধদেব ‘পয়ার’ শব্দকে বিশেষ ছন্দরীতির নাম হিসাবে ব্যবহার করার ফলে আমাদের ছন্দচিন্তায় একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। ‘ছন্দ পরিক্রমা’ গ্রন্থে বারবার এই ভ্রান্তিমোচনের প্রয়াস করেছি। ‘কবিতার ক্লাস’ বই-এর শেষ অধ্যায়ে নীবেন্দ্রনাথ নিঃশেষে এই ভ্রান্তির অবসান ঘটিয়েছেন। তার পরেও দীপংকর কেমন ক’রে ‘পয়ার’ নামে এমন অস্পষ্টতা ঘটালেন সেটাই বিস্ময়ের বিষয়। ‘পয়ার’ একটা বিশেষ ছন্দোবন্ধের (৮+৬ মাত্রার অথবা ৮+১০ মাত্রার)

নাম একথা মনে রাখলে সহজেই বোঝা যাবে যে—শুধু তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত নয়, তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত রীতির ছন্দকেও পয়ার ও অ-পয়ার এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

আর পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই। সহজ সত্য কথা এই যে দীপংকরের প্রযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অস্পষ্টতা প্রায় সর্বত্রই তাঁর বক্তব্য বিষয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফলে অবিশেষজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ভাষার অস্বচ্ছতা ভেদ করে লেখকের মূল্যবান সিদ্ধান্তগুলির মর্মোদ্ঘাটন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু যারা তা করতে সমর্থ হবেন তাঁরা যে এট প্রবন্ধ পড়ে প্রসন্ন হবেন তাতে সন্দেহ নেই। অন্ততঃ আমি যে অনেক নূতনতর তথ্যের সন্ধান পেয়ে উপরুত হয়েছি, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতায় আনন্দিত হয়েছি, তা অসংকোচেই স্বীকার করব। কিন্তু চিঠির দৈর্ঘ্য এর মধ্যেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কাজেই ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ পর্বটা ভবিষ্যতের জগ্না মূলতুবি রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবু এটুকু বলা উচিত যে, দীপংকর পর্বযতিলোপের বিষয়টা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করেছেন দেখে খুশি হয়েছি, যদিও ‘যতিলোপের প্রত্যাঘাত’ স্বীকারের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না। আবার রবীন্দ্রকথিত ‘তিন মাত্রার ছন্দে’ উপযতি-লোপের (পর্বযতিলোপের নয়) সার্থকতা অস্বীকার করার কারণও দেখি না। অনেক কাল আগেই এ বিষয়ের আভাস দিয়েছিলাম (দ্র ‘ছন্দ-জিজ্ঞাসা’, পৃ ২৩)। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে পুনরুত্থাপন করা যাবে। আজ এখানেই সংযম অবলম্বন করছি।

রুচির।

শান্তিনিকেতন

১৮ই কার্তিক, ১৩৮২

অন্তায়মান ছান্দসিক

প্রবোধচন্দ্র সেন

সম্পাদক সমীপেন্দু

ছন্দ নিয়ে যদি ছচার লাইনও লিখে বসেন কেউ, আর দে-লেখা যদি চোখে পড়ে প্রবোধচন্দ্র সেনের, সন্দেহ নেই যে তাহলে খুশী তিনি হয়ে উঠবেন একেবারে ছেলেমানুষের মতো। হয়তো তাঁর মনে হয় তখন, তাঁর নিঃসঙ্গ ছন্দ-চর্চার জগতে এই বুঝি একজন সঙ্গী মিলল শেষ পর্যন্ত। এই সঙ্গীর অধিকার কতদূর, সামর্থ্য কতদূর, সে বিচার করবার আর ইচ্ছে থাকে না তাঁর। তিনি হাত বাড়িয়ে টেনে নেন এই আগন্তুককে, আর তারপর, বড়োই বেশি আশা করে বসেন তার সম্পর্কে। আমিও সেইরকমই একজন, অযোগ্য, কিন্তু তাঁর অলৌক আশার পাত্র।

এই দশ-পনেরো বছর জুড়ে বাঙলা কবিতার ছন্দ নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ আমি লিখেছি। লিখবার সময়ে আমাকে ভেবে নিতে হয়েছিল কয়েকটি কথা। আমি কী লিখতে চাই? বাঙলা ছন্দের আলোচনা নির্দিষ্ট একটা পথ পাবার চেষ্টা করছে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে। এই পথ তৈরি করবার কাজে প্রধানতম পুরুষ প্রবোধচন্দ্র সেন নিজেই। তর্কচ্ছলে সঙ্গ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, দিলীপকুমার। ছন্দশত্রু তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন অমূল্যধন কিংবা স্বধাভূষণ অথবা তারাপদ ভট্টাচার্য। বাঙলা ছন্দের শ্রেণী কটি, কী তাদের চরিত্র, কী হওয়া উচিত এদের নাম : এ নিয়ে বিস্তর তর্ক আমরা-ভুনেছি। আমি মনে করি যে প্রবোধচন্দ্রই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাবে এ-সব প্রশ্নের মীমাংসার দিকে পৌঁছে দিচ্ছেন আমাদের, একদিনে নয়, ক্রমশ। তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছেন বিস্তর, পালটে নিচ্ছেন অনেক সময়ে তাঁর পূর্বজন কোনো সিদ্ধান্ত। আজ এই পরিণত বয়সেও সচল আব প্রশ্নাতুর তাঁর মন, অসম্ভব নয় যে তাঁর এই মুহূর্তের সিদ্ধান্তগুলিরও হ'একটি আবার পালটে যেতে পারে তাঁরই হাতে।

পূর্বজনদের এইসব লেখা, তর্ক, বিচার এ-সবই আমবা পড়ছি। কিন্তু আমি কী লিখব? আমার কী বিষয়? বাঙলা ছন্দের শ্রেণী বা নামের তর্ক নিয়ে আমার তেমন কিছু বলবার নেই। ছন্দের আলোচনায় আমার ছিল একটা অন্ত আকর্ষণ। একজন কবি যখন লেখেন, সচেতন বা অবচেতন ভাবে তিনি খুঁকে পড়েন হয়তো বিশেষ কোনো ছন্দের প্রতি। কখনো কখনো এমনও হয় যে তিনি প্রচলিত ছন্দ-রূপগুলিকে ভিতর দিক থেকে ভাঙতে থাকেন নানা পদ্ধতিতে।

আমার কৌতূহল ছিল এইখানে, আমি দেখতে চেয়েছিলাম কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত ছন্দের সম্পর্কের ধরনটা।

কিন্তু এই আলোচনায় পারিভাষিক নামগুলিকে তো আমি এড়িয়ে যেতে পারি না। কী ভাবে তাহলে আমার পাঠকদের বোঝাব যে কোথায় কোন্ ছন্দের কথা আমি বলতে চাই? পারিভাষিক নাম তাই অবশ্যই চাই। আমাকে হয় বলতে হবে তানপ্রধান ধ্বনিপ্রধান স্বাধাতপ্রধান ছন্দ, নয়তো অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত ছন্দ, আর নইলে মিশ্রবৃত্ত কলাবৃত্ত দলবৃত্ত ছন্দ। আরো নানা নামান্তর অবশ্য হতে পারে। প্রবোধচন্দ্র আমাকে ভৎসনা করছেন এই বলে যে আমি ব্যবহার করেছি অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত নামগুলি।

সে কথা ঠিক। অনেক ভেবে, আমার প্রবন্ধগুলিতে এই নামগুলিই আমি প্রয়োগ করছি। কেননা আমার অভিজ্ঞতায় এই দেখতে পাই যে, কবিতা বা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধের পাঠক যারা তাঁরা সহজে বোঝেন এই নামগুলিই। বহুদিনের ব্যবহারের ফলে এর একটা প্রয়োগযোগ্যতা দাঁড়িয়ে গেছে, খুব হাল আমলের বাঙলার ছাত্রছাত্রী ছাড়া কলাবৃত্ত-দলবৃত্ত নামগুলি এখনো সবার কাছে তত পরিচিত নয়। নামসমস্তাই যখন আমার মূল বিষয় নয়, তখন এই নবীন শব্দগুলি এনে কি পাঠকের সঙ্গে আরো অনেকখানি ব্যবধান তৈরি করব? সেটা আমার ঠিক সংগত মনে হয় নি। যেমন ABC-র বদলে XYZ বসিয়ে দিলেও একটি জিঁভুজকে একই রকম ভাবে বোঝানো যায়, তেমনি আমার প্রবন্ধে অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত নামগুলির বদলে যে-কোনোদিন মিশ্রবৃত্ত কলাবৃত্ত দলবৃত্ত অথবা ওইরকম আর-কিছু ব্যবহার করা সম্ভব বলে মনে হয়। মনে হয় বাঙলা ছন্দের আলোচনায় নামসমস্তা নিয়ে বড়ো বেশি সময় চলে যাচ্ছে! এ-বিষয়ে যারা যোগ্য, তাঁরা সে-সমস্যা নিয়ে ভাবুন। ইতিমধ্যে আমরা আর দু'একটি কথা বলে নিতে চাই, দেখতে চাই অন্য ধরনের দু'একটি সমস্যা। সেইজন্মেই এই দুর্ঘট।

শব্দা ঘোষ

সম্পাদক সমীপেষু

আমি প্রথম পরিচয় থেকেই অঙ্কুর অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের স্নেহ-আশীর্বাদ-ধন্য। 'বাঙলাছন্দ : রবীন্দ্রনাথ এবং তারপর' (শতভিষা, ৪২ সংকলন,

শতভিষা

১৩৮২) পাঠান্তে আমার ও আলোক সবকারের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ছন্দোবিষয়ক নানা প্রশ্নে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর স্নেহের স্বযোগ নিয়ে আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁর মতামত লিখে জানাতে অস্বাধিক করেছিলাম। আমার মতো অর্বাচীন ছন্দোজিজ্ঞাসুকে তিনি উপেক্ষা করেন নি; বরং শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মূল্যবান সময় ব্যয় করে তিনি তাঁর সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলি পত্রাকারে নিবন্ধ করে আমাকে আরও বেশী প্রশ্ন দিয়েছেন। এবং এই প্রশ্ন পেয়েছি বলেই আমার কৈফিয়ৎ অসংকোচে নিবেদন করছি।

প্রথমেই বলি যে ‘পরিভাষা’ তার তত্ত্বগত পটভূমিতেই অর্থবহ, অর্থাৎ, তাত্ত্বিক প্রয়োজনে ‘আরোপিত সংজ্ঞার্থ’ ছাড়া ‘পরিভাষা’ কোনো অর্থ বহন করে না। পরিভাষা যে-তাত্ত্বিক ‘ধারণা’-কে বাক্য করে তা শব্দের তথাকথিত ‘অর্থ’ দিয়ে প্রকাশ করা সাধারণ অতীত। যে-পরিভাষার তত্ত্বগত পটভূমি ও সংজ্ঞার্থ পরিচিত, নিতান্ত প্রয়োজন না-হলে সে-পরিভাষার পরিবর্তন আবঞ্জনীয়, যেহেতু নতুন পরিভাষাও শেষপর্যন্ত ‘তাত্ত্বিক প্রয়োজনে আরোপিত’ সংজ্ঞার্থের দ্বারা অর্থবহ। ‘অক্ষরবৃত্ত’ ‘স্বরবৃত্ত’ ‘মাত্রাবৃত্ত’ এই পারিভাষিক নামগুলি প্রবোধচন্দ্র সেনের মৌজ্ঞেই প্রচলিত হয়েছিলো, এখন এত সুপ্রচলিত যে বর্তমানে এমন কোনো ছান্দসিক আছেন বলে জানিনা যার কাছে এই পারিভাষিক শব্দগুলির সংজ্ঞার্থ অপরিচিত, যদিও ছন্দের প্রকৃতি ঐ শব্দগুলির সাধারণ ‘অর্থ’ বাক্য করতে অক্ষম। ‘মিশ্র-কলা-বৃত্ত (-মাত্রিক)’, ‘(সরল) কলা-বৃত্ত (-মাত্রিক)’, ‘দল-বৃত্ত (-মাত্রিক)’ প্রভৃতি নতুন পরিভাষাও ‘আরোপিত সংজ্ঞার্থের’ দ্বারা অর্থবহ। তত্ত্বগত পটভূমি ও আরোপিত সংজ্ঞার্থ জানা না থাকলে ‘দল’, ‘কলা’ ‘বৃত্ত’ (বিশেষ করে ‘মিশ্র’) শব্দগুলি অর্থহীন, কেননা প্রত্যেকটি শব্দেরই তথাকথিত ‘অর্থ’ একাধিক। এর বিকল্প হলো দীর্ঘ বর্ণনাত্মক নাম (তুলনীয় : তানপ্রধান রীতির ছন্দ, বা প্রায় সংজ্ঞার্থের সমতুল্য)। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের তাত্ত্বিক ‘ধারণা’ গুলিকে বর্ণনাত্মক নাম নিয়ে সর্বদা ব্যবহার করতে গেলে অনেক অসুবিধে এবং বহুক্ষেত্রে তা সম্ভবও নয়। তাই, যে-সব পারিভাষিক নামের সংজ্ঞার্থ সুপরিচিত, আমি সেগুলো বাতিল না-করাই সংগত মনে করি।

Syllable-কে আমি ‘অক্ষর’ বলি এই জন্য যে এই পারিভাষিক শব্দটির

‘শতভিষা’

‘আরোপিত সংজ্ঞার্থ’ ছান্দসিকদের কাছে সুপরিচিত—অমূল্যন মুখোপাধ্যায়, স্বধীভূষণ ভট্টাচার্য, তারাপদ ভট্টাচার্য এঁরা সবাই syllable-কে ‘অক্ষর’ বলেছেন। ভাষাবিজ্ঞানেও (বাঙলা তো বটেই, হিন্দীতেও) অক্ষর syllable-কেই বোঝায়। ‘দল’ শব্দটিও ‘আরোপিত সংজ্ঞার্থ’ ছাড়া অচল, কারণ দ্ব্যর্থকতা—‘খণ্ড’ অর্থের ‘চেয়ে ‘দমুহ’ অর্থেই শব্দটি বর্তমানে বাঙলায় বেশী প্রচলিত (যেমন, একদল লোক, লোকদল, দলের লোক, লোকের দল ইত্যাদি)। উপরন্তু প্রবোধচন্দ্র সেন নিজেই লিখেছেন. “.....বৈদিক সাহিত্যের রচনাভেদে দল মানে হয় তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ। অর্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে যে ‘দল’ শব্দের দ্বারা রচনাভেদে ছন্দোবিক্ষেপ দ্বিতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ সূচিত হয়, একথা আগেই বলা হয়েছে।” (দ্রষ্টব্য : সিলেবল্ কে ‘দল’ বলি কেন/অমৃত, ৫৩।৭৫, পৃ: ৩৫)। ‘দল’ শব্দটিও যখন দ্ব্যর্থক এবং আরোপিত সংজ্ঞার্থের মুখ্যপেক্ষী তখন দ্ব্যর্থকতার অভিযোগে অক্ষর-কে বাতিল করবো কেন? ছন্দ-আলোচনায় উচ্চারণ-পদ্ধতিই আলোচিত হ’য়ে থাকে, লেখনপদ্ধতির সঙ্গে তার সরাসরি যোগ নেই, সুতরাং ‘অক্ষর’ নিয়ে বিভ্রান্তির আশংকা অমূলক বলেই মনে করি। ব্রাহ্মীলিপির মূল রীতি syllabic, সম্ভবত এই কারণে সংস্কৃত অভিধানে ‘বর্ণ’ ও ‘অক্ষর’ তুল্যমূল্য। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত সংস্কৃত-ব্যাকরণ-প্রবেশিকা (পুনর্মুদ্রণ ১৯৭১, পৃ: ৫) বইটিতে লেখা আছে, “ইংরেজিতে বাহাকে সিলেবল্ (syllable) বলে তাহার সংস্কৃত নাম অক্ষর।” সংস্কৃত ছন্দোবিষয়ক প্রমাণিক গ্রন্থ গঙ্গাদাস শ্রী-প্রণীত ‘ছন্দোমঞ্জরী’-র প্রথম উদাহরণে দেখতে পাচ্ছি : সমবৃত্ত, গুরু বা দীর্ঘ একাক্ষর বৃত্ত (উক্তা। একাক্ষরা বৃত্তি :) ‘শ্রীঃ’ ছন্দের উদাহরণ

শ্রীন্তে । সান্ত্যাম্ ॥

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে ছন্দোমঞ্জরীকার ‘শ্রীন্তে-র’ মতোই ‘সান্ত্যাম্’-কে দুটো গুরু বা দীর্ঘ অক্ষর বলে গণ্য করেছেন। এবং একইভাবে ত্র্যাক্ষরবৃত্ত (মধ্যা) ‘নারো’ ছন্দে ‘স্নিষ্টোহব্য্যাং’-কে তিনটি গুরু বা দীর্ঘ অক্ষর বলে গণ্য করেছেন। সুতরাং সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তকে ‘বর্ণ (letter) বৃত্ত’ বলা চলে কি? syllable-কে অক্ষর বলে ছন্দশাস্ত্রের ঐতিহ্যকে ক্ষুন্ন করা হয় না বলেই আমার বিশ্বাস।

syllable অর্থে অক্ষর শব্দ ব্যবহারের সপক্ষে তারাপদ ভট্টাচার্য ও আলোচনা করেছেন (ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিজ্ঞান পৃ: ১৭-১৮ দ্রষ্টব্য); এই প্রসঙ্গে ‘সম্মত’ পত্রিকায় প্রকাশিত (৫।১২।৭৫) অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের চিঠিও দ্রষ্টব্য।

Syllable-কে যদি সর্বদাই অক্ষর বলি ‘মুক্ত অক্ষর’ ও ‘বদ্ধ অক্ষর’ (আরো সংগতভাবে ‘বন্ধ অক্ষর’) শব্দদ্বটির ব্যবহার দোষাবহ মনে করি না। (তুলনীয়: ‘সুকুমার সেনের পরিভাষা ‘বিসৃত অক্ষর’ ও ‘সংবৃত অক্ষর’, মৃহ্মদ আবদুল হাই-এর পরিভাষা ‘মুক্তাক্ষর’ ও ‘বন্ধাক্ষর’—পারিভাষাদ্বিটি যথাক্রমে open syllable ও closed syllable-এর)।

‘ছেদ’ ও ‘যতি’ আমি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছি ব’লে মনে পড়ে না। sense pause ও metrical pause বোঝাতে আমি ‘ভাবযতি’ ও ‘পর্বযতি’ শব্দদ্বটির প্রয়োগ করেছি। pitch accent ও duration accent ‘অক্ষরবৃত্ত’ ছন্দে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কখনো কখনো স্বরবৃত্ত ছন্দেও; তাই pitch and duration accent একই সঙ্গে বোঝাতে ‘স্বরপ্রস্বর’ শব্দটি ব্যবহার করেছি। এখানে উল্লেখ করি, বাঙলায় ‘স্বর’ ও ‘স্বর’ একার্থক নয়, যদিও স্বর থেকেই স্বর উদ্ভূত।

‘অক্ষরবৃত্ত’ ‘স্বরবৃত্ত’ ‘মাত্রাবৃত্ত’ এই তিনটি ছন্দেরই unit of measure অক্ষর (syllable), কিন্তু তাই ব’লে অক্ষর বা ‘দল’-এর সংখ্যা দিয়ে মাত্রা নির্ণয় করা যায় না—মাত্রা নির্ণয়ের ভিত্তি ‘অক্ষর’ বা ‘দল-এর’ উচ্চারণের কালগত স্থায়িত্ব এবং এই কালগত স্থায়িত্ব নির্ভর করে ‘অক্ষর’ বা দল উচ্চারণের রীতির উপর। ‘দলবৃত্ত’ ছন্দের মাত্রা নির্ণয়ের ভিত্তিও তো ‘দল’ বা ‘অক্ষর’ সংখ্যা নয়, সেখানেও ‘দল’ উচ্চারণের রীতিই বিবেচ্য; তা না-হলে “মন্দিরেতে/ কাঁসরঘণ্টা/ বাজলো ঠং/ঠং” পঙ্ক্তিটি কানের সম্মতি পেতো না, তৃতীয় পর্বের দল সংখ্যা তিন, কিন্তু পরিমাপ চার মাত্রার।

‘অক্ষরবৃত্ত’ একটি বিশেষ ছন্দোমীতির পারিভাষিক নাম, এবং ‘পয়ার’ একটি ছন্দোবন্ধের (৮৬) নাম, সুতরাং পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত সেই ‘অক্ষরবৃত্তকে’ বোঝাচ্ছে যে মূলত ৮৬-এর যতি বিন্যাস মেনে চলে (জোড়-মাত্রার ত্রিপদী ও চৌপদী চরিত্রের দিক দিয়ে ‘পয়ার’-এরই পরিবর্তিত রূপ; ৮।১০ [= ৪ + ৬] যতিযুক্ত ‘মহাপয়ার’ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য)।

এই দিক দিয়ে বিচার করলে ‘অক্ষরবৃত্ত’ দুবকমের—‘পয়ারভিত্তিক’ ও ‘অ-পয়ারভিত্তিক’ এই উক্তি হয়তো ‘বিভ্রান্তিকর’ নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত উচ্চারণ-রীতি প্রচলিত হবার পর ‘মাত্রাবৃত্ত’ শব্দটি একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থ লাভ করেছে (‘অক্ষরবৃত্ত’ আর ‘স্বরবৃত্ত’ ছন্দের ভিত্তিও তো মাত্রা সমকতা)। রবীন্দ্রনাথের বা আধুনিক ‘মাত্রাবৃত্ত’ অ-পয়ারভিত্তিক ‘অক্ষরবৃত্ত’ থেকে উদ্গত বলেই আমার ধারণা (পার্থক্যটা মূলত অক্ষরের উচ্চারণরীতির)। আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে ‘অ-পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত’ ছন্দের যোগসূত্র ও ‘পয়ারভিত্তিক’ ‘অক্ষরবৃত্ত’ থেকে তার চরিত্রগত পার্থক্য (যা পর্বাঘাত বা পর্বশব্দের মধ্যে পড়ে) বোঝাবার জন্যই ‘অ-পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত’-কে ‘অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্ত’ বলেছি। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের জন্য পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত-কে ‘অ-পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত’ থেকে পৃথক না করে উপায় নেই, এই কারণে আধুনিক ‘মাত্রাবৃত্ত’ ছন্দের উদ্গতির আলোচনা করতে গেলে পারিভাষিক অর্থে ‘অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্ত’ স্বীকার করতে হয়।

‘পর্বাঘাত’ ও ‘পর্বাঙ্ক’ পারিভাষিক শব্দ সূত্রায় ‘পর্বশব্দ’ এবং ‘উপপর্ব’-এর মতোই আরোপিত সংজ্ঞার্থের দ্বারা অর্থবহ।

‘যতিলোপ’ স্বীকার করতে গেলে, আমার বিবেচনায়, যতিলোপ-এর প্রত্য্যঘাত স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা আছে, তা না হলে ছ-মাত্রার ছন্দকে তিন মাত্রার কেন, দু-মাত্রার ছন্দও বলা চলে, চারমাত্রার ছন্দতে কেউ যদি আট মাত্রার ছন্দ বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে কি ?

দীপংকর দাশগুপ্ত

আলোচনা

অমৃতব অন্বেষণ পরিক্রমা

আজ থেকে দশবছর আগে আরো দুজন কবির সঙ্গে পার্থ রাহা'র একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো, তার নাম অমৃতব অন্বেষণ পরিক্রমা। ঠিক দশবছর পরে পার্থ রাহা'র আর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলো, তারও নাম অমৃতব অন্বেষণ পরিক্রমা। বোঝা যায় এই অমৃতব অন্বেষণ পরিক্রমা পার্থ রাহা'র চরিত্রের শিকড়ে প্রোথিত। এবং দশবছরের ব্যবধানে এই দুই কবির অমৃতবের স্নায়ু যদিও বদলে গেছে, অন্বেষণের পদ্ধতি এবং পরিক্রমার ক্ষেত্রও আর ঠিক এক নেই, তবু মৌল প্রতিজ্ঞাসের তেমন কিছু অদলবদল ঘটেনি। মৌল প্রতিজ্ঞাসে পার্থ রাহা একজন জাগ্রত কবি—যে কোনো অমৃতবই তাঁকে কাঁপায়, অন্বেষণ তাঁকে নিমগ্ন করে এবং পরিক্রমায় তিনি অক্লান্ত। দশবছর আগে যে তীব্র আতিতে তিনি বলে উঠতে পারতেন ‘যারা আমার চার পাশের মানুষ আর মানুষের সভ্যতাকে প্রকাশ্যে অথবা ছদ্মবেশে হত্যা করতে চায়, যারা কবি ও কবিতাকে বিক্রম করার কদাচারে লিপ্ত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমি আমার ওপ্‌চানো ক্রোধ আর ঘৃণা নিয়ে বন্দুক হাতে কবিতা লিখতে চাই’ এখন আর তেমন বলতে পারেন না, এখন তাঁর ক্রোধ অনেক শান্ত, ঘৃণা প্রশমিত, বন্দুক নয় সশস্ত্র ভালোবাসা নিয়ে তিনি মানুষ, মানুষের সমাজকে দেখেন। এক বিধূর শৃঙ্খতার বোধ তাঁর ভিতরে ভিতরে কাজ করে। এইমত নিয়ে, দশবছর আগে যা ছিলো না, পার্থ রাহা কবিতার অনেক কাছাকাছি চলে এয়েছেন। তন্ময় নিমগ্ন তার কবিতায়।

‘অমৃতব অন্বেষণ পরিক্রমা’ দীর্ঘ কবিতার বই। দীর্ঘ কবিতা কবিতাই নয়, এমন ধারণা এড্‌গার অ্যালান পো পোষণ করতেন এবং মালার্মের মতো অনেক কবিই তাঁর সমর্থক। কিন্তু দীর্ঘ কবিতা বলতে যথার্থ কী বোঝায় সেটা বোঝা দরকার, মনে রাখা দরকার দীর্ঘ কবিতার বিপরীত শব্দ ক্ষুদ্র কবিতা নয়, দীর্ঘ কবিতার বিপরীত শব্দ কবিতা। কবিতা তখনই দীর্ঘ কবিতা যখন তা আবেগ উচ্ছ্বাসের অতিক্রমে পীড়িত, কবিতা তখনই দীর্ঘ কবিতা যখন অনিপুণ বিভ্রাট, অথবা অশিক্ষিত বিভ্রাটে তা অসংহত। দশ-বায়ে লাইনের কবিতাও দীর্ঘ

শতভিষা

কবিতা যদি তা সংহিতকে আয়ত্ত করতে না পেরে থাকে এবং একশো লাইনের কবিতাও সার্থক কবিতা যদি তা সংহত এবং স্থিরলক্ষ্য হয়। পার্থ রাহা এই সংহিতকে সবসময় আয়ত্ত করতে পেরেছেন এমন নয় এবং যেহেতু তাঁর কবিতার মৌল পটভূমি আবেগ, ঠিকমতো হাল ধরা তাঁর পক্ষে সহজ কাজ হয়নি। তবু একথাও স্বীকার করতে হবে পার্থ এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং এই সচেতনতা তাঁর দীর্ঘ কবিতাকে কখনই অ-কবিতায় দাঁড় করায়নি।

পার্থ রাহা জানেন :

একদিন পিকাসোর উক্তি ছিল,

‘আমি খুঁজি না, আমি পেয়ে যাই’;

আমি জানি আমি কোনদিন

এমন স্পর্ষিত উক্তির অধিকারী নই

পার্থ রাহা জানেন অনেক অঙ্ককার অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর কাছাকাছি এসে নচিকেতার উপলব্ধিকে পাওয়া যায়, তার জ্ঞান চতুর্মুখ কুকুরের একটানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অবসন্ন হতে হয়। পার্থ রাহার জগৎ বিদ্যাময় অমুভবের, সূঁথিত জিজ্ঞাসার জগৎ। তাঁর পরিক্রমা অঙ্ককারশাণিত বিবাদের অলিগলির ভিতর। এই চরিত্র একজন কবির চরিত্র। পার্থ রাহাকে কেবল সেই নিরাসক্তির জ্ঞান অপেক্ষা করতে হবে, যে নিরাসক্তি ব্যক্তিগত আবেগকে উচ্ছ্বাসকেও দূর থেকে দেখতে জানে।

আলোক সন্ন্যাস

দুটি কবিতার বই

এক-অর্থে রাণা চট্টোপাধ্যায় এবং রথীন্দ্র মজুমদার এই দুইজনের কবিতাই বাট দশকের অন্যান্য, তথাকথিত প্রতিনিধি-মূলক কবিতার ব্যতিক্রম। যে সময়ে ‘আধুনিকতা অভিলাষী’ অধিকাংশ কবিই ব্যক্তিগত, আত্মকেন্দ্রিক গতি ছাড়িয়ে বহিঃপৃথিবীর দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন, তুলনায় সব্ব হয়ে উঠেছিল তাঁদের কণ্ঠস্বর, ঠিক সেই মুহূর্তে রাণা এবং রথীন্দ্রের পুনরাবর্তিত উচ্চারণ ক্রমণ আরো নব্র অথচ ঋজু, আত্মকেন্দ্রিক এবং বিমূর্তধর্মী হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি এই দ্বিতীয় ধরনের কবিতার প্রতি আদর্শগত-অর্থে আবদ্ধ। এবং যে কোনো সমালোচনাই যেহেতু সমালোচকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ-নির্ভর, ‘সামনে প্রিয়তম পথ’ এবং ‘তোমার নিঃশব্দ তরবারি’ এই দুই, কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কবিতা হয়ে-ওঠার প্রাথমিক শর্ত পূরণ করেছে এক-কথা ধ’রে নিয়েই আমি বর্তমান আলোচনা শুরু করব।

‘সামনে প্রিয়তম পথ’ রাণা চট্টোপাধ্যায়-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। চৌত্রিশটি কবিতা ও একটি কাব্যনাটকের সংকলন এই বইটিকে কবিতাগুলির মেজাজ অনুযায়ী পবম্পর-যুক্ত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যদিও এই বিভাজন দৃঢ়ত পাবম্পরিক নয়। প্রথম বিভাগের কবিতাগুলিতে অতীতের প্রতি আকর্ষণ বা একধরনের নস্টালজিয়া ভিতরে ভিতরে কাজ করেছে এমন মনে করা ভুল হবে না। ‘পাহাড় আর পাতাল’ কিংবা ‘ঋতুবদল’ জাতীয় কবিতাগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবির ব্যক্তিগত অনুভব শুধুমাত্র অতীত-কালুরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, উত্তীর্ণ হয়েছে মৌল, আরো গোপন কোনো আশ্রয় অন্বেষণে — অতীত অথবা শৈশব এ-ক্ষেত্রে শাস্বত প্রতীক হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র। ‘ঋতুবদল’ এবং ‘তুমি ডাক, আমি ফিরে যাই’ এই দুটি কবিতা পাশাপাশি রাখলে ব্যাপারটা কিছুটা বোঝা যেতে পারে :

হাওয়া চতুর্দিকে হাওয়া

উড়িয়ে নেয় সব, গৃহস্থালি সংসার

আমার শীত-গ্রীষ্মের ঋতুবদল

যাওয়া আসার পথ

ট্রেন লাইন, হাটবাস ধুলো

* * *

তারারা পালটায় দিক যাওয়া আসার পথ,

অবিকল আগের মতন ফিরে আসে না

এবং এর পাশাপাশি

তুমি ডাক, তাই ফিরে আসা

ভাঙ্গাঘাট — অনেক যাত্রী

তোমার নৌকা বন্দরের দিকে

প্রতিদিন ফিরে আসা বেলা যায়...

দ্বিতীয় ধরনের কবিতাগুলিতে রাণা চট্টোপাধ্যায়-এর ব্যক্তিগত-আশ্রয়-অন্বেষণ আরো ব্যাপ্ত রূপ নিয়েছে। আশ্রয় একটা আছে সন্দেহ নেই, যে আশ্রয়কে পরম নিয়ন্ত্রা বললেও বোধহয় ভুল হবে না—কিন্তু তাকে খুঁজতে খুঁজতে 'নদী হয়ে যাচ্ছে মরুভূমি' আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত মন্দির হয়ে ওঠে 'স্বাতের ছায়া, প্রিয়তম পথের গভীরে অস্থখ।'

'তোমার নিঃশব্দ তরবারি' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'তোমার নিঃশব্দ তরবারি'তে যে অন্তর্নিহিত মুহূর্ত বোধ আত্মবিক্রম স্পর্শময় হয়ে উঠেছে তা অগ্নাজ্ঞ কবিতাগুলিতে তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু এ-নিঃশব্দ দুঃখ করার কিছু নই। ফলত, সমস্ত বইটি জুড়ে এ চরনের বিবরণ অস্থত্ব কাজ করেছে এবং গ্রন্থের শেষ কবিতাটি এই সামগ্রিক অস্থত্বের একটি নিটোল পরিসমাপ্তি— এমন মনে করা ভুল হবে না। এই পরিসমাপ্তি এতই নিটোল যে উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে পারছি না— রাস্তা জুড়ে মাহুত কিছুই দেখা যায় না/ এপার থেকে ওপার হয়ে ওঠে না/ মাজ ও ব্রজের পারাপার/ ..এপারে আলোয়/ক্যান্সার হাসপাতালের প্রস্তর ফলক/কর্কটের ওপর তোমার নিঃশব্দ তরবারি !

তবু বলব, 'তোমার নিঃশব্দ, তরবারি'-র অগ্নাজ্ঞ কবিতাগুলির সঙ্গে শেষের কবিতাটির একটি মেজাজ-গত ফারাক রয়ে গেছে, কবির মানসিক বিবর্তন সমান হয়নি ; নাকি এ-কোনো আরো মগ্ন ধ্যানমগ্ন ভবিষ্যতের সূচনা ?

অভিরূপ সরকার

প্রথম কবিতার বই

বইএর ভিতরে দীর্ঘ সৰু সৰু ফুটো করে পুরোনো রূপোলী কাটগুলি
কে জানে কেন যে করে, কিন্তু প্রায়ই করে থাকে।

নিভুল এফোড় ওফোড়

একম স্পষ্ট উচ্চারণে অত্যন্ত চেনা প্রতীকের সাহায্যে বিশ্বদেব অবশ্যজ্ঞাবী
ক্ষয়-ক্ষতির কথা বলেন। ব্যক্তিগত রঙীন দুঃখের দাঁতে এইভাবে পরতে পরতে
ছিন্ন করে। তার অর্থহীন কারণ খোঁজাও আমাদের একরকম অজ্ঞিত অভ্যাস,
আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, নিজেদের বোঝাতে চেষ্টা করি এই রক্তগতির কোন
উদ্ভীর্ণ অভিজ্ঞতা।

কিন্তু দৃশ্যত যেটা ঘটে থাকে—বই থেকে

পুনরায় আরো কিছু বই-এর ভেতরে ক্রমাগত

অঙ্ককারে সৰু সৰু ফুটোর ভেতরে তারা এইভাবে কিছুকাল

বসবাস করে।

পুনরাবৃত্তির মতো এই ছিন্ন থেকে যায় বই থেকে বই-এর ভেতরে অর্থাৎ
আমাদের উপলব্ধি জ্ঞানক্রমে। নবম জ্ঞান তার নিভুল অঙ্কহানি নিয়ে অবশিষ্ট
পড়ে থাকে দুঃখগুলির বসবাসের জগৎ। অথচ এভাবেই নির্মাণ শুরু হয় বুকের
ভিতরে,

একে একে

উঠোন, রান্নাঘর দেহলীতে নিমছায়া, রোদ্দুর, সিঁড়ির চাতাল,

দুয়োরে মাদ্রলিক স্মৃতিভরা ধানের মরাই, টেঁকিশাল,

নবায়ের শালিধান, ভাঁড়ারের মেটে হাঁড়ি,

কুয়োর ফটিক-জলে ভরে ওঠা বালির সোরাই

মেঝের শেতল পাটি, খুব স্মৃতি শিশুটি ঘুমায়, আমি সব

আমি সব দেখি ঘুরে ঘুরে।

সমস্ত এই আয়োজন যত অনায়াস তেমনি নির্লিপ্ত কিন্তু নয় এই দেখা।
‘আমি সব’ এই শব্দবন্ধের দ্বিধার ভিতরেই প্রফুট এই বুকের ভিতরকার বাড়ি-
ঘরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার বেদনা। কিন্তু কবি জানেন সময়ের অনিবার্য পরিণাম।
ঘুরে ঘুরে দেখা, এই আশ্চর্য ভ্রমণের পটভূমিকায় কখন,

পায়ে পায়ে

বয়স দুপুর হয়ে

দুপুর বিকেল হয়ে নেমে যায় খিড়কি পুকুরে ॥

এখানে লক্ষণীয় বিশ্বদেবের চেতনায় এই প্রস্থানও পেছন দিয়ে, চুপিমাড়ে, খিড়কি পুকুরে। আসলে ‘ছায়া যার দশদিক’ এই বইটিতে, যা কিনা বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বই, দুঃখের এই অন্তর্লীন গোপন রূপটিই দশদিক ব্যাপ্ত ক’রে ছায়া ফেলেছে প্রতীকের কাবাগুণ সম্পন্ন ব্যঞ্জনায়।

বইটির কবিতা-নির্বাচনের মধ্যে এটি সচেতন অভিনিবেশ লক্ষ্য করা যায় কোন অথও মানচিত্রের রচনার প্রতি। যে বিষাদ তার পটভূমি তা মূলত অস্তিত্বের অবক্ষয়ের ভিতরে চরিত্র নির্মাণের সংকট—যে অবক্ষয় “সখার সংসর্গে দুঃস্ব, আত্মীয়ের বিলাপে বিহ্বল।” কিন্তু কয়েকটি কবিতার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্ভবতঃ কবির ব্যক্তিগত মমত্ববোধ তাঁর সমালোচনার মানসতার চেয়ে প্রবলতর হ’য়ে কাজ করেছিলো। সেগুলি সবই ভালো কবিতা কিন্তু এই বই-এর মূল ছায়ার বাইরেই তাদের ডালপালা ছড়িয়েছে বেশী। কবিতাগুলির বহুল ব্যবহৃত নাগরিক পটভূমিকা, অভ্যস্ত উচ্চারণ পদ্ধতিই তার জ্ঞাত প্রধানত দায়ী। উদাহরণ স্বরূপ ‘বিচ্ছিন্ন টেলিফোন’ ‘প্রেতপক্ষ’ ‘জাঁক’, প্রভৃতি কবিতার নাম করা যায়। তবে যদি কোনরকম বৈচিত্র্যের জ্ঞাত এই কবিতাগুলির অবতারণা করা হয়ে থাকে, তা নয় বলেই আমার বিশ্বাস, তবে তা অন্তত আমার কাছে সমর্থন-যোগ্য নয়। কিন্তু এ-জাতীয় কবিতা এই বইয়ে খুবই কম। আসলে এই বইটির মৌল সমগ্রতা এতো নিটোল যে এবম্বিধ ছ’চারটি স্থলন আমার কাছে পীড়াদায়ক হয়েছে। সম্পূর্ণ বইটির আলোচনার মধ্যে তাই সেই কথাটুকু জানিয়ে রাখা মাত্র।

নগর জীবনের পরিচিত অথচ স্বল্পপ্রচলিত শব্দের ঝংকারই বিশ্বদেবের কবিতার অন্তর্ভেদী আয়ুধ। কখনও কখনও তিনি স্বপ্রযুক্ত ধ্বনির সাহায্যেও অপূর্ব চিত্রকল্প রচনা করেছেন। ‘ডোকলা’, ‘কুচুটে’, ‘হটোরহটোর’, ‘জুম-কালো’, ‘পাখল শরীল’, ‘জিগল মাছ’, ‘পলুই’ প্রভৃতি শব্দ বা ‘ঢোল বাজে বাতোম... বাতোম...’ কিংবা ‘বিসর্জনের রাতে’ কবিতায়,

শতভিষা

বাইরে ঝুম ঝুম করছে রাত ! বলি কোন্ পাড়ার হুগুগা যায়—

সঙ্গে ঐ আঙুপিছু তালকালী বিশটা মাতাল ?

ও...মা দিগঘরী নাচ গো—কাঁসর ঘণ্টা

ওদিকে তো ঠনঠনাচ্ছে ঢাক-ঢোল-কর্তাল

পাঠক পাড়ায় তারা পাঁচজনায় বসে আছে

ও কেমন আজব আলোর হারিকেন

জ্বলেছে দিঘির পার প্রতিমা নামিয়ে তোরা

কাক-ভোরে তামূকের আশুন নিবি না

মাথায় চিড়িক দিচ্ছে বড় ভয় সনাতন

এখনও জ্বর রাত, ঝুম ঝুম দু'পহর রাত ।

এপ্রকার উচ্চারণভঙ্গী বিশ্বদেবকে সহজেই হট্টগোলের মধ্যে বিশিষ্ট ক'রে রাখে । কিন্তু আসলে এইসব পটভূমিকা বা শব্দ-চয়নের মোহজালে বিশ্বদেব তাঁর নাগরিক ঐতিহ্যের দিক থেকে মুখ ফেরাননি, আর সেইখানেই তাঁর সার্থকতা । পরিবেশের জটিলতা, ক্রমাগত পোশাক বদলাবদলির ভিতর দিয়ে ঐন্দ্রজালিক ছেলেবেলার অন্তর্ধান, নিভৃত অরণ্যে ঈশ্বররূত হত্যাকাণ্ড, ঘুমের মধ্যে আদ্বৈত বাজিকর রমণীর ভীষণ প্রলোভনের কণ্ঠ ক্রমশঃ তাঁর স্রবলতাকে মেয়ে ফেলে, 'কলকাতার সব হাওয়া' তখন 'মেডিক্যাল কলেজের দিকে' ঘুরে যায় । আর অর্জিত পাপবোধের অম্লসঙ্গে কবি তখন লেখেন,

কলকাতার সমস্ত দিনের অবসাদ

বাক্সো-প্যাটিয়া নিয়ে

নেমে গেল সন্ধ্যার বজ্রবাটাতে ।

* * * *

...আর অন্ধকারে

দু'একটা খিঁচি ছুঁড়ে, শৌখিন টেপা বাতি হাতে

কলকাতার দুঃখগুলি

নিখিঁচ পল্লীর দিকে চলে গেল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ।

আসলে বজ্রবাটার 'পায়ে পায়ে মোরাম-মাড়ানো শব্দ'র 'নিখিঁচ শান্তি' বা 'জোনাক জালা শোক' এবং 'ধ্বংসের মুখোমুখি নষ্ট মেয়ের মত ভয়ঙ্কর পা ফাঁক

শতভিষা

করে নীচের দিকে ঝুঁকে' থাক। 'হাওড়া ব্রীজ' এই দুই পটভূমির মধ্যস্থিত অসহায় বেদনা বোধের মধ্যে ফেলে বিশ্বদেবের দ্বিধাদীর্ণ কবি সন্তাকে যাচাই করতে হবে। যখন অবেলার তাঁর অভিজ্ঞতাভিত্তিক মন বলে 'যাই?' তখন যে কোন নিষেধ রূপ ক'রে ডুবে যাওয়া হিংস্রতা দিদির বয়সের কথা মনে করিয়ে দেবে। আপাতদৃষ্ট অবশুস্তাবীতার ভিতর থেকে উপলব্ধির এই চকিত আত্মোত্তরণের মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বদেবের হয়ে উঠবার বীজ। আশা বাধি বলেই সামান্যতম কথাটুকুও না বলা থাকে না, তারা দু'একটি ভয়ের কথা।

নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গীর মধ্যে কোন কোন সময় বিশ্বদেব নিজের অজান্তেই দু-একজন অগ্রজ কবির কণ্ঠস্বরে কথা বলে ফেলেছেন। সম্ভবতঃ সেই সব অল্পভূতির প্রকাশরীতিতে তাঁরা বিশ্বদেবের প্রিয় কবি। কিন্তু এই সম্মোহজাল লচেতনভাবে পরিহারযোগ্য কবির নিজেরই আত্মবিকাশের কারণে। পঞ্চাশ-দশকের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত শঙ্ক ঘোষ তাঁর বিদগ্ধ শৈলীসহ বিশ্বদেবের সামনে বড় বেশী দাঁড়িয়ে আছেন। উদাহরণ দিয়ে সে আলোচনা দীর্ঘতর করবো না। তবে 'ভাঙা চাঁদ বাড়ীর উঠোনে' কবিতায়,

জ্যোৎস্না ঘুমিয়ে আছে কতকাল পুরোনো মাছের গন্ধে

হেঁসেলের হাঁড়ির ভেতরে

মাছের ঝোলের গন্ধ, ঝোল ছিল, কবে যেন

মাগুরের ঝোল ভাত খেয়েছিল কারা

এই জাতীয় পঙ্ক্তিশৃঙ্খলি যত প্রকট করে জীবনানন্দের উপস্থিতিতে তেমন আর কোথাও নয়। বস্তুতপক্ষে 'নষ্টচন্দ্রের রাতে' থেকে 'ভাঙাচাঁদ বাড়ীর উঠোনে' কবিতায় যে অল্পধাবনযোগ্য প্রবাহমানতা তা নিয়ে আলোচনা করা হলো না এই একটি মাত্র অস্বস্তিতে।

বিশ্বদেব এই সীমাবদ্ধতা শিগ্গিরই তাঁর পরিমণ্ডলের দশদিক থেকে বিদূরিত ক'রতে পারবেন বিশ্বাস করি। আর বড় বেশী অল্পভব সংলাপের আকারে সাজানো হয়েছে যার ফলে, আমার মনে হয় তার ব্যাপ্তি অনেক ক্ষেত্রে কমে গিয়ে একান্ত ব্যক্তিগত কবিতায় দাঁড়িয়ে গেছে। এই বই-এর অন্তত বারো তেবোটি কবিতা এই সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত। সে প্রসঙ্গে বিশ্বদেব একবার ভেবেদেখবেন কি ?

স্বরাজিৎ ঘোষ

কবিতা বিকীর্ণ শিল্প

শতভিষা	রজতজয়ন্তী	বর্ষ	বিশেষ	প্রবন্ধ	সংযোজন
আলোক	সরকার	আলোকরঞ্জন	দাশগুপ্ত	দেবব্রত	মুখোপাধ্যায়
শমীক	বন্দ্যোপাধ্যায়	বুদ্ধদেব	দাশগুপ্ত	যশোধরা	বাগচী
রমানাথ	রায়	গৌতম	বহু	অভিরূপ	সরকার
				স্বর্জিৎ	ঘোষ

আলোক সরকার কবিতা

যে-কোন সৃষ্টিরই জন্মপ্রস্তুতি অন্ধকারের ভিতর। মৃত্তিকার অন্ধকারে বীজ নিজে থেকে প্রস্তুত করে, মাতৃগর্ভে প্রাণ। সেই প্রস্তুতি, সেই অন্ধকারের সাধনা একদিকে যেমন অসহায় অগ্রনির্ভর ঠিক সেই রকম সেই সাধনা সত্যের স্বতন্ত্র জাগরণের সাধনা। মাতৃগর্ভে প্রাণ মাতার রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে আত্যন্তিক জড়িত, জননী মৃত্তিকার স্বভাবধর্মকে বীজ অস্বীকার করতে পারে না, অস্বীকার করতে পারে না বীজের স্বভাবধর্মকে। একই সঙ্গে প্রাণ তার হয়ে ওঠার উৎকাজ্জ্বাল নিলীন অন্ধকারে মাতাকে পরিত্যাগ করতে চায়, বিচ্ছিন্ন হতে চায়, ভেগে উঠতে চায় স্বাধীন এবং অসম্পূর্ণ অনগ্রনির্ভরতায়, মাটির ভিতর রোপিত বীজ উল্লোল ব্যাকুলতায় ছুঁতে চায় আকাশের দিকে, পান করতে চায় স্বর্গলোক, অল্পভব করে নিতে চায় মুক্ত বিস্তৃত জীবনানন্দ। অন্ধকারের ভিতর চলেছে প্রস্তুতি—একদিকে পূর্বনির্দেশ পূর্বসংস্কার তার অনিবার্য আধিপত্য, অগ্রদিকে স্বাধীন অসম্পূর্ণ প্রথম মৌলিক জাগরণ।

যে-কোন সৃষ্টিরই জন্মপ্রস্তুতি অন্ধকারে, সেই অন্ধকারে যেখানে সকল ধ্বনিই মুক, সকল বর্ণই দ্ব্যতিহীন, সকল রূপই শূন্যময় অল্পপস্থিতি। তারই ভিতর চলেছে সাধনা, হয়ে-ওঠার সাধনা, যে-সাধনায় পূর্বনির্দিষ্ট ধ্বনির পুনরাবৃত্তি নেই পূর্বনির্দিষ্ট বর্ণের প্রতিকলন, যেখানে কোন পূর্বপ্রতিষ্ঠিত রূপই কল্পনার অনিবার্য প্রভাব নয়। তবু, কোন সৃষ্টিই যেহেতু বীজের স্বভাবধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না, তার সমস্ত প্রচেষ্টাই শেষপর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট রূপকেই যান্ত্রিক মেনে নেয়, কল্পনার একটি নিয়মবাহিত প্রবণতাকে। এই নিয়তি এই অমোঘতা এরই পাশাপাশি এরই অন্তরালে মাঝে-মাঝে দৃষ্ট হয় সহস্রার বিদ্রোহ, ছিঁড়ে ফেলে দিতে চায় সব নিয়মনির্ধারিত প্রস্তাব, ফিরে পেতে চায় সেই সাধনার সফলতাকে যে-সাধনায় পূর্বনির্দিষ্ট ধ্বনির পুনরাবৃত্তি নেই, পূর্বনির্দিষ্ট বর্ণের প্রতিকলন, যেখানে কোন পূর্বপ্রতিষ্ঠিত রূপই কল্পনার অনিবার্য প্রভাব নয়। এই পেতে-চাওয়া, যান্ত্রিক প্রবণতা এবং স্বাধীন অনির্ভর উন্নীলনের এই দ্বন্দ্ব, এই আবহমান রক্তিম সংগ্রাম, জাগ্রত, কখনো অর্ধঅচেতন, কখনো নিমগ্ন স্রোতের অনিবার্যতায় বয়ে চলেছে সকল সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্রে।

শতভিষা

সব সৃষ্টিই, সব শিল্প, কবিতা এই বান্দিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে হয়ে ওঠে। সব শিল্পই এক অর্থে ঐতিহ্যহীন, বীজের অন্তর্গত প্রবণতার ভিতর দিয়ে শাসিত। শিল্প বলতে যে সার্বজনীন ধারণা, কোন শিল্পীই সেই ধারণাকে অতিক্রম করতে পারে না; কবিতা কাকে বলে সে বিষয়ে আমাদের যেমন একটা সময়লব্ধ ধারণা আছে, একজন কবির উপলব্ধিও প্রায় তার কাছাকাছি যায়। আমরা অনায়াসেই আদি কবি বাগ্মীকির রচনার অনেক অংশকেই যেমন কবিতা বলবো ঠিক সেইরকম হাল আমাদের যে-কোন কবির রচনাকে। কালিদাস কবিতা লিখেছেন এবং প্রায় দেড় হাজার বছর পরে রবীন্দ্রনাথও। যেমন কবিতা তেমন চিত্রকলা তেমন শিল্পের আর সব শাখাও। কবিতা-বিষয়ে ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের একটা ধারণা গড়ে উঠেছে, আমরা অনিবার্ধভাবেই তাকে যেনে নিই, কবিতা অনিবার্ধভাবেই তাকে যেনে নয়, কবিতা রচিত হয় সেই ঐতিহ্যের মৌল ছাঁদের সীমানায়, কবিতা এবং সব শিল্পই, সব সৃষ্টিই গভীর কেন্দ্রে তার বীজের প্রবণতাকে অবধারিত স্বীকার করে।

তবু একটি কবিতা থেকে আরেকটি কবিতার ব্যবধান অনেক, এক কবির রচিত কবিতা থেকে অন্য কবির রচিত কবিতার। কেবল কাব্যকলারই হেরফের নয়, প্রসাধনের রকমফের অথবা শব্দ আর শৃঙ্খলার অনন্ততা নয়, একজন কবির রচিত কবিতা যে হিরণ্ময় আলো জ্বালায়, আলো জ্বালায় আলো নেভায়, বিচ্ছুরিত করে যে আলোকমালায় অদৃষ্টপূর্ব বর্ণ, অন্য কবির রচিত কবিতা কখনোই তা করে না। তা অন্য এক হিরণ্ময় অভিনিবেশ, অন্য উজ্জ্বলতা এবং আর এক ধরনের অঙ্ককার। অঙ্ককারের সাধনা তো আর সকলের একরকম নয়, সেই অঙ্ককারের যেখানে পূর্বনির্দিষ্ট ধ্বনির পুনরাবৃত্তি নেই, পূর্বনির্দিষ্ট বর্ণের প্রাতিফলন, যেখানে কোনো পূর্বপ্রতিষ্ঠিত রূপই কল্পনার অনিবার্ধ প্রভাব নয়।

একজন কবির হয়ে-ওঠার পিছনে তার এই অঙ্ককারের সাধনা একাধিপত্য এবং অনিবার্ধ ভূমিকা গ্রহণ করে। সকলেই যে কবি নয় এবং আপাতিকভাবে কেবল দু'একজনই কবি তারও রহস্য এই অঙ্ককারের সাধনার নিবিড়তা এবং প্রকারভেদের তত্ত্বমে। এই অঙ্ককারের সাধনা এ কেবল আগরণের প্রাথমিক মুহূর্তে নয়, এই সাধনা আগরণের প্রাথমিক মুহূর্ত এবং সমস্ত জীবন ভ'রে। সমস্ত জীবন ভ'রে চলেছে এই অলক্ষ্য উন্মুখতা—একদিকে বীজের নিশ্চিত নির্দেশ,

সমাজের পরিবেশের অলঙ্ঘনীয় আধিপত্য, অগ্রদিকে মুক্তি, স্বাধীন স্বতন্ত্র উন্নয়ন, অনগ্র প্রথম মৌলিক হয়ে-ওঠা ।

সমস্ত জীবন ভ'রে কখনো সচেতন, প্রায় সময়েই অচেতন বেজে ওঠে এই হয়ে-ওঠার মন্ত্র । কখনো তাকে অম্লভব করা যায়, মাঝে-মাঝে করা যায় ; প্রায় সময়েই, অধিকাংশ সময়েই সেই ধ্বনি স্তব্ধতা, সেই অন্ধকার আলোকময় জ্যোতি অবলুপ্ত । কবিতা তখনো রচিত হয়, হ'তে পারে, যখন সেই ধ্বনি স্তব্ধ, যখন সেই জ্যোতি অবলুপ্ত এবং তখন সেই কবিতাই রচিত হয় যা কবির রচিত কবিতা নয়, যা প্রাথমিক ভাব-ভাবনা, প্রচলিত রীতি-প্রকরণ অথবা পাঠ-লব্ধ, শিক্ষা-লব্ধ, জ্ঞান-লব্ধ বোধ-বুদ্ধির উৎসার । এইরকম কবিতা রচিত হয়, অনেক হয়, এমনকি মহৎ কবির হাতেও হয় এবং তা ক্রমশ অবহেলিত, আরো অবহেলিত, আরো আরো অবহেলিত হতে হতে শুকনো পাতার মতো কোন সংগোপনে গিয়ে যে আশ্রয় পায়, আমরা তাকে আর খুঁজেই পাই না ।

অর্থাৎ বীজের সহজাত নির্দেশকে মেনে নিয়েই সেই কবিতা রচিত হয়েছিল । বীজের নির্দেশের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠেছিলো তার ভাব-ভাবনা, তার রীতি-প্রকরণ, তার পাঠ-জ্ঞান-বোধ-বুদ্ধির উপকরণ বীজের ঐতিহ্যকেই মেনে নিয়েছিলো । কবিতা, সার্থক কবিতা, তখনই ক্রমবিকশিত যখন শুনতে পাওয়া যায় সেই হয়ে-ওঠার মন্ত্র, অম্লভব করা যায় সেই অন্ধকার আলোকময় জ্যোতি । ব্যক্তিগত অন্ধকারের গর্ভে নিহিত ছিলো যে প্রতিজ্ঞা, যে শ্রম, যে আকৃতি আর অভিভাব তার মুখোমুখি দাঁড়ালে ফিরে পাওয়া যাবে সেই দৃষ্টি যা প্রথম, প্রথম আর মৌলিক, প্রথম মৌলিক আর অনগ্র । তারই অমোঘ এবং অন্তর্নিহিত প্রেরণার রচিত হয়ে ওঠে কবিতা, যে কবিতা বিশ্বের প্রথম এবং চিরকালীন বিশ্বের প্রথম কবির রচিত কবিতা । কবিতা-রচয়িতার প্রয়োজন ব্যক্তিগত অন্ধকারের গর্ভে নিহিত জ্যোতির্ময় উন্নয়নের প্রতিটি সোপানকে চিনে-নেওয়া, তারই নির্দেশে যে কবিতা রচিত হয় সেই কবিতাই বিশ্বের প্রথম এবং চিরকালীন বিশ্বের প্রথম কবির রচিত কবিতা ।

এই চিনে-নেওয়া এ সহজ কাজ নয় অর্থাৎ সহজ ব্যবহারিক অহুমহিমসায় একে পাওয়া যায় না, এ যখন সামনে এসে দাঁড়ায় কেউ কেউ এর নাম দেয় প্রেরণা, অথবা আবেগ, কেউ প্রশান্তি, কেউ নিমগ্নতা । আবেগ নায়কদেরই

প্রতিক্রিয়া, তা বীজের চরিত্র, সামাজিক বাধা-বন্ধনের উদ্বেগ যেতে পারে না, এবং প্রশান্তি, ওয়ার্ডবার্থ যাকে tranquillity বলেছেন, এলিয়ট তাকেও অগ্রাহ্য করেছেন। এলিয়ট রায় দিয়েছেন নিমগ্নতার স্বপক্ষে। কিন্তু মগ্নতা নিমগ্নতারও প্রকারভেদ আছে। একধরনের নিমগ্নতা বৃক্ষের নিমগ্নতা যান্ত্রিক রীতিনির্দেশকে, বীজের রীতিনির্দেশকে অবধারিত মান্ত করে, একধরনের নিমগ্নতা প্রবৃত্তিচালিত, তা অন্ধ আহুগতে। ঐতিহ্য সমাজ-পরিবেশের আরোপিত শৃঙ্খলগুলিকে মেনে নেয়, সেই মগ্নতা সেখানে চেতনার ভূমিকা নেই; এলিয়ট সম্ভবত যে নিমগ্নতার কথা বলতে চেয়েছেন তা চৈতন্য-উজ্জ্বলিত, দীপ্ত, তা সেই ব্যক্তিত্বকেও মানে না যে ব্যক্তিত্ব ব্যাবহারিক কার্য-কারণ নিয়ন্ত্রিত, ঐতিহ্য-সমাজ-পরিবেশের অন্ধ গোলকধাঁধার ভিতর আবর্তিত।

একদিকে বীজের অবধারিত নির্দেশ অন্যদিকে অন্ধকারের স্বাধীন অনপেক্ষ জাগরণের মন্ত্র, উন্মুক্ততা, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বিক দোলাচলের ভিতর দিয়েই কবিতা হয়ে ওঠে। কোনো মেরুই অস্বীকারের নয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ নয়, যদিও দুই মেরুর ব্যবধান কেবল সূদীর্ঘ নয়, মৌলিক। নিমগ্নতা, চৈতন্য-উজ্জ্বলিত নিমগ্নতা দীক্ষিত হয় অন্ধকারের সাধনার মন্ত্রে, তারই ভিতর দিয়ে যখন দেখতে পাওয়া যায় বীজের অবধারিত নির্দেশকে, ঐতিহ্য-সমাজ-পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়ে-ওঠাকে, তারই ভিতর দিয়ে যখন দেখতে পাওয়া যায় ব্যক্তিত্বকে, ঐতিহ্য-সমাজ-পরিবেশ শাসিত ব্যক্তিত্বকে তখন বীজের অবধারিত নির্দেশ দ্বিতীয় অভিভাব পায়, ব্যক্তিত্ব সেজে ওঠে দ্বিতীয় বণ্ডে দ্বিতীয় রেখায় এবং আরো বেশী দ্বিতীয় প্রাপ্যরক্তে। এই নিমগ্নতা, চৈতন্য-উজ্জ্বলিত নিমগ্নতা এ সবকিছুকেই চিরে চিরে দেখে, জোড়া দিয়ে জোড়া ভেঙে দেখে। সবকিছুর ভিতরের রহস্য জানাই যে তার আগ্রহ তা একেবারেই নয়, ব্যাবহারিক অর্থে যাকে আমরা সত্য বলি তাকে খুঁজে পাবার ঔৎসুক্য তার একেবারেই নেই, সে সবকিছুকেই মিলিয়ে নিতে চায় তার হয়ে-ওঠার মন্ত্রের সঙ্গে, তার অন্ধকারের সাধনার বীজমন্ত্রের সঙ্গে, কখনো প্রসারিত করে, কখনো সংক্ষিপ্ত, কখনো ঢেলে সাজায়, কখনো ভেঙেচুরে আবার নতুন করে জোড়াতালি দেয়, কখনো পরিবর্তন করে, অবজ্ঞা করে কোনো বিশেষ অংশকে, কখনো নির্বাচন করে নেয় বিশেষ একটি খণ্ড চুবিয়ে নেবার জন্য তার অন্ধকারের সাধনার কল্লোলিত আধারময় জল-তরঙ্গের ভিতর। এইসব করা আর না-করা এ সবই নির্দেশিত হয় ব্যক্তিগত অন্ধকারের

প্রস্তুতির গঠন, তার প্রবণতা তার সংকল্পের প্রকারভেদের ভিতর দিয়ে। অন্ধকার সাধনার মস্ত্রে দীক্ষিত চৈতনউজ্জীবিত নিমগ্নতা, আগ্রত সচেতন নিমগ্নতা আমাদের দেখাশোনার পৃথিবীকে নিজের দেখাশোনার পৃথিবী ক'রে নেয়। তারই পটভূমিতে রচিত হয় যে শিল্প, যে কবিতা, তা বিশ্বের প্রথম অনন্ত একক কবিতা, তা আমাদের এক রহস্যের প্রান্তরের সামনে এনে দাঁড় করায়, যাকে আমরা অর্ধেক চিনি, এবং অর্ধেক আমাদের চেনাশোনার বাইরে।

কবিতায় যে রহস্য আমরা আকাজ্ঞা করি তা এই রহস্য, ব্যক্তিত্বচিহ্নিত রহস্য, স্বাধীন অনন্ত নিরপেক্ষ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হয়ে-ওঠা ব্যক্তিত্বের দৃষ্টি আর মানসতার রহস্য। এই রহস্যই কবিকে পৃথক করে জনসাধারণ থেকে, এক কবিকে অন্ত কবির থেকে। এই ব্যক্তিত্বময় দৃষ্টি আর মানসতাকে পরিহার করে যে কবিতা রচিত হয় তা জনসাধারণের নিজের সম্পত্তি, তা যৌথজীবনের সাকল্যিক আচার-আচরণ, ভাবনা-চিন্তা, জীবনযাপন থেকেই উঠে-আসা, তা পাঠ করে জনসাধারণ এক ধরনের মজা পায়। মজা পায়, কিন্তু তা কখনো কাঁপায় না, স্তব্ব করে না, তোলে না কোনো গাঢ়তর গূঢ়তর অভিভাব। কবিতা, যথার্থ কবিতা মাত্রই রহস্যময়, অর্ধচেনা এবং বাকী অংশ অবগুপ্তিত; কবি যথার্থ কবি মাত্রই আগন্তুক, বিদেশী, তার সাজপোশাক আমাদেরই মতো, ভাষা আমাদেরই মতো তবু সে অপরিজ্ঞাত নতুন এবং আলৌকিক। তার একদিকে থাকে বীজের অমোঘ নির্দেশ অর্থাৎ সাধারণিক অর্থে স্বাভাবিকতা অন্তর্দিকে পটভূমির অন্ধকার প্রস্তুতি। যে কোন সৃষ্টিরই জন্মপ্রস্তুতি অন্ধকারের ভিতর, অন্ধকারের ভিতরেই তার প্রস্তুতি, স্বাধীন অসম্পূর্ণ প্রথম মৌলিক আগরণ—সেই অন্ধকারের বর্ণালি কবিতা, যথার্থ কবিতার উপর সেই অন্ধকার হিরণ্য অকম্পন ছাতি ছড়ায়, কবিতাকে করে অনন্ত এবং প্রথম এবং রহস্যময়।

কিন্তু আমরা যে সমস্ত কবিতা পড়েছি, মহৎ কবিদের কবিতা পড়েছি তাকি লভ্যই সত্যই অদ্ভুত কিছু, উদ্ভট কিছু, অথবা আমাদের সাকল্যিক অভিজ্ঞতার বাইরে হঠাৎ নেমে আসা কোন গ্রহতারকার অসম্ভব কিছু? তা একেবারেই নয়। আমরা যে সমস্ত কবিতা পড়েছি তাকে যেমন কবিতা বলে চিনে নিতে আমাদের কিছুমাত্র অন্তর্বিধে হয়নি, সেই রকম সেই কবিতার ভাবনা চিত্র যুক্তিপূর্ণতায়

শতভিষা

আমাদের কাছে খুব সহজভাবেই এসেছে। অভূত বা উদ্ভট কিছু যে রচিত হয় না তা নয় কিন্তু তা ভাংকণিক কৌতূহল, ধাঁধা-ভাঙানোর আনন্দ অথবা গবেষণার বিষয় হয়ে থাকে। মহৎ কবিতা কখনোই উদ্ভট কবিতা নয়, বস্তুত কবিতা বলতে আমাদের যে সার্বজনীন ধারণা আছে তার উর্ধ্বে উঠে কবিতা রচনা বোধহয় সম্ভব নয়। মৃত্তিকার অন্ধকারে বীজ নিজে থেকে প্রস্তুত করে—অসহায় অন্তর্নির্ভর সেই প্রস্তুতি, জননী মৃত্তিকার স্বভাবধর্মকে বীজ অতিক্রম করতে পারে না, অস্বীকার করতে পারে না বীজের স্বভাবধর্মকে। তারই পাশাপাশি অতদ্রুত জাগ্রত থাকে মাতাকে ত্যাগ করে প্রাণের হয়ে-ওঠার উৎকাজ্জ্বা, স্বাধীন অসম্পৃক্ত অন্তর্নির্ভর হয়ে-ওঠার উৎকাজ্জ্বা, জন্মজঠরের অন্ধকারের ভিতর চলেছে সাধনা, সেই অন্ধকারে যেখানে সকল ধ্বনিই মৃক, সকল বর্ণই দ্যুতিহীন, সকল রূপই শূন্যময় অল্পপস্থিতি; অন্ধকারের ভিতর চলেছে সাধনা যে সাধনায় পূর্বনির্দিষ্ট ধ্বনি-বর্ণ-রূপের কোনো ভূমিকাই নেই। বীজের অনিবার্য নির্দেশ এবং অন্ধকারের সাধনা এই দুয়ের দ্বন্দ্বিক প্রক্ষেপের ভিতর দিয়েই মানুষের হয়ে ওঠা, কবিতার হয়ে ওঠা। সব মানুষই তাই যেমন আমাদের কাছে অর্ধ চেনা এবং অর্ধ অপরিচিত, কবিতাও সেইরকম সহজতার স্বাভাবিকতার ভিতর দিয়ে এসে রহস্যের সম্মোহে আমাদের নিবিষ্ট করে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

স্বন্দরের সংজ্ঞা : অবনীন্দ্রনাথ

আবহুপট

১। ‘জাতীয়বোধ এবং আধুনিকতার মধ্যে রয়েছে এক কার্যকারণ খচিত সম্পর্ক’ (Barbara West)।

২। ১৯০৭-এ প্রাচ্য শিল্পসভার (Indian Society of Oriental Art) প্রতিষ্ঠা।

৩। কোপেনহেগেনে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের আলোচনা সভায় (১৯০৮) কুমারস্বামীর বক্তব্য : ভারতীয় শিল্প গ্রীক ভাবনার দ্বারা বিভাবিত হলেও তা ভারতীয়।

৪। Modern Review পত্রিকায় ভগিনী নিবেদিতার ইতালিয় রেনেসাঁস ও অজস্রা-ফ্রেস্কো বিষয়ক প্রবন্ধ। প্রসঙ্গত শ্রুতব্য, নিবেদিতার অস্টিয় অকীকার : ‘The Rebirth of National Art of India is my dearest dream’ নিবেদিতা yoga of Art বা শিল্পযোগের সাহায্যে ভারতশিল্পের নবজাগৃতিপট রচনা করবার উদ্যোগে বৃত্ত হলেন। তার এই ব্রতের অহরতী অবনীন্দ্র-নন্দলাল।

৫। ঠাকুরবাড়িতে ভিক্তর কুঁর্যার ‘সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, (Du vrai, du beau, et du bier, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৮৫৯) গ্রন্থের প্রভাব মহাবি থেকে জ্যোতিষিল্পনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের শিল্পবীক্ষায় অববচ্ছিন্ন। নিবেদিতার প্রেরণায় স্বরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ যেন সৌন্দর্য ও কল্যাণের সমীকরণের সাধনাকে মুখ্য না ক’রে দেশের শিকড় বা ঐতিহ্যবাহিত স্মৃতিপুঞ্জের সঙ্গে স্বন্দরের যোগযুক্ততা খুঁজলেন। দেশাত্মবোধ, আত্মবোধ ও শিল্পরীতির সম্পর্ক ওকাকুদার Asia is one ধারণায় প্রসারিত হলো একটি প্রাচ্য নন্দনচেতনায়। প্রাচ্যের স্বকীয় সভ্যতার উপর জোর দিতে গিয়ে ওকাকুদা-নিবেদিতা ইয়োয়োগের অল্প অল্পকৃতিকে বর্জন করবার নির্দেশ দিলেন। এই প্রাচ্যবোধ বিশ্ববীকার পরিণমী হলো না।

নান্দনিক প্রসঙ্গ

১। অবনীন্দ্রনাথ আমাদের উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্তর্মুখী উত্তর-সাধক। বিনাসিমেষ্টো divinity বা দেবায়নকে নয় humanities বা মানব-বিজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়েছে। মাহুঘের স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠাই নবজাগরণের অগ্রতম সূত্র। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রবণতারই শিল্পায়ন। তাঁর ভাষায় রেনেসাঁসের বাংলা প্রতিশব্দ—‘একালের উপযোগী সেকাল’!

যুগের প্রয়োজনে অতীতের অঙ্কুরণ নয়, অঙ্গীকার প্রয়োজন। অতীতকে ঢেলে সাজাতে গিয়ে convention বা প্রথা পরিবর্তে ঐতিহ্যের সচল ধারাটিকে (Tradition) গ্রহণ করতে হবে। ধ্রুপদী অতীত বর্জনীয় নয় কিন্তু তার সবটুকুই গ্রহণীয় নয়। অবনীন্দ্রনাথ এ সত্য বুঝেছিলেন। সেই অর্থে তিনি নব্য ধ্রুপদী শিল্পী। তাঁর ঐতিহ্যচেতনায় অবশ্য প্রাধান্য কিছু স্বন্দর কুসংস্কার ও জায়গা করে নিয়েছিল।

২। আমাদের রেনেসাঁসের মধ্যে একটি বিরাট ক্রটি থেকে গিয়েছিল। গোটা উনিশ শতক ভাবযোগের যুগ; নিবেদিতা-কথিত শিল্পযোগের কাল নয়। অথচ ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের মূলকথা প্রকাশ পেয়েছিল শিল্পের মধ্য দিয়ে, কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দুই দশক ও বিশশতকের প্রথম দশকের আগে আমাদের দেশে এই শিল্পকলা বা চিত্রকলা ছিল বড়জোর আর্পেক্ষিক মাধ্যম মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথ এই রেনেসাঁসের ক্রটিকে পূরণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি শিল্পনির্ভর রেনেসাঁসের ধারাত্রতী। ভগিনী নিবেদিতা তাকে এই ত্রতে উদ্ধৃত করেছিলেন।

৩। পাশ্চাত্য সংস্কারধর্মী ঐতিহাসিকের কাছ থেকে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর যুগ সম্বন্ধে সপ্রসঙ্গ উক্তি শোনা গিয়েছে। ভিন্সেন্ট শ্বিথ অবনীন্দ্রগোষ্ঠীর মূল সূত্রকে নিরূপণ করেছেন এইভাবে :

‘Their work is the indication of happy blending of eastern and western thought’ গ্রাচ্য ও প্রতীচীর ‘মিলনসাধনা’ অবনীন্দ্রনাথের একটি শিল্পৈষণা (Kunstwollen)।

অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর তাত্ত্বিক সতীর্থ আনন্দস্বামী ভারতীয় শিল্পচেতনার

মর্য ইয়োবোপের কাছে পৌছে দিতে চেয়েছিলেন। এখানেই তাঁর অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ। এঁরা উভয়েই শিল্পের বিশ্বভাষা খুঁজেছেন।

৪। তাঁরা শিল্পকে সর্ববিষয়ে প্রাদেশিকতা-মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। নব্য শিল্প সংস্কৃতির মূল কথা হবে আন্তর্জাতিকতা, আবার শিল্পের আবেদন যতই আন্তর্জাতিক হোক না কেন তার একটি স্থানিক ভিত্তি থাকবেই। শিল্পকে শরীরী করতে হলে তার একটি local bias থাকবে। অবনীন্দ্রনাথ বঙ্গ সংস্কৃতির pattern কেই বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। সে লম্বায় অল্পতম সমালোচকের মতে :

“The work of modern school of indian painters in Calcutta is a phase of the National re-awakening. The subject chosen by Calcutta painters are taken from Indian history, Romance, Epics and Mythology.... Their significance lies in their distinctive Indian-ness. The work should be considered as a promise rather than a fulfilment.”

(E. V. Havell : A History of fine arts in India and Ceylon)

যিনি অবনীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন সেই হ্যাভেলের এই মন্তব্য অবনীন্দ্রশিল্প বুঝাবার পক্ষে সহায়ক।

ভারতীয়তা

১। অবনীন্দ্রনাথ রক্ষণশীলতাকে প্রাণপণে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। সম-সাময়িক রক্ষণশীল সমালোচকেরা তাঁকে এই ভাবে বিচার করেছেন :

ভারতীয় চিত্রকলার মূল সূত্রবোধ হয় এই যে এমন বস্তু আঁকিবে বা, এমন বিকৃত করিগা আঁকিবে যে স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোন সৌন্দর্য্য না থাকে, লোকে চিনিতে না পারে’ অর্থাৎ বস্তাবের বিরুদ্ধতাই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ।’

(হরেশচন্দ্র সমাজপতি, ‘সাহিত্য’ বৈশাখ, ১৩১৭/১৯১৬)

সমাজপতিগোষ্ঠীর সমালোচকেরা মনে করেছিলেন :

শতভিষা

ক। নতুন ভারতীয় চিত্রকলার প্রায় ভারতীয় বিষয়চেনার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতিকে শিল্পের প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা গেলেও অহুত্ব ভারতীয় শিল্পের প্রধান কথা নয়।

খ। ভারতীয় স্বভাবের মধ্যে যে স্ববিয়োধিতা (Dichotomy) আছে তা এই শিল্পেও দেখা যায়। শিল্পী-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এরা প্রকৃতি থেকে সরে এলেও তার অর্থ এই নয় যে প্রকৃতিকে অস্বীকার করা হচ্ছে। প্রকৃতি মনের সঙ্গে যুক্ত হলেই (তুলনীয় Bacon: Art is Nature added to Mind) শিল্প। এই বৃহত্তর অধ্যয়সাধনে মনের পৌরোহিত্যে প্রকৃতির প্রকাশ প্রয়োজন। অবনীন্দ্রনাথ এই সত্য বুঝেছিলেন।

তার সমসাময়িক কোন কোন সমালোচক অবনীন্দ্রনাথের সমালোচনা করলেও হ্যাভেল, নিবেদিতা, স্টেলা ক্রামরিশ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন :

ক। প্রাচীন ভারতের অঙ্ক অঙ্ককরণ এই আধুনিক শিল্পে নেই।

খ। ইয়োয়োপীয় শিল্পকলায় নিসর্গ ও মানসের অধ্যয় সেই ভারতীয় অর্জন করেনি যা নব্য-ভারতীয় শিল্পচর্চার সাধ্য।

গ। সহযোগিতা ব্যতীত নিজেকে আবিষ্কার করা যায় না। সনাতন প্রথাশ্রয়িতার কবল থেকে বেরিয়ে এসে প্রাচীন প্রাচী-প্রতীচী আধুনিক-তার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে তাকে নতুন করে দীক্ষিত করতে পারে। নব্য ভারতীয় শিল্পকলায় এই সহযোগিতায় ফলে তিনি একটি নতুন দিগন্ত রচনা করলেন।

অবনীন্দ্রনাথকে যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁদের প্রবণতায় ভারতীয়-তার অভিধা ও দ্যোতনা একটি বিস্তার পেয়েছিল :

ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রা প্রবাহ, মহতী আশা ও দেশহিতৈষিতার সহিত ভারত শিল্পের এই নববিকাশের ঘনিষ্ঠ যোগ সংহত। ঠাকুর মহাশয়ের [অবনীন্দ্রনাথ] এই ছবিখানিতে [পূর্বে ঝড়, ১৯১১] আছে একটি খুশর কালিরেখা, রক্ত সন্মুখের খুশর আভাস। অথচ ভারতবর্ষের উদ্ধার প্রকৃতির সকল ভীষণতা এবং সমগ্র বিশ্ব আশা-দেহ মনে অঙ্কিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ('ভারতচিত্রশিল্পের পুনর্বিকাশ', 'প্রবাসী', ১৯২০, প্রাবণ।)

এটি 'সাহিত্য'পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রতীপপত্রী সম্পাদকের অবলোকন।

কিন্তু প্রবাসী গোষ্ঠীর সমালোচকেরা আধ্যাত্মিকতা ও স্বাদেশিকতার যে অর্থ ধরেছেন অবনীন্দ্রনাথ তাকেও সমর্থন করেননি। স্বাদেশিকতা বিষয় হিসেবে নয়, অহুযজ্ঞ হিসেবে আসবে, এই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গকে অস্বীকার না করে তাকে আপেক্ষিক স্থান দিচ্ছেন। ১৮২৫ এ অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের রাধাকৃষ্ণের পর্ষায়ের বিষয় পদ্যাবলী। যেখানে পদ্যাবলী তাঁর প্রেরণার একটি শক্তিশালী উপলক্ষ্য মাত্র।

২। শুধু ভাববস্তু নির্ধারণের দিকেই নয় জীবনবিজ্ঞাসের দিক থেকেও তিনি ভারতীয়। জীবনভঙ্গীর দিক থেকে তিনি নিহিত ভারতীয়তার মুখপাত্র। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে মনে হতে পারে তিনি মনন প্রবণতায় কখনো-কখনো অ-ভারতীয়।

৩। প্রাগাধুনিক ভারতবর্ষের শিল্পসমীক্ষার মধ্যে একটা আবুনিকতা আছে প্রাচীন বা মধ্যযুগের শিল্পে আত্মিক অভিব্যক্তি ঘটেছে—অবনীন্দ্রনাথ এই সূত্রে প্রাচীন ওষুকে উদ্ঘাটন করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ সস্তার শৈলীকে রূপ দিতে গিয়ে অহুযজ্ঞ করেছেন ভারতীয় জীবনভাবনা একটি ঐতিহ্যে আশ্রিত নয়। এই পটভূমিকা অনেকগুলি ঐতিহ্যের আধার।

ক) বৈদিক যুগ পর্ব। অবনীন্দ্রনাথ-আনন্দকুমার থেকে শুরু করে নন্দলাল-বিনোদবিহারী পর্যন্ত প্রত্যেকেই বৈদিক শিল্পতত্ত্বের কাছ থেকে এই নির্ধারণ গ্রহণ করেছেন যে প্রতিদিনের জীবনের ঘরোয়া অহুযজ্ঞকে শিল্পে অস্বীকার করা যায় না।

অবচ্ছিন্ন শিল্পে বৈদিক-লৌকিক/প্রাক-পৌরাণিক ভাবকেরা বিশ্বাস করতেন না। প্রাচীনকালে আলপনা ছিল আতিথেয়তার আঙ্গিক বা পালা-পার্বনের একটা জরুরী মাধ্যম। কিন্তু কেবলমাত্র সাংসারিক প্রয়োজন চারিতার্থ করবার জন্য এই সৌন্দর্য ব্যবহৃত হয়নি। আমাদের বোধবৃত্তি অহুযজ্ঞের জন্য শিল্পের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু সৌন্দর্যের ব্যবহারে মানসিকতার পরিসর বাড়ে। 'রথ'-ও একটা শিল্প। যে রথ তৈরী করে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনকেও তৈরী করে না। কিন্তু ঘরোয়া জীবন থেকে সরিয়ে রথকে মিউজিয়ামেও স্থান দেওয়া যায় না, কারিগর মানেই শিল্পী নন কিন্তু শিল্পী মানেই কারিগর, একথাটিও এই প্রসঙ্গে অস্বীকার করা যায় না।

এইজন্মই প্রেরণা বলতে পরিশ্রমও বোঝায়, মার্কসীয় শিল্পজিজ্ঞাসায় শ্রম পূর্বপ্রতিজ্ঞার মৰ্ধাদা পেয়েচে। শ্রমের প্রাণম্পন্দন থেকেই গীতিবন্ধ কবিতার জন্ম। অবনীন্দ্রনাথ এই থিয়োরির সঙ্গে বিশ্বাস না করলেও তাঁর নান্দনিক আলোচনায় এ চিন্তা মাঝে মাঝে আভাসিত হয়ে ওঠে।

খ) রসবাদের উপর অবনীন্দ্রনাথ আনন্দকুমারের গভীর আস্থা ছিল। রসবাদের উৎস আমাদের পুৰাণ ও উপনিষদের যুগেই। অবনীনাথ শাস্ত্রের মধ্যে শিল্পকে দেখেছেন। আত্ম-আনন্দনের উপর কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েছেন। রসবাদের দার্শনিক এষণা, নিজেকে জানা এবং নিজেকে পাওয়া। ‘স্বয়ং বিদানন্দের’ তাৎপর্য নিজেকে জানা। আত্মপরিচিতি না থাকলে শিল্পস্বার্থ। শিল্পকে জানতে হলে শিল্পীকেও জানতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ এই ধারণার ওপর জোর দিয়েছেন। যদিও একধার তাৎপর্য এই নয় যে অশ্রুতসর্বস্ব শিল্পীকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। তাই কিউবিজমকে তিনি কুজাইজম বলে বিদ্ব ক করতে ছাড়েন নি। শিল্পী শিল্পে তার নিজের হৃদয়কে রূপায়িত করেছে।

আমাদের মনে সবসময়ই একটি জগত নিমিত হতে থাকে। শিল্প এই জগতের একটি অভিক্ষেপ। এই অর্থে শিল্পায়ন যেন পূর্বনির্নিত। একটি মূর্তিতে ব্যক্ত কল্পনা শিল্পীর স্বপ্নার মধ্যেই অনেক আগে থেকে তৈরী হয়ে থাকে। এর সমর্থনে আনন্দ কুমারস্বামী বলেছেন :

We see an anticipation of modern views which associate myth and dreams and art as essentially similar, and representing the dramatization of man's innermost hopes and fear. (Hindu view of Art)

স্বপ্নপূরণ বা স্বপ্নের নক্সা পূরণেরই সৃষ্টি। যে শিল্প শিল্পীর আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে না তা লঘু। শিল্পী নিজেকেই উৎকীর্ণ করেন।

ভারতপূরণ বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছে আত্মপ্রকাশ ছাড়া শিল্পের কোনো মৰ্ধাদা নেই। অগ্নিপূরণে এরকম সংকেত দেওয়া হয়েছে, একজন ভাস্কর শিল্প কাজ গড়বার আগে নিজের স্বপ্নের পরিমাপ নেবেন। কোনারক, খাজুরাহো ইলোরাতেও এইসব শিল্পের মানসিকতা উৎকীর্ণ হয়েছে শিল্পের মধ্যে। এই

স্বত্বটিতে অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করেন ভারতশিল্পীর মূর্তিধ্যানে
আবেগবাসনা সঞ্চারিত।

বেনেদেক্তো ক্রোচের অঙ্গীকারও এই স্বত্রে অনিবার্য :

The artist whenever makes a stroke with his brush
without having previously seen it with his imagination
is no Artist.

গ। অবনীন্দ্রনাথ পূর্বতন ঐতিহ্যকে মেনে নিয়েছেন, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের
জগৎ বহিরঙ্গ ঘটনাকে বিপর্যস্ত করা শিল্পের ধর্ম। সত্যের প্রয়োজনে বহির্বিষয়
বিপর্যস্ত হচ্ছে। যাত্তিক বস্তুসংগতি মানা হয়নি। অজস্র সপ্তদশ শতাব্দি—
গোপার কাছে ভিক্ষারত বুদ্ধদেব—এই চিত্র অবনীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়। সেখানে
তিনি এতই বিশাল যে শরীর সংস্থান যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আত্মিক জীবনের
স্তর দেখানোর জগৎ শরীরসংস্থান বা পারিপার্শ্বকে ভারতীয় শিল্পী অতিক্রম করে
গেলেন। সেমিটিক শিল্পকলাতেও এ ব্যাপারটি আছে। কিন্তু 'সেটি শক্তির
স্তরবৈষম্য থেকে নিষ্কাশিত। অবনীন্দ্রনাথ এধরনের অভিপ্রায়কে তাঁর সহজাত
আভিজাত্য বোধ সত্ত্বেও, কখনো স্বীকার করেননি।

ঘ। অবনীন্দ্রনাথের নিজের মনে প্রাণ উঠেছিল—শিল্পীর অধ্যয়ন সার্বজনীন
হতে পারে কিনা।

Art is a matter of De-subjectivization of the artist's
subjective feelings and it raises the most contro-
versial issue of his acceptance by all, objectively.
(S. K. Nandi 'The journal of Aesthetic and Art
criticism, Vol XVIII)

শিল্পীর হাতে যা ভাবগত তা হয়ে উঠবে তদুগত। এই আত্মবিলোপক্ষমতা
আবার অনাত্মকেন্দ্রিকতা। এই অহুভূতিগুলি সত্যায় সূচিত হবে আবার বস্তুরূপেও
প্রকাশ পাবে। এই মতাদর্শ ধ্রুপদী পশ্চিমী নন্দনতত্ত্বের অগ্রপ্রাঙ্গিক।
আরিস্টটল থেকে শুরু করে অন্তত ফিলিপ সিডনি পর্যন্ত ইয়োবোপের নন্দনতত্ত্ব
'Imitation' এর উপর নির্ভরশীল। বিষয়গত বা বস্তুগত যে কোন ঘটনাকে
অনুকরণের চেষ্টা চলছে।

সুতরাং De Subjectivization বা ব্যক্তিসত্ত্বকে সার্বজনীন করাই হলো

ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের নির্দেশ। এই শিল্পতত্ত্বে fancy বা খেয়ালের স্বযোগ নেই। আমরা যা করি জগৎকে তা আত্মগত, শিল্পতত্ত্বে বিশ্বগত। অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে এই ধারণা সমর্থিত হয়েছে।

৪। শিল্পীর এই সমাগ আগ্রহ ভিতরকে বাইরে নিয়ে আসে, কিন্তু সাধকের আগ্রহ তাঁর ভিতরেই আবদ্ধ। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের কাছে একযোগে রস ও সত্যকে দাবী করেছেন। এই সত্যের দৃষ্টি থাকার ফলেই শিল্পী জগতকে নিছক বস্তু নয় ভাবরূপেও দেখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ এই সত্যের স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে ভারতীয় বিষ্ণুধর্মোক্তের পুরাণের কাছে গেছেন। বিষ্ণুধর্মোক্তের পুরাণের ব্যাখ্যাসহ অম্ববাদ করলেন স্টেলা ক্রামরিশ।

'Whatever painting bears a resemblance to this earth, with proper proportion, fall in height, with a nice body round and beautiful, is called true to life'.

যে ছবির জগতের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, সুসঙ্গতি আছে, দীর্ঘায়ত, সুঠাম, বৃত্তায়ত তাকেই জীবনের কাছে বিশ্বস্ত বা সত্য বলা চলে। এই অমর্ত মাত্রাটি কি বাস্তব জগতে সম্ভব?

এই সত্যস্পর্শী মাত্রাটির সৌজস্বে অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পকে পুনর্বিম্বিত করতে চেয়েছেন:

পুরাতন ছবিতে দেখলুম ঐশ্বর্ষের ছড়াছড়ি। ঢেলে দিয়েছে সোনার উপর সব। কিন্তু একটি জ্ঞানগায় ফাঁকা তা হচ্ছে ভাব। আমি দেখলুম এবারে আমার পাল। ঐশ্বর্ষ দেখলুম, কি করে তার ব্যবহার জানলুম। এবারের ছবিতে ভাব দিতে হবে। (অবনীন্দ্রনাথ, জোড়াসাঁকোর ধারে)

ওকাকুরা চেয়েছিলেন পশ্চিম প্রাচ্যের কাছে আসুক। অবনীন্দ্রনাথও পশ্চিমকে প্রাচ্যের কাছে শিক্ষার্থী হতে বলেছিলেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সার্বভৌম, আত্মস্থ ভারতীয়তা যার ভিত্তি।

অংশ ও সমগ্র

প্রাচ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য একান্ত নিজস্ব হলেও তা যে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যবিরোধী হবে তা অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন না। প্রাচ্যশিল্প জীবনের সমগ্রতাকে খোঁজে। এই সমগ্রতার কতকগুলি অংশে সম্পূর্ণ সংগতি আছে। এই সূত্রে অবনীন্দ্রনাথ

শতভিষা

শাস্ত্রিক যড়ঙ্গবাদ নতুন করে বাটাই করেছেন। অংশের সঙ্গে সমগ্রের পারস্পরিকতায় ঋদ্ধ এই তত্ত্বের অবনীন্দ্রকৃত ভাষ্য পশ্চিমে স্বীকৃতি পেয়েছে :

“রূপভেদ : প্রমাণানি ভাবলাবণ্য যোজনাম/সাদৃশ্যম্ বর্ণিকাভঙ্গং ইতি চিত্র যড়ঙ্গকম্।”

(১) রূপভেদ (২) প্রমাণ (৩) ভাব (৪) লাবণ্য (৫) সাদৃশ্য (৬) বর্ণিকা ভঙ্গ—চিত্রকলার এই ছয়টি অঙ্গ থাকবে। এই ছয় অঙ্গের স্বয়ম সঙ্গতিই হচ্ছে শিল্পে ভারতীয়তা।

১। রূপভেদ : তিনি প্রথম শর্ত হিসেবে রূপকে ব্যবহার করেছেন। রূপ ও রূপভেদ তাঁর কাছে সমার্থক। ‘যাকে সুন্দর বলি, তার কোঠা সঙ্কীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূর প্রসারিত। একটাতে চরিত্র নেই লালিত্য আছে, আরেকটাতে চরিত্র প্রধান। এই চরিত্রকে চিনে নেবার জন্তু অহুশীলনের দরকার করে।’ (সাহিত্যের পথ, পৃষ্ঠা ১২৮) রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অবনীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছিলো।

খ। রূচিভেদের দরুণ আমাদের চোখে অনেক কিছু অসুন্দর ঠেকে।

গ। ক্রোচে মনে করতেন : Beautiful expressions are sometimes ugly...there are degrees of ugliness”. অবনীন্দ্রনাথেরও এই বিশ্বাস।

২। প্রমাণ : অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের অমোঘতা সন্ধক্ষে বলেছেন যে ছবি বিচ্ছিন্ন নয়; বিচ্ছিন্ন জীবন দ্বারা আশ্লিষ্ট। ছবি আচ্ছাদিত নয়; ছবির মধ্য দিয়ে নিজেই নতুন ভাবে দেখা যায় এটিই ছবির প্রমাণ। রূপসৃষ্টি করে শিল্পী সাধারণ মানুষের কাছে তার প্রমাণ দেবেন। একজন শিল্পী ব্যক্তিগত অহুভূতিকে মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিল্পী একাধারে স্রষ্টা এবং সমালোচক।

৩। ভাব : সাধারণ অর্থকে অবনীন্দ্রনাথ নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন। ভাব বলতে তিনি সামগ্রিক অহুভূতি ও অভিপ্রায়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমাদের পাঁচটি বহিঃপ্রকৃতির মত পাঁচটি অন্তঃপ্রকৃতিও আছে : মন, বুদ্ধি, সংস্কার, চিন্তা ও স্নায়ুসম্বলীকে তিনি “ভাব” শব্দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বৈষ্ণব ও জাপানী এই দুই নন্দনতত্ত্বের দ্বারা তিনি প্রভাবিত। উজ্জল-

শতভিষা

নীলমনি গ্রন্থে (রূপ গোস্থামী) এইরকম দৃষ্টান্ত আছে যে ভাবের অল্পস্বল্প রূপান্তর ঘটে বিভাবের জন্ম। হাব, ভাব, ছালা—অবনীন্দ্রনাথ এই তিনটি শব্দকে একটি ভাবাসঙ্গে ধারণ করেছেন। তাই সঞ্চারীর সংখ্যা তাঁর কাছে তেত্রিশটি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী।

অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু ভাবনাকে সংখ্যা দিয়ে নিরূপণ করেননি। তিনি ভাবের দুটি দিকের উপর জোর দিয়েছেন : ভাবের (১) ব্যক্তিগত ও (২) প্রকাশের দিক।

আমাদের প্রচলিত অলংকার শাস্ত্রে যদিও ভাবের চেয়ে রসের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে কারণ ভাব ব্যক্তিকেন্দ্রিক; রস বিশ্বব্যাপী। অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু ভাবকেই সম্মানিত করেছেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভাব হয়েছে মহাভাব; রস হয়েছে রসরাজ, সেদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ভারতীয় নন। এখানে তিনি জাপানী নন্দনতত্ত্বের উপর নির্ভর করেছেন। শিল্পের গোপন রহস্য জাপানীদের কাছে যা Hanna অবনীন্দ্রনাথ তাকেই “রূপের পরিমল” বলেছেন।

এই “হানা” না থাকলে ছবি ব্যর্থ। ভাবকে নিহিত রাখতে হবে শিল্পকর্মে। এই তত্ত্বটি অবনীন্দ্রনাথ ওকাকুরার কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। দৃশ্যের আড়ালে আছে অদৃশ্য কেন্দ্র। ছবির স্তরে স্তরে ভাব ছড়িয়ে আছে জাপানী নন্দনতত্ত্বের এই কথাটি তিনি গ্রহণ করলেন।

৪। লাবণ্য : ভাব বলতে তত্ত্বচিন্তা নয় ; মানবমনের সূক্ষ্মতম ভাবনাকে বোঝায়। এই সূক্ষ্মতম ভাবনাকে সূনির্নীত করে লাবণ্য। এখানে আবার অবনীন্দ্রনাথ “উজ্জল নীলমনি” গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। লাবণ্য হচ্ছে—মুক্তাকলের ছায়া। যাতে দাহহীন দীপ্তি আছে। লাবণ্য ভাব ও ভক্তিকে সুসংহত করে। লাবণ্য যোজিত না হলে ভাবেও অসংগতি আসতে পারে যদি সেখানে ভক্তি প্রাধান্য পায়। ভক্তির সূনির্নীত সীমা নির্ধারিত করে লাবণ্য।

লাবণ্যের কাজ বিস্তৃতি এবং সংযম যার অভাবে শিল্প ব্যর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন প্রাণ। অবনীন্দ্রনাথের লাবণ্যও তাই। লাবণ্য অর্থে এখানে কেবলমাত্র মন্থতা বোঝায় না। এ একধরনের সীমাচেতনা, পরিমিতি বোধ। আগ্নেয়গিরির ছবি আঁকলেও তাতে লাবণ্য ব্যবহার করতেই হবে।

৫। সাদৃশ্য : এই সাদৃশ্য আক্ষরিক অর্থে প্রতিকল্প নয়। অবনীন্দ্রনাথ ভিতর ও বাইরের সাদৃশ্য খারিজ করে সম্ভার সাদৃশ্য দেখেছেন। Impressionist দেয় মত কেবল মাত্র বহির্জগতের সাদৃশ্য বহন করা শিল্পের কাজ বলে অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন না। Expressionism এ এর প্রতিরোধ দেখা গেল। এঁদের লক্ষ্য অহুত্বের সাদৃশ্যে প্রতিলিপি রচনা করা।

অবনীন্দ্রনাথ “মত ও মত্রে” এই দুই জগতকে অস্বীকার করে এক অস্তিত্বের প্রস্থান খুঁজেছেন। এই সাদৃশ্য আমাদের কাছে সৃষ্টির রহস্যকে মনে করিয়ে দেয়। সাদৃশ্যের দ্বয়কম প্রকার ভেদ : কোন কোন শিল্পী বস্তু সাদৃশ্যে বস্তুই এঁকেছেন—তাকে অধম সাদৃশ্য বলা যেতে পারে। এই অধম সাদৃশ্যের উদ্দেশ্য তিনি উত্তমসাদৃশ্যকে স্বীকার করেছেন। এখানে ভাবের অহরুপণে সাদৃশ্য আসে।

৬। বর্ণিকা : বর্ণিকা (Sense of colour) বা বর্ণজ্ঞান। বর্ণিকা বলতে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে শিল্পী যখন শিল্পের রূপ ও রেখাকে এবং তার রহস্যকে অহুধাবন করেন তখনই তিনি রঙের ব্যবহার করতে পারেন। ভারতের নাট্য শাস্ত্রে ভিন্নরঙের ভিন্ন প্রতীকবাদ আছে। প্রতীকের গভীরতা প্রকাশ পায় রঙের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। শিল্পীর চরম পরীক্ষা রঙের ব্যবহারে। এর মধ্য দিয়ে শিল্পীর মাত্রাবোধ প্রকাশ পায় এই রঙ নির্বাচনে। রঙের মধ্য দিয়ে শিল্পের এবং সৃষ্টির রহস্যকে শিল্পী ফুটিয়ে তোলেন।

প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথ এইভাবে তার নব্য-নন্দন-বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর চারটি প্রবন্ধের অমুদ্রণে এই সৌন্দর্যচিন্তার পরিচয় আরো বিশদ হতে পারে।

সুন্দর

অবনীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন ধারণাকে বিংশশতাব্দীর জীবন বোধের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এই যুক্ত করার কয়েকটি সূত্র আছে :

১। সৌন্দর্য সর্বায়ত নয়, অনমনীয় সৌন্দর্য বলে কিছু নেই। সৌন্দর্য আপেক্ষিক। “That neither comes, not goes, neither fades not flows away—” এই সূত্র থেকেও তিনি সরে এসেছেন, দিব্যসৌন্দর্যের কোন ক্ষয় বা লয় নেই অথচ অস্থিত অস্থানকেও স্থানবিশেষের মধ্যে অঙ্গীভূত করে নেওয়া যায়। অস্থানকে কোন কোন বিশেষ অবস্থায় স্থানবিশেষের অস্তিত্ব

দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম বিবেচনায় যা মানব পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত তাই সুন্দর। যা আমাদের প্রত্যক্ষ চেতনার ওপর দাগ কাটে তাই সুন্দর। নন্দনসমীক্ষা এখানেই অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচিন্তা পরস্পরকে স্পর্শ করেছে।

২। সুন্দর বিষয়গত নয় পরিপ্রেক্ষণাভিত। সৌন্দর্য দেখার ভঙ্গির উপর নির্ভর করে। এই দেখা হবে বিশেষ নির্বাচিত দূরত্ব থেকে। এই ধারণাটির তত্ত্বনাম theory of distance। সৌন্দর্যকে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে সৌন্দর্যকে সনাক্ত করা যায় না। পবিত্র অমৃত্যুকণ্ডেও আমরা সৌন্দর্য বলি কিন্তু মন্দিরের ভিতরে থেকে তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। অবনীন্দ্রনাথের প্রাচ্যবোধ হিন্দু সংস্কার নয়। হিন্দুত্বের সংস্কার ত্যাগ করে সৌন্দর্যসংস্কারকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

৩। তিনি মনে করেন সিন্ধুর হল ভালোমন্দের বিভাজন রেখা যেখানে মানব মনের আবিষ্কার। মৃগ্য সৌন্দর্যচেতনা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের সৌন্দর্য ধারণাকে প্রসারিত করতে হবে। সাদা তুষার যেমন সুন্দর কালো তুষারও তেমন, মাহুষের জীবনের যে কোন উপলব্ধি সুন্দর বলে গণ্য হতে পারে। সাহিত্য বা শিল্প প্রকৃতির আরশি নয়, জীবনের আবেগকে যে চূড়ান্ত প্রত্যক্ষতায় প্রকাশ করা যায় শিল্পে তাকে সূচিত করেই রূপ দেওয়া সম্ভব। তিনি অহুভূতির তীব্রতাকে যেমন বিশ্বাস করেন প্রকাশভঙ্গির মিতব্যয়িতাকেও সেরকমই মানেন। তিনি স্মৃতি নয়, স্মৃতির উপর জোর দিয়েছেন।

৪। অমঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরকে যোগ করলে আমাদের বোধ সমৃদ্ধ হয় বলে তাঁর ধারণা। রাজির নিঃসঙ্গতায় শিল্পের সন্ধান, অবশ্য এই অসিতচিন্তাও উপাদান, রূপ নয়। মানসিকতার সংযোজনে এই রূপান্তর ঘটে : মন বতক্ষণ কালী হইতে পৃথক হইয়া আছে, কালী ততক্ষণ কালো কালি মাত্র। আর মন আসিয়া যেমন মিলিয়াছে অমনি কালী আর কালো নাই সে ষড়ঙ্কের বরণ ডালায় আলোর শিখার মতো জলিয়া উঠিয়াছে (ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, পৃঃ)

শিল্প ও ভাষা

রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সাদৃশ্য সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্বকীয়। প্রবন্ধটির অমৃত্যু মনে আসে মালার্মের কাছে দেগার সেই প্রশ্ন :

শতভিষা

“আমার মনে তো বিচিত্র ভাবোদয় ঘটে, তবু কবিতা লিখতে পারিনি কেন?” মালার্ঘের উত্তর : “কবিতা শব্দ দিয়েই লেখা হয়।” ভাব থাকলেও কবিতার প্রধান সমস্যা ভাষার সমস্যা, রবীন্দ্রনাথ ও নীরব কবিহে বিশ্বাস করেননি। যে কাঠ জ্বলেনি তাকে যেমন আগুন নাম দেওয়া যায়না তেমনি যে কবি লেখেননি তাঁকে কবি বলা নিরর্থক।

ভাষার সমস্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এঁরা দুজনেই সংস্কৃত অভিধানের কাছে গেছেন : বাণী এবং রাগিনী এঁদের আশ্রয় বাগদেবতা। ভাবপ্রকাশই একমাত্র ভাষার উপযোগিতা নয়, ভাষার শ্রেষ্ঠ উপযোগিতা নান্দনিক। মানবসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম ভাষা শিল্পভাষা। ভাষার এই ভূমিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ :

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হলো বাণী.....বাণীর চালে একটা ওজন আছে, তাহাই চন্দ্র। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য। এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে, বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই, তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্যে কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।” (“ছবির অঙ্গ”—পরিচয়)

অবনীন্দ্রনাথের ষড়ঙ্গবাদ রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ দাবী করেছেন ছবির ভাষাই সার্বজনীন ভাষা।

শিল্পের রীতি চতুষ্টয় :

- ১। শাস্ত্রশিল্প (classical academic art)
- ২। লোকশিল্প (folk art)
- ৩। বিদেশী বা পরশিল্প (foreign art)
- ৪। যিঞ্জশিল্প (adopted art)

শিল্পের এই চারটি ধারার সবগুলিতেই শিল্পীর সংরক্ষণ ঘটবে। কোন একটির মধ্যে আবদ্ধ হওয়া মানেই তাঁর মৃত্যু। আবার শিল্পী কেবলমাত্র শিল্পের নানা স্বাধারার সঙ্গে পরিচিত হলেও চলবে না। তাঁকে সঙ্গীত বা মানবজীবন/মানব-ভাষা এবং সাংকেতিকতা এই দুটিকে মেলাতে হবে। অবনীন্দ্রনাথের মতে চিত্রকলায় থাকবে—কথিত ভাষা, চিত্রিত এবং ইঙ্গিতের ধারণা।

ভাষার আদলে ছবিও আছে, সংগীতও আছে। ছবির মধ্যে লেখার

ধারণা সহজেই সংঘটিত হয়। একটি ছবির আবেদন বড়োস্ত্রিময় সমগ্র মানুষের কাছে।

একটি বিষয়কে তার উপযোগী ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। যেমন চিত্রময় অল্পভূতি চিত্রের মাধ্যমে। Jespersen বলেছেন : An ideal language would always express by the same thing by same and by similar things by similar means.

অবনীন্দ্রনাথও জানেন ছবির মধ্যে মানবভাষার সাংকেতিকতা থাকবে। যখন যে অল্পভূতির প্রকাশ হচ্ছে সেই অল্পভূতি মাধ্যম হবে।

শিল্পী যখন সামগ্রিক আবেগকে শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন সে ভাষা সূর্য, চন্দ্র নক্ষত্রের মত গ্রন্থিত। একটি ছবি থেকে সুরকে সরিয়ে নেওয়া যায় না। 'A change of language can transform our appreciation of cosmos' বলেছেন বেঞ্জামিন লী হফ। ছবি থেকে একটি বং সরিয়ে নিলে কবিতা থেকে একটি শব্দ সরিয়ে নিলে বিশ্বজগতের ভাষাই নষ্ট হয়ে যায়।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবির ভাষা বিশ্বভাষা, যার ভিতরে বিশ্বজগতকে ধরা যায়। বিশ্বদর্শন বা বিশ্বচেতনাকে বোকানোর জন্তু তাঁরা ছবিকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন।

জাতি ও শিল্প

এই প্রবন্ধটি শিল্প ও ভাষার সম্পূরক। এটি রচনায় একটি উদ্দীপন প্রেরণা ছিল। বিশ শতকে জাতীয়তাবাদের আন্দোলন ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। আর্থসমাজ থেকে হিন্দু মহাসভা পর্যন্ত একটি জঙ্গী জাতীয়তাবাদ দেখা দিয়েছিল ধর্মীয় নীতির সম্পর্কে।

অবনীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। আর্থ ও প্রাচ্য সমার্থক বলে ঘোষণা করা সেই আন্দোলনের মূখ্য বিষয় ছিল। অবনীন্দ্রনাথ সেভাবে দেখেন নি। তাঁরা আর্থতাকে সবার উপরে স্থান দিতে চাইলেন অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের ওপর জোর দেন। তাঁর মতে নিখিল মানুষের মধ্যে জাতীয়তা ও দেশজ ভাব নিশ্চয় আছে কিন্তু সেই সঙ্গে সে বিশ্বজনীন। তিনি স্থানিক মানলেও আন্তর্জাতীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

অবিভাজ্য যে শিল্পরস তা দেশী বা বিদেশী সেটা প্রশ্ন নয়। সে রস হবে সর্বজনীন। এখানে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থেকে ঈশ্বর স্নেহে গেছেন। শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি—রাবীন্দ্রিক শিল্পচিত্র দেবশিল্প দ্বারা শাসিত। অবনীন্দ্রনাথ মানব ও দেবশিল্পের উপর পার্থক্য প্রকটিত করতে চাইলেন না। তিনি মনে করলেন জীবন ও জগতের তাবৎ শিল্প এক। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রকথিত আধ্যাত্মিক শিল্পের শ্রেষ্ঠতাকে বিরোধিতা করলেন।

“সত্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কবিতার অবনয়ন ঘটে” এইনির্ধারণের অঙ্কুশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন জাতীয় উৎকর্ষের সঙ্গে শিল্পের অপকর্ষ ঘটে। জাতির উন্নতির সঙ্গে শিল্পের কোন যোগ নেই। (জাপানের চিত্র।)। জাতির সঙ্গে শিল্পী কবির যোগ জাগ্রতের সঙ্গে ঘুমন্তের ছায়া। এই ভারতম্যকে সমাপাত্তিক ভারতম্য (Concomitant Variation) বলা যায়।

এর দৃষ্টান্ত :

ক) রাশিয়ায় জারের সময়ে জাতির অবনতির ফলে টলস্টয়ের আবির্ভাব।

খ) ১৫ শতকে ‘নো’ রচিত হয়েছে দ্বন্দ্বহিংসার যুগে। আবার অন্তর্দিকে দ্বন্দ্বময় কাবুকিনাট্যধারা রচিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত শান্ত সময়পটে।

গ) রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, জাতির সমাধির উপর সাহিত্যের ফুলবাগান নাই বা রচিত হলে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতীয় জীবনে শিল্পীর একটি পরিমণ্ডল থাকলে ভালো হয়। অবনীন্দ্রনাথের কাছে জাতি একটি পুরাণকোষ। তার রূপকথা, ব্রতকথা প্রবচনগুলিও শিল্পীমনে কাজ করে। এই চেতনা জন্মগতভাবে প্রোথিত। এটিই জাতীয় চেতনা। এই স্মৃতির উত্তরাধিকারকে শিল্পী নিজেই তাঁর শিল্পে প্রকাশ করেন। আয়োজিত জাতীয়তাবাদ শিল্পের পরিপন্থী।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিল্প art for Nature's sake নয়; art for Artist's sake এর ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে। শিল্পেই শিল্পীর মুক্তি তার সত্তার অবস্থানে। সেখানে তাকে জাতীয়তার বন্ধনে বাঁধা চলবেনা। শিল্পীর মনের রসবোধ শিল্পের সাহায্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই রসবোধেরও একটা নিজস্ব পরিবেশ আছে। এক পরিবেশের শিল্পকে আর এক পরিবেশে চালনা করা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ :

এঁদের সাদৃশ্যের আড়ালে বৈসাদৃশ্যই বেশী। দুজনেই কখনো কখনো একই উৎসসূত্র (যেমন উপনিষদ, কীটস্) ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাহলেও এঁদের দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র।

১। The mighty abstract idea of beauty in all things... I have loved the principle of beauty in all things কীটসীয় এই ধারণা রবীন্দ্রনাথে সক্রিয়। তাঁর মতে “সৌন্দর্য্য মাত্রই abstract, সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা। কীটস্‌এর সৌন্দর্য্যচেতনা থেকে সৌন্দর্য্যবৃত্ত অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের আদর্শকেই তিনি বেছে নিয়েছেন।

কিন্তু কীটস্‌এর সৌন্দর্য্যধারণার ইন্দ্রিয়চেতনাকেই অবনীন্দ্রনাথ প্রাধান্য দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের “ভধু রেখে গেল তিন ফোটা মধু”—এই অর্থেই কীটসীয় ; তাই রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নর যেখানে Truth is beauty র উপর, অবনীন্দ্রনাথের ঝোঁক “Beauty is truth” অংশের স্বয়ংস্বর্ণতায়।

২। সৌন্দর্য্যের ডাকে সাড়া দিতে হবে এই ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে বলাকা পর্ব থেকেই, ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি বিচার করলে দেখা যায় এই ধারণায় মৌল “সুট যা ... সৃষ্টিকর্তার কাছে তা স্বণী হয়ে রইলনা” (আলোর ফুলকি, ১২২২)। অবনীন্দ্রনাথের হাতে এই স্বর্ণশোধের ব্যাপারটা অনেক বেশী জীবন্ত।

৩। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ললিতকলা আকাদেমির ভাষণে অবনীন্দ্রপ্রসঙ্গে ঠিকই বলেছেন, “তিনি সাধক নন, তিনি যোগী নন, তিনি শিল্পী”। “আত্ম-পরিচয়ে” রবীন্দ্রনাথের দাবি আপাতসদৃশ হয়েও কোথাও আলাদা : “আমি বিচিত্রের দূত”। রবীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা বৃহত্তর সাধনার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কাছে শেষপর্যন্ত শিল্প উপায়।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিল্প একাধারে উপায় এবং উদ্দেশ্য। শিল্পীর জীবনকে তিনি আত্মোৎসর্গের জীবন মনে করছেন। তাঁর সাধনা তাঁর কাছে কোন অধ্যাত্ম সাধনার অছিলা নয়।

৪। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন : “জগতের উপর মনের কারখানা এবং মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা। ...সেই উপরতলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি (“সাহিত্যের বিচারক”, সাহিত্য) তখন স্মৃতিস্রোত (৫/২০/১) ঝোঁকটি স্পষ্ট।

পক্ষান্তরে অবনীন্দ্রনাথের এষণা অন্তর্মুখী। “আর্টের তিনটি স্তর আছে। একতলায় craftsman, দোতলায় যা তৈরী হয়ে আসে একতলা থেকে তেতলা হচ্ছে অন্দরমহল, মানে অন্তরমহল যেখানে শিল্প মুক্ত।” শিল্পের এই সর্বাঙ্গিক মুক্তি রবীন্দ্রনাথের দেবশিল্পশাসিত নন্দনতবে নেই।

৫। ১৯৩৪—অবনীন্দ্রমুখী হলেন রবীন্দ্রনাথ। অঙ্কবিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ভাষণে তিনি বলেন—শিল্পের সত্যও সার্বজনীন হয়না। শিল্পীর ব্যক্তিগত হৃদয়ে শিল্পের জন্ম এবং মানবরুচি আপেক্ষিক। একথা আগেই অবনীন্দ্র বলেছেন—“সুন্দর” প্রবন্ধে (বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃ ১৭৫)।

৬ এঁদের দুজনের ব্যবহারিক ও নান্দনিক শিল্পতত্ত্বগত পার্থক্য : ‘অবকাশের মঞ্জরী’ এই রোম্যান্টিক প্রেক্ষণী থেকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পকে দেখেছেন।

ললিতকলা ও ফলিত শিল্পের মধ্যে সহজ যাতায়াতের পথে অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যহ জীবন থেকে সৌন্দর্য আহরণ করেছেন। প্রাত্যহিকতার মধ্যে সুন্দরের চর্চা—অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, বিনোদবিহারীর বিশেষত্ব। লৌকিক জীবন-সাধনাকে সৌন্দর্য সাধনায় অঙ্গীভূত করলেন এঁরা। সুন্দরকে অবনীন্দ্রনাথ নির্বাক্তক করে দেখেননি বলেই ‘সৌন্দর্য’ শব্দটি—রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত—তার ততোটা পছন্দসই নয়। “সুন্দর”ই তাঁর সুন্দর।

৭। অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি নিঃশর্ত। বেশি কিন্তু এই শর্তহীনতা নন্দনতবে যতোটা, স্বরচিত শিল্পে তার নান্দনিক প্রয়োগে নিঃসন্দেহে তার কণামাত্রও নয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ, এমনকি গগনেন্দ্রনাথ, অনেক বেশি আধুনিক।

শরীক বন্দ্যোপাধ্যায়

উইলিয়ম ব্লেক : ছবিতে কবিতা

বহর চরিত্রশেক হল, উইলিয়ম ব্লেকের অনন্ততা সমালোচকদের আলো-
ড়িত করেছে। কবিতার ইতিহাসে ব্লেকই একমাত্র যিনি ভাষা ও ছবির
সামুদ্র্যে কবিতা গড়েছেন। ব্লেকের কবিতা রেখা-রঙে বিভূষিত এক ডিজাইন
বা এচিউ—ভাষায় যা বিধৃত ছবিতে তা কখনও প্রসারিত, কখনও সঙ্কুচিত,
কখনও বৈষম্যে আহত। ব্লেকের কবিতা মুদ্রনযন্ত্রের প্রসাদে কালো টাইপে
ছেপে যখন হাতে আসে, তখন তার অর্থসম্পদ হারিয়ে যায়। এচিউর
লার্মগ্রিক বিভ্রাস্যেই এই কবিতার অস্তিত্ব, তার গভীর পরিমণ্ডল থেকে
বিছিন্ন করে আনলে ব্লেকের কবিতার অঙ্গহানি তথা অর্থহানি ঘটে।
অথচ এতাবৎকাল ক'জনই বা ভাষায় ছবিতে মিলিয়ে ব্লেকের কবিতা
পড়েছেন, এলিয়ট পড়েননি, লীভিস পড়েননি। স্বেটসও পড়েননি, কিন্তু
তিনি অন্তত ব্লেকের ছবি চিনেছিলেন, যেমন চিনেছিলেন আরেক কবি-
শিল্পী ডি. এ্যচ. লরেন্স। অথচ এই দুই দৃষ্টিকে না মেলালে 'দ লিটল্
বয় লষ্ট' ও 'দ লিটল্ বয় ফাউণ্ড'-এ দৈবের দুই বিবাদী মূর্তি চোখে
পড়বে না। প্রথম কবিতায় একটি শিশু কাঁদছে, তার বাবার কাছে
কাতর মিনতি জানাচ্ছে, তার বাবা যেন দ্রুত পা ফেলে অনেক এগিয়ে
গেছে, বাবা সাড়া দিলে অঙ্ককারে সে তার পথ খুঁজে পাবে। প্রথম
স্তবকের নৈকট্য থেকে দূরত্বের বিভীষিকা দ্বিতীয় স্তবকে ভয়ংকর শূন্যতায়
রূপান্তরিত হয় : অঙ্ককার রাত, শিশুর বাবা কোথায়ও নেই, কোন দিন
ছিলই না, শিশু শিশিরস্নাত, সামনে গভীর পাক,

The child did weep

And away the Vapour flew.

ছবিতে 'ভেপারের' রূপ ভয়ংকর, যেন একটা হাইড্রা তার সমস্ত বাহ
প্রসারিত করে শিশুকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। হাইড্রার ব্যাধত
মুখে যেন গলিত লোহা ঝরে পড়ছে। অথচ ছোট্ট ছেলেটি দু হাত বাড়িয়ে
সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির পিছনে ছবির তান দিকে ছুটো

শতভিষা

পত্রহীন গাছ গাঢ় বাঁশ্যমী রঙের কাণ্ড খুঁকিয়ে ঘেন ছেলেটিকে ঐ দিকেই এগিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত ছবির মধ্যে একটা অবশ্যজ্ঞাবী গতি আছে, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। প্লেটের উপরাধ' জুড়ে ছবি, নিচে অলংকৃত কবিতাটি। হালকা নীল জমিতে সোনালী রঙে কবিতাটি লেখা। কবিতাটি ঘিরে ছ'টি দেবদূতের ভাসমান শরীর। প্লেটের একেবারে নিচে নক্ষত্রখচিত গাঢ় নীল আকাশ। দ্বিতীয় কবিতার ছবিতে দু'দিক থেকে তিনটি গাছ সামান্য হেলে একটি গাঢ় সবুজ তোরণপথ রচনা করেছে। তারই মধ্য দিয়ে ছেলেটি বেরিয়ে আসছে সঙ্গে এক দৈবমুতি, কবিতায় যদিও তার বর্ণনা—

কাছেই থাকেন ভগবান,

শুভ্র বসনে এলেন তার বাবার মত

—ছবিতে দৈবমুতি নারী। দৈবমুতি ও শিশু বেরিয়ে আসছে গভীর বন থেকে, ছবি থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে।

ব্রেকের জগতে দুই ঈশ্বর—এক ঈশ্বর ‘...রাজার রূপক, আর কিছুই নয়। ঈশ্বর পুরোহিত ও রাজার প্রেতমূর্তি। এরাই বাস্তব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেবলমাত্র এদেবই নিঃশব্দিত বায়ু রূপে।’ ব্রেকের নিজস্ব পুরানে ইউরিজেন, নোবোড্যাডি, অ্যান্টিক্রাইস্ট ইত্যাদি নানা নামে এই ঈশ্বর নৈতিকতার অমাহুষিক নিয়মের প্রণেতা ও নিয়ামক। এই ঈশ্বর নিজেকে ঘিরে রাখেন রহস্যের মায়াবী জালে, যাতে ভয়ে মাহুষ বশ মানে। ‘দ লিট্‌ল বয় লস্ট’-এর ছবিতে এই ঈশ্বরেরই অদৃশ্য অথচ ভয়ংকর উপস্থিতি। কবিতায় ‘ভেপার’ ও ধন’টনের ‘লর্ডস্ প্রেয়ারের নতুন অমুবাদের’ উপর ব্রেকের মস্তব্যে ঈশ্বরকে ‘ইফুভিয়া’র অংশ বলে বর্ণনা, এই ছবির যোগ ও ‘ভেপারের’ চিত্রিত প্রতিরূপে দৈবের সেই ইউরিজেনিক রূপ প্রতিষ্ঠিত।

ঈশ্বরের অল্প রূপ অর্ক বা খুঁট বা লস। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈপ্লবিক চেতনার প্রতিমূর্তি রূপে অর্ক ‘অ্যামেরিকা’ কবিতায় ইউরিজেনকে লক্ষ্যোদন করে বলে :

আমিই অর্ক, অভিশপ্ত গাছের গায়ে জড়িয়ে আমিই, শেষ হয়ে গেছে তোমার

শতভিষা

যুগ, ছায়া কেটে যাচ্ছে, সকাল ফুটে উঠছে, যে আগের আনন্দ ইউরিয়েনের
আদেশে দশ অল্পশাসনে বিকৃত, যে বাজে নক্ষত্ররাজিকে সে এগিয়ে নিয়ে গেছিল
বিশাল শূণ্যতার মধ্য দিয়ে,

সেই পাথুরে আইন আমি পায়ের চাপে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি; আমি
ধর্মকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছি চার বায়ুতে,

ছেড়া পুঁথির মত, কেউ তার পাতাও জড় করে তুলবে না।

‘দি এভার’ লাস্টিং গম্পেল’-এ খুঁট গনিকাকে ক্ষমা করেন, কিন্তু সেই
ক্ষমাও অর্কের প্রচণ্ড বিপ্লবের মত।

‘মোজেস আদেশ দিলেন তাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করা হোক।

যা শু কী বললেন ?

তিনি হাত রাখলেন মোজেসের আইনের উপর;

স্তম্ভিত সজ্জন্ত প্রাচীন নক্ষত্রলোক

মেরু থেকে মেরু অভিযানে ভারগ্রস্ত,

সরে যেতে লাগল।’

‘অ্যামেরিকা’র বৃটিশ সৈনিকেরা যখন মার্কিন মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি-
রোধের মুখে অশস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের সামনে

‘সমুদ্রকূলে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর মাহুখের সারি, তাদের বসনের

আড়ালে শিশুরা আশ্রয় নেয় বজ্রের ভয়ে।

অর্ক বা খুঁট শিশুদের আশ্রয় দেন, ‘অ্যামেরিকা’র নবম প্লেটে নাগমুর্তি
অর্ক তার পিঠে নয় শিশুদের বহন করে নিয়ে যায়, এক নয় বালিকা
তার গলায় লাগাম পরিয়ে টানে, অথচ অর্ক যেন হেসে ওঠে। যে প্লেটে
ইংলণ্ডের আত্মা অর্ককে ভিরঙ্কার করে, ‘মহত্ত্বের যুদ্ধে চিরন্তন সিংহের গর্জনের
মত,—উন্নত-বিপ্লবের ‘ভক্ত’ বলে তাকে ধিকার দেয়, ত্রেক সেই অভিযোগের
অসারতা প্রমাণ করতে লেখা ছত্রগুলিকে ‘ফ্রেমিং’ করেন, বাদিক বেয়ে একটি
গাছ উঠে গেছে, তার ডাল হেলে পড়ে এক অসম্পূর্ণ তোরণ রচনা করেছে।
ডালগুলির প্রান্তে বাঁক বাঁক ফোঁটা ফোঁটা ফুল। ডালে পাখি বসেছে, একটি
পাখি উড়ছে ডালেরফাঁক দিয়ে। ছত্রগুলির নিচে দুটি নয়শিশু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে।
তাদের সঙ্গে একটি ঘুমন্ত ভেড়া; একটি শিশু শুয়ে আছে তারই পিঠে, স্তম্ভজন

বাসের উপর। কাছেই একটি ফুল ফুটেছে। অর্কের বিপ্লব শাস্তির পূর্বপট। অর্কের বিপ্লব শিশুদের মুক্ত করে মিথ্যা মোহ ও ভয় থেকে।

‘লিটল্ বয় ফাউণ্ড’—এর দৈবমূর্তী অর্ক-খুঁটেরই প্রতীভূ বলে মনে হয়। আগের প্লেটের দেবদূতেরা বানক্ষত্রখচিত আকাশ এই প্লেটের সম্ভাবনার আভাস দেয়। এক প্লেট থেকে অল্প প্লেটে উত্তরণ, এর নাটকীয়তা লক্ষনীয়।

ভার্জিল প্রসঙ্গে একটি ছোট লেখায় ব্লেক লেখেন: ‘গ্রীক শিল্পের গঠন গাণিতিক; গথিকের গঠন জীবন্ত। গাণিতিক গঠন যুক্তিময় স্বাতিতে চিরন্তন, জীবন্ত গঠন চিরন্তন অস্তিত্ব।’ গ্রীক স্থাপত্যের নিরেট দেয়াল, নির্মম নিয়ন্ত্রিত ধাম, সব মিলিয়ে অটল যুক্তিবাদেরই পরাকাষ্ঠা। গ্রীস-রোমের যুদ্ধবাদী সাম্রাজ্যসমূহের পিছনে যে প্রবল আত্মবিশ্বাস বা শক্তিদম্ব তারই প্রতীক হিসেবে ব্লেক দেখেছিলেন গ্রীক স্থাপত্যের কঠোর সংযমকে। তাই ‘ভিভাইন কম্বোড’ চিত্রাবলীতে ২০১ সংখ্যক প্লেটে, ‘জোব’ পর্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম প্লেটে গ্রীক দেয়াল এবং পোস্ট ও লিনটেল স্থাপত্য পতনোত্তর পৃথিবীর অন্ধতা ও অহুভবহীন অস্তিত্বের প্রতীক। অন্তর্দিকে গথিক স্থপতি এমনভাবে জানলা বসান, আলোকে খেলে বেড়াতে দেন যে দেয়ালই হয়ে ওঠে স্বচ্ছ, তার ইট-পাথরের কঠিন গাঁথুনি যেন মিলিয়ে যায়। গ্রীক স্থাপত্যের অভয় ভাব গথিকে রেখার বিস্তারিত ভেঙে গভীর হয়ে ওঠে। গথিকে মনোনিবেশের অনড়তা নেই রেখায় রেখায় বিচিত্র সংযোগে এক জটিল জ্যামিতি রচিত হয়। ব্লেকের ছবিতেও এই রেখারই প্রাধান্য, গথিকের রেখার বুনট তাঁর ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘লিটল্ বয় ফাউণ্ড’-এর মূলে পড়া গাছেব খিলানের বৈথিক নমনীয়তায় গথিক ধর্মের তাৎপর্য স্পষ্ট। কল্পনা নম্র, নরম; কল্পনা আশ্রয় দেয়। গথিক খিলান দৈবকে কল্পনার সগোত্র করেছে, রেখার গভীরতায় জীবন্ত করেছে। ব্লেকেরই কথায়, ‘শক্তিই জীবন, শক্তি দেহ সমুত্ত। প্রজ্ঞা শক্তির সীমা তথা বহির্পরিধি। শক্তি অনন্ত আনন্দ।’ রেখার স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা ঐ শক্তি তথা আনন্দেরই প্রতীক। ‘সংস্ অফ্ এক্সপীসিয়ন্স্’-এর নামপত্রে গ্রীক স্থাপত্যের কঠোরতা মৃত শরীরের সাযুজ্য আরো ভয়ংকর প্রাণহীন মনে হয়।

রেনল্ডস্ ও রয়াল একাডেমির শিল্পরীতিকে প্রচণ্ড বিদ্বেষে বর্জন করে ব্লেক মিকেলাঞ্জেলো, বাফায়েল ও আলব্রেক্ট ড্যুরারকে গুরু মেনেছিলেন। ছবির আলোচনায় ব্লেক জোর দিয়েছেন ‘স্থির নিশ্চিত আউট লাইনের’ ওপর; বঙের ছোপ, শেডিং বা ছায়াস্বঘমা, রেখার অস্পষ্টতা ব্লেক কখনও বরদাস্ত করেননি। যে পদ্ধতিতে ব্লেক প্রধানত কাজ করেছেন, সেই এনগ্রেভিঙের মহত্তম পূর্বসূরী নিঃসন্দেহেই ড্যুরার। ড্যুরার ও মিকেলাঞ্জেলো দুজনেই মানবশরীরের কন্টরশন ও ডিষ্টর্শনে মানুষের জীবশরীরের শক্তিমত্তা; প্রকাশ করেছেন (প্যানফস্কির ভাষায়, ‘মানুষের গায়ের কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে তার রীতিবন্ধনের নিশ্চিত আশ্রয় থেকেও তাকে বিচ্যুত করেছেন’), উলঙ্গ শরীরের পেশীর আলোড়ন মানব অস্থিভূতির শক্তিকে জাস্তব মাত্রায় প্রকাশ করে। ‘লাওকোঅন’-এ ব্লেক লেখেন, ‘উলঙ্গ রূপের উদ্ঘাটন ছাড়া শিল্পের অস্তিত্ব নেই’; লেখেন, ‘শিল্প গোপন করে না’। ১৪২৫ সালে ড্যুরারের একেবারে প্রথম দিকে ঝাঁকা পোলাইউলো অবলম্বনে দুই উলঙ্গ যোদ্ধার হাতে দুই নারীর নিগ্রহের ছবিতে যার শুরু (প্যানফস্কি, প্লেট ৫৩) ১৫১৬য় প্রোসেরপিনি হরণের ছবিতে (প্যানফস্কি, প্লেট ২৪৩) তার সার্থক উত্তরণ। মেঘের উপর ভর দিয়ে বুদ্ধকে পড়া শরীর, নানাভাবে হুমড়োনো শরীর, ভারবাহী শরীর, পড়ন্ত শরীর, উড়ন্ত শরীর, ভাসমান শরীর, জ্বলন্ত শরীর, সিঁথে দাঁড়ানো শরীর, উবু হয়ে বসা শরীর, বিচিত্র সংস্থানে মানব শরীরের বিচ্ছিন্ন মিকেলাঞ্জেলোর ‘শেষ বিচার’ থেকে ব্লেকের ‘জোব’ বা ‘ডিভাইন কমিডি’ চিত্রাবলীর মধ্যে একইভাবে উপস্থিত। ‘জোব’ চিত্রাবলী থেকে বাছাই করা যে ছবিটি এখানে উদ্ধৃত তাতে সেটানের নির্ধাতন বর্ণিত হচ্ছে জোবের পরিবারের উপর। ওপরে বাহুড়ের ডানা মেলে সেটান, বসবার ভঙ্গিতে যে গতিহীন, অগ্নিশিখার বিস্তার বা ধামগুলি ভেঙে পড়ার প্রবল তাগবে তা ছড়িয়ে গেছে। ডানার খাঁজে খাঁজে আগুনকে চিরে, সেটানের মাথা ঘিরে উদ্ভাসিত আলোর ঔজ্জ্বল্যে আগুনের বিস্তৃতিকেই গভীর করে তোলা হয়েছে। এই গতিহীনতার পরিণতি বা পরিপূরক এই হৃদয়েরই স্বাভাবিক এক্সটেনশন, পতনের ছন্দ। এই দুই ছন্দ দৃশ্য প্রভীকে যুক্ত হয় ছবির ডান কোণে, যেখানে স্থলিত গাঁথুণীর সঙ্গে সঙ্গেই হুমড়ে সোজা নিচে পড়ছে একটি শরীর—

শতভিষা

ভূমিমুখী ক্রুসিফিকেশনের ভঙ্গিতে। এই শরীরের ভূমিস্পৃষ্ট মাথা থেকে ভূমি ধরে ঘড়ির কাঁটার পথ ধরলে একটি শায়িত মৃত শরীর, তার পা পড়েছে এক টিমব্রেলের উপর, হাতে এক লায়ার। সংগীতযন্ত্র শিল্পের প্রতীক। জোব-কন্ডার মৃত্যুতে শিল্পের মৃত্যুর সঙ্কেত। ঘড়ির কাঁটার পথ উত্তরমুখী হয়ে আবেদন ও প্রার্থনায় শুরু হয়ে এক অনিশ্চিত প্রতিবোধের ভঙ্গিতে গিয়ে পৌঁছয়। অথচ লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সেটান, মধ্যের পুরুষ ও ডান কোণের পুরুষের শরীরভঙ্গি একই ভঙ্গি ভেঙে নিম্নিত, তিনটির মধ্যে ক্রমান্বয়তা স্পষ্ট। সেটানের মাথা ডান দিকে হেলে, মধ্যের পুরুষের বাঁদিকে, নিচের পুরুষের সোজা নিচের দিকে। সেটানের ডান পা সামনের দিকে এগিয়ে মোড়া, মধ্যের পুরুষের পিছনে চিতিয়ে মোড়া, নিচের পুরুষের এগিয়ে মোড়া, কিন্তু উলটে গিয়ে। সেটানের সঙ্গে তার বধ্যদের যে সম্পর্ক তথা আত্মীয়তা এই শরীর সংস্থানের সাদৃশ্যে প্রতিষ্ঠিত তারই মধ্যে এই ছবির অর্থ নিহিত। এবার লক্ষ করুন, মাজিনে নিচে, বাইবেলের উদ্ধৃতির ঠিক ওপরে দুটি কীট দুদিক থেকে এগিয়ে আসছে। ব্লেকের কল্পনায় এই কীটেরা, মাহুকের মনে ধর্ম যে মিথ্যা পাপবোধ বপন করে, তারই প্রতীক।

বহু কবিতায় বহু লেখায় ব্লেক বারবার একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন :
'যা কিছু প্রাণবন্ত তাই পবিত্র।' 'দ ম্যারেজ অফ হেভেন অ্যাণ্ড হেল'-এ
'নরকের প্রবাদের' মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

'আইনের পাথর দিয়ে তৈরি হয় কারাগার, ধর্মের ইট দিয়ে গনিকালয়।

ময়ূরের গর্ব ঈশ্বরের গৌরব।

ছাগলের ঘোনকামনা ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

সিংহের রোষ ঈশ্বরের জ্ঞান।

নারীর নগ্নতা ঈশ্বরের সৃষ্টি।'

'সব বন্ধন অভিশপ্ত হক ; সব মুক্তি ধন্য হোক।'

'মস্তিষ্ক অলৌকিক, হৃদয় বেদনা যোনাঙ্ক সৌন্দর্য, হস্তপদ সমাহুপাত।'

'ম্যারেজ অফ হেভেন অ্যাণ্ড হেল'-এ ৪-৫ সংখ্যক প্লেটে ব্লেক লেখেন, 'মাহুকের
তার কামনাকে অহুসরণ করে চললেই ঈশ্বর তাকে অনন্ত যন্ত্রণা দেবেন।.....

যারা তাদের কামনাকে সংযত করে, তাদের কামনা এতই দুর্বল যে তা

শত্ৰুত্ব

সংঘৰ্ষ মেনে নেয় এবং তাই তারা কামনাকে সংঘত করে। সংঘামক প্রজ্ঞা কামনার আসন ছিনিয়ে নেয়, অনিচ্ছুককে শাসন করে।

সংঘত হয়ে ক্রমে ক্রমে তা নির্জীব হয়ে পড়ে, শেষে কামনার ছায়ামাত্র অবশেষ থাকে।

প্যারাডাইস লষ্ট-এ এই ইতিহাসই লেখা আছে ; শাসক তথা প্রজ্ঞার নাম মেসাইয়া।

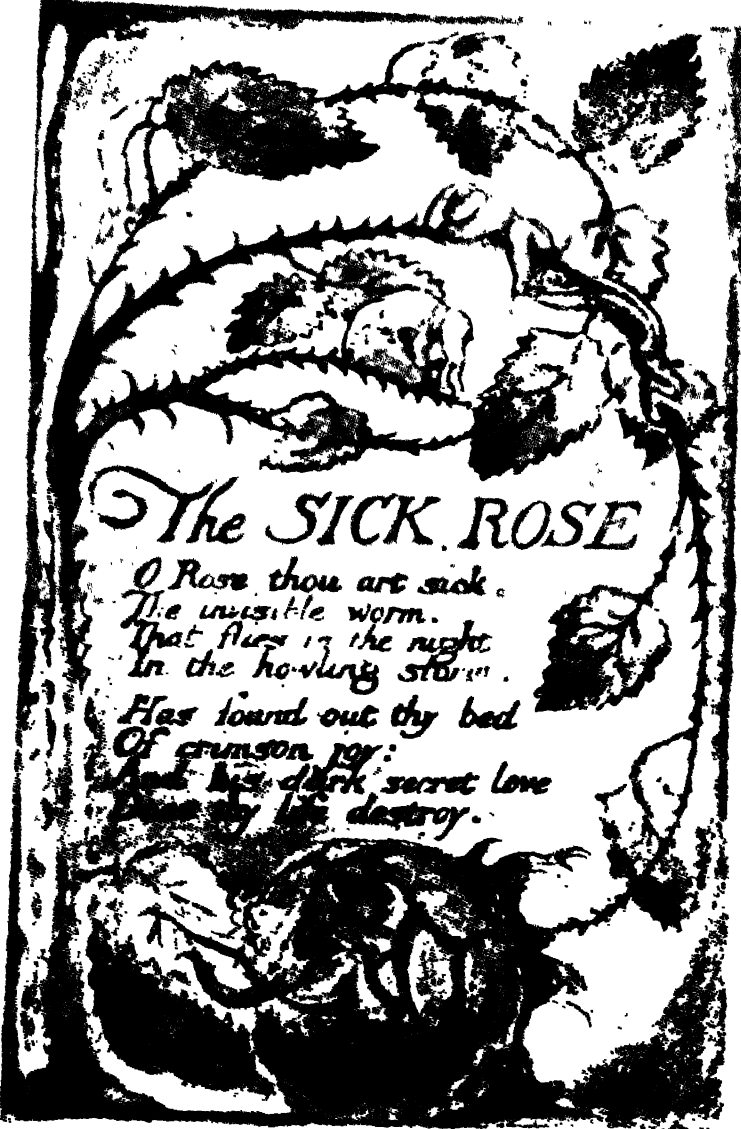
আদি মুখ্য দেবদূত বা দেবসেনাপতির নাম ডেভিল বা সেটান। তার সন্তানদের নাম পাপ ও মৃত্যু।

কিন্তু বুক অফ জোব-এ মিলটনের মেসাইয়ার নাম সেটান।’

৪ নম্বর প্লেটে ডানদিকে ভয়ংকর অগ্নিশিখা থেকে বিপ্লবের প্রেতমূর্তি অর্ক বেরিয়ে আসছে, বাঁদিকের সংঘামক প্রজ্ঞার হাত থেকে একটি নবজাত শিশুকে ছিনিয়ে নিতে। প্রজ্ঞার শাসনে এই শিশুটির জীবন যাতে শেষ না হয়ে যায়, তার শক্তি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাই অর্কের প্রয়াস। কিন্তু অর্কের পায়ে বেড়ি, প্রজ্ঞাও জাপটে ধরেছে নবজাতককে। ৫ নম্বর প্লেটের উপর এক নগ্ন তরুণের পতন, উপরে চেতানো পা, নিচে মাথা, সঙ্গে পড়ছে একটি ঘোড়া, একটি তরবারি, একটি বল, আরো নিচে লেলিহান শিখা। এ পতন অনবদমিত শক্তির পতন, ঘোড়ার বেগ, তরবারির ধার, বলের চলচ্ছক্তি, সবই শক্তির স্পষ্ট প্রতীক।

মানুষের এই শক্তিকে সংঘত করার চেষ্টা করে ধর্ম। ধর্ম ভয় ধরায়, সেই ভয় কীট হয়ে মনে বাসা বাঁধে, হুস্থ স্বাভাবিক কামনাকে বিধিয়ে তোলে। এই কীটের গোপন দংশনেই জোবের সন্তানদের মন দুর্বল, তাই সেটানের আঘাতে তাদের অনিবার্য পতন। এই কীট তাদের মনে বপন করেছে জোবেরই আত্মসম্বল ধর্মবিলাস তথা নীতিবিলাস। জোব পর্যায়ে আগের প্লেটগুলিতে জোবের সেই জীবনযাত্রার ক্রীবতা স্পষ্ট।

‘সংস অফ এক্সপ্লোরেশন’-এর অন্তর্গত ‘এ সিক রোজ’ কবিতায় আবার সেই কীট। অদৃশ্য কীট গোলাপের ‘টকটকে লাল আনন্দের উৎসে গিয়ে’ পৌঁছেছে সেখানে তার ‘অন্ধকার গোপন প্রেম’ গোলাপের প্রাণ নিঙড়ে নিচ্ছে। গাছপাতায় কবিতাটিকে ঘিরে আছে, ফুলটি মাটিতে পড়ে আছে, তার মধ্যে ঢুকেছে একটি কৃমিকীট, বেরিয়ে আসছে এক নারীমূর্তি। পাপবোধ প্রেমের



The SICK ROSE

O Rose thou art sick.
The invisible worm,
That flies in the night,
In the howling storm.

Has found out thy bed
Of crimson joy;
And his dark secret love
Does thy life destroy.

The Fire of God is

And the Lord said unto Satan Behold All that he hath is in thy Power

fallen from Heaven

3



Thy Sons & thy Daughters were eating & drinking Wine in their
eldest Brothers house & behold there came a great wind from the Wildernels
& smote upon the four Faces of the house & it fell upon the young Men & they are Dead

Wizlake invenit & sculpsit

London. Published as the Act directs March 8. 1723 by Will^m Blais N^o 3 Pauls Church Yard

আনন্দকে নষ্ট করে, প্রেমকে কদৰ্শ স্বাভাবিকতায় বিকৃত করে। গোলাপের রূপহীন জড়তা নিরবয়বতায় ধরা পড়ে, ছবিতে ডালের কাঁটা, ফ্যাকাশে সবুজ পাতা, পাতার খাঁজ কাটা ধার, এই সবেরই প্রাধান্য। ওপরের দিকে বাদিকে একটি হলুদ স্ত্রোপোকা একটি পাতায় কামড় বসিয়েছে। ডালগুলি যেখানে হেলতে শুরু করেছে, ডাল জড়িয়ে সেখানে দুই অবসন্ন ভেঙে পড়া মূর্তি, গোলাপী রঙে তারা অবসন্ন কীটদষ্ট গোলাপেরই স্বজন।

‘সংস অফ ইনোসেন্স’ ও ‘সংস অফ এক্সপীরিয়ন্স’-এর দুটি পর্যায়ের মধ্যে এক পর্যায়ের কবিতার সঙ্গে অন্য পর্যায়ের কবিতার পরিপূরক সম্পর্ক রয়েছে, যেমন ‘দ ল্যাম’ কবিতার সঙ্গে ‘দ টাইগারের’। ‘দ সিক রোজ’-এর সঙ্গে ‘ইনোসেন্স’ পর্যায়ের ও ‘দ র্লসম্’ ‘ইনফ্যান্ট জয়’ কবিতার সম্পর্ক রয়েছে। পূর্ববর্তী দুটি কবিতার চিত্রণেই স্থূহ স্বাভাবিক দেহজ প্রেমের পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর। বিশেষ করে ‘ইনফ্যান্ট জয়’-এ গাঢ় গোলাপী ফুলের উন্মুক্ত গর্ভের বিপুল উচ্ছ্বাস ও পাশেই ঝুয়ে পড়া এক দীর্ঘ গোলাপী কুঁড়িতে উত্তরসঙ্গমের ইঙ্গিত যে সার্থকতা বহন করে, ‘মধুর আনন্দ’ কথা দুটি বারংবার উদ্ভাস্ত উচ্ছ্বসিত পুনরুচ্চারণে তারই ভাষারূপ। ‘দ সিক রোজ’-এ পাপবোধের বিশ্রী ছায়াপাতে এই মধুর আনন্দেরই কীটদষ্ট পরিণতি। ‘নরকের প্রবাদের’ আরেকটি প্রবাদ : কামনাকে যে চরিতার্থ করে না, সে ব্যাধি ছড়ায়।

‘ম্যারেজ অফ হেভেন অ্যাণ্ড হেলে’-এর ২৪ নম্বর প্লেটে ব্লেক তাঁর ছবি-কবিতা এন্ট্রোভিঙের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর প্রবল ব্যক্তিক ধর্মকল্পনা থেকেই :

‘ছ হাজার বছর পেরিয়ে পৃথিবী আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে, এই প্রাচীন বাক্য সত্য। আমি নরকে এ কথা শুনেছি।

জলন্ত তরবারিধারী সেই দেবদূতকে জীবন বৃক্ষের প্রহরা থেকে নিবৃত্ত হতে আদেশ দেওয়া হচ্ছে। সে নিবৃত্ত হলেই বিশ্বত্রস্তাও দগ্ধ হবে, অসীম হবে, পবিত্র হবে, যদিও আজ তাকে সসীম ও বিকৃত মনে হয়।

ইন্দ্রিয়স্থের প্রসারেই তা সম্ভব হবে।

কিন্তু মানুষের শরীর ও আত্মা ভিন্ন, এই ধারণা প্রথমেই নির্বাসিত

শতভিষা

করতে হবে। নরকে যা প্রাংশিত ও আবুর্বেদীয়, সেই সব ক্ষয়কর পদার্থ দিয়ে নারকীয় উপায়ে আমার রচনা মূত্রিত করে, আমি তা ঘটাও, বহির্ভূত বলে যা মনে হয়, তা গলিয়ে দিয়ে আমি অসীমকে উন্মোচিত করব।

উপলব্ধির দ্বারগুলি পরিষ্কার করে তুললেই সব বস্তু মাহুকের কাছে সত্য রূপে প্রকাশিত হবে : অর্থাৎ অসীমতায়।

কারণ মাহুস নিজেকে এমনভাবে অবরুদ্ধ করেছে যে সে সব কিছুই দেখে তার গুহার সন্ধীর্ণ ফাঁকগুলি দিয়ে।

ওপরের প্লেটে এক মৃতবৎ শায়িত পুরুষকে ঘিরে আগুনের শিখা উঠেছে। তারই মধ্যে এক নারী দু হাত ছাড়িয়ে তার উপর বাঁপিয়ে পড়ছে, সংস্কারের মন্বন্তর থেকে তাকে মুক্ত করতে, তাকে দগ্ধ করে নতুন প্রাণ দিতে।

পরিশিষ্ট

১। আমার অহুরোধে বিশ্বভারতী কলাভবনের ত্রীসোমনাথ হোর কিছু পুরনো বর্ণনার ভিত্তিতে নিচের টীকাটি লিখে দিয়ে আমাকে অনুগ্রহীত করেছেন।

উইলিয়ম ব্রেকের ব্লক তৈরী করার পদ্ধতি :

একটি পাতলা কাগজের এক পিঠে গঁদের প্রলেপ লাগিয়ে নেয়া হত। শুকিয়ে গেলে পর অ্যাসিড প্রতিরোধী পদার্থ দিয়ে তুলি কিংবা কলমের সাহায্যে রচনার অংশবিশেষ তার উপরে লেখা হত। এই পদার্থ সম্ভবত অ্যাসফল্ট, রজন এবং বেনজিন-এর মিশ্রণে প্রস্তুত হত। ব্রেকের জন্ম পূর্ব-নির্দিষ্ট তারার প্লেটে এই লেখাটিকে উন্টোভাবে চালান করা হত। প্রথমে প্লেটটিকে গরম করা হত ; অতঃপর লেখা কাগজটিকে উন্টে নিয়ে-প্লেটের উপর বসানো হত। তারপর প্রেসে চাপ দিয়ে লেখাটিকে ছব্ব চালান করা হত। প্রয়োজনবোধে বার্নিশার (চামচের হাতলের মত দেখতে এক প্রকারের ঘষবার হাতিয়ার) দিয়ে কাগজের উপরে ঘষে নেয়া হত। প্লেট থেকে কাগজ উঠিয়ে নেবার জন্ম অনেক সময় জল দিয়ে ভিজিয়ে নেয়া হত। চালান-করা লেখায় ভুল-ত্রুটি কিংবা অসম্পূর্ণতা থাকলে তা তুলি দিয়ে পুনরায় লিখে নেয়া হত। পরে সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে প্লেটের পেছনে

অ্যাসিড প্রতিরোধী প্রলেপ লাগিয়ে নাইট্রিক অ্যাসিডে ডোবান হত। প্লেটের উপরিভাগের উন্মুক্ত অংশগুলি অ্যাসিডে ক্ষয়ে গিয়ে লিখিত অংশ-সমূহ পরিষ্কার বেরিয়ে আসত। যথেষ্ট ক্ষয়ে যাওয়ার পর প্লেটটিকে অ্যাসিড থেকে তুলে জলে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে, তার্পিন তেল, স্পিরিট প্রভৃতির সাহায্যে অ্যাসফল্টের প্রলেপ সাফ করা হত এবং বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী কালি লাগিয়ে প্রেসে ছাপ নেয়া হত। কয়েকটি প্রাথমিক ছাপ নেয়ার পর উন্নত ধরণের হাতে তৈরী কাগজে (wove paper) শেষ ধাপের ছাপ নেয়া হত, বড়ীন ছবির জন্ত একটি সমতল প্লেটে বিভিন্ন বড় লাগিয়ে কাজ করা প্লেটটি তার ওপর চেপে নিয়ে বড়ীন করা হত এবং এই প্লেট থেকে কাগজে ছাপ নেয়া হত বলে বিশ্বাস।

২। ব্লেকের কবিতা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে আমি ব্যবহার করেছি :

David V. Erdman, 'The Illuminated Blake' (London : Oxford University Press 1975)

Geoffrey Keynes, ed., 'Songs of Innocence and Experience' (London : Oxford University Press 1970)

Geoffrey Keynes, ed., 'The Marriage of Heaven and Hell' (London : Oxford University Press 1975)

Andrew Wright, 'Blake's Job' (Oxford : Clarendon Press 1972)

Albert S. Roc, 'Blake's Illustrations to The Divine Comedy' (Princeton, N. J. : Princeton University Press 1965)

ব্লেকের চিঠিপত্রসহ যাবতীয় রচনার প্রামাণ্য সংকলন :

Geoffrey Keynes, 'Blake : Complete Writings' (London : Oxford University Press 1969)

ব্লেকের অন্ততম প্রিয় শিল্পী আলব্রেখট্ ড্যারাবের ছবির জন্ত ব্যবহার করেছি :

Erwin Panofsky, 'The Life and Art of Albrecht Durer' (Princeton, N. J. : Princeton University Press 1955)

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

চলচ্চিত্র

একটি চলচ্চিত্র, নির্মিত হচ্ছে যাবার মুহূর্তে, বাস্তবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়। যা থাকে তা ছোট-বড় নানান টুকরো অভিজ্ঞতা দিয়ে গ্রাথিত একটি ধারণা, একটি সিন্থেসিস। এই বিভিন্ন খণ্ডের অভিজ্ঞতা, যা শেষ পর্যন্ত জন্ম দেয় ধারণাকে, মূলত উঠে আসে চলচ্চিত্রকারের চোখ ও মনের সামনে প্রবাহিত বাস্তব ঘটনাগুলি থেকে। অঙ্ককার প্রেক্ষাগৃহে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমায় নানান দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যা ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা এই ধারণা, চলচ্চিত্র-পরিচালকের নিজস্ব, এবং যা যথার্থ ভারী হ'লেই চেপে বসতে পারে দর্শকের ধারণার ওপর, অন্তত তার পাশে জায়গা করে নিতে পারে। নাহলে আলো জলে উঠলে যা থাকে তা অশিক্ষিত ভুল ব্যাখ্যা, একটি ভুল তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর চলচ্চিত্র। তাই একজন সং চলচ্চিত্রকারের বিশেষ দায়িত্ববদ্ধতা থেকেই যায় সমকালীন অস্বাভাবিক শিল্প-মাধ্যমগুলি সম্পর্কে; সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে; কেননা এগুলি দিয়েই একমাত্র বিশ্লেষণ করা সম্ভব অভিজ্ঞতাকে। নাবিকদের বিদ্রোহ যে ঠিক হবছ ও ভাবেই ঘটেছিল বাস্তবে তা নয়, কিন্তু আইজেনষ্টাইনের 'অ ব্যাটেলশিপ পটেকমিন'-এ নাবিকদের বিদ্রোহের জন্ম ও পরিণতি দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে যখন যুমস্ত, জাগ্রত ও আক্রমণোচ্চত পাথরের সিংহের তিনটি ভঙ্গিকে জুড়ে দেওয়া হয়, আমরা এক অনন্তসাধারণ ঘটনার অসাধারণ ব্যাখ্যার সম্মুখীন হই যা আজো, বছবার দেখার পরেও, আমাদের চেতনাকে সমূলে নাড়া দেয়। অতীতকে, সত্যজিৎ রায় কৃত 'অশনি সংকেত'-এ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বৃন্তে যে ধারণা গড়ে ওঠে পরিচালকের, তা দৃষ্টান্তের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা এবং সে সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ইন্ড্রিগ্রাহ কোন দৃষ্টি খুলে দিতে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়। দুটি চলচ্চিত্রের বিষয়ই বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ-গুলি থেকে সংগ্রহ করা। প্রসঙ্গতঃ একথা বলা বাহুল্য যে একটি সং-চলচ্চিত্র যে ধারণার জন্ম দেয়, তাকে সঠিক ভাবে অনুধাবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় যদি দর্শক-কূলের মন ও মনন যথার্থ শিক্ষিত না থাকে। এদেশে তৈরী ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ছবিটি তার একটি দুঃখজনক উদাহরণ। বুদ্ধিজীবিকুল, এমন

কি ভারতবর্ষে অগ্ন্যান্ত শিল্পকর্মে নিম্ন অজস্র মানুষ আজো চলচ্চিত্রকে কবিত্বের নিবোধ আনন্দদায়করী এক বস্তু বা তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশী ছাড়া অল্প কিছু ভাবেন না। আপামর দর্শককুল তো অশেষ দূরের মানুষ। তাই চতুর্থ শ্রেণীর রঙ্গিন হিন্দী ছবির দর্শকদের মধ্যে আজো ঘাপটি ঘেঁষে বসে থাকেন কবি, চিত্রকর, বাদক প্রভৃতিরা। কলকাতায় কখনো কখনো বহুখ্যাত চলচ্চিত্র দেখানো হয়, সেখানে বয়স্ক বা তরুণ কবি, গল্পকার, চিত্রকারদের দেখা পাওয়া প্রায় উল্লেখযোগ্য এক ঘটনার মতো। কয়েকদিন আগে, এক নতুন চলচ্চিত্রকারের ছবির সংগীত গ্রহণের সময় উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছিলো। সংগীত পরিচালক একজন বিশেষ-খ্যাত নবীন সরোদবাদক যিনি ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি মাত্র চলচ্চিত্র দেখেছেন বলে আমাকে জানান। তাঁর কথা আমাকে চমৎকৃত করে, আমি ভাবতে শুরু করি কিসের আগ্রহে চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন; ভাবতে শুরু করি চলচ্চিত্রবোধহীন এই নবীন সরোদবাদক নতুন পরিচালক বন্ধুর ছবিটির প্রতি কিভাবে সুবিচার করবেন। এদেরই ঠিক বিপরীত দিকে আছেন অল্প অক্ষম ফিল্ম-ডিরেক্টরের দল, যাদের সংখ্যাই বেশী, অগ্ন্যান্ত শিল্প-মাধ্যমগুলি সম্পর্কে যারা যথার্থভাবে অসৌম্য মূর্খ। দুঃখের বিষয়, এদের অজ্ঞানতা আজো যথেষ্ট ক্ষমা পায় এবং ফিল্ম-ব্যবসার কুচক্রে এরাই আসল ভাঁড়, হয়তো এদের এখনো অনেক খেলা-দেখানো বাকি আছে।

বস্তুত একজন চলচ্চিত্রকারের অজ্ঞান। অভিজ্ঞতার অজস্র মণি যেমন লুকিয়ে আছে কবিতায়, গল্পে, চিত্রকর্মে এবং সংগীতে; তেমনই, এই মাধ্যমগুলি যারা ব্যবহার করেন তাদেরও অনেক কিছু গ্রহণ করার আছে চলচ্চিত্র থেকে। এই পারস্পরিক সাহায্যের প্রবণতায় শিল্প-মাধ্যমগুলিকে আরো জোড়ালো ভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্র হয়তো অনেকখানি আবিস্কৃত হতে পারে। একটির পর একটি শব্দ এবং লাইন এসে যেমন একটি কবিতা গড়ে তোলে, তেমনই এক একটি দৃশ্যকে একের পর এক সংস্থাপন করে তৈরী করা হয় চলচ্চিত্র। এই দুইয়েরই মূলে আছে সঠিক সম্পাদন। এই সঠিক সম্পাদনই দুটি মাধ্যমের প্রাথমিক শর্ত—গতিময়তা থেকে শুরু করে মাধ্যমদুটিকে স্বর্ণাঙ্গ শিল্পকর্মে উত্তীর্ণ করে দিতে বিশেষ গুরুত্বের ভূমিকা পালন করে। এক ভূতীয় নয়ন, যা জন্ম নেয়

• খণ্ড খণ্ড অশেষ ঘটনাপ্রবাহ থেকে নির্বাসিত এক বোধের থেকে, কবি এবং চল-

চিত্রকারের চেতন এবং অবচেতনে কাজ করে যায় সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে সঙ্গে ও তাদের সঠিক সম্পাদন-পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করতে সাহায্য করে। একজন অক্ষম কবির কবিতায় দেখা যায় একের পর এক নির্বোধ লাইন, একটি তৃতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্রে দেখা যায় একের পর এক দৃশ্যের অহেতুক ভীড়—এই দুই-ই পাঠক এবং দর্শককে বিরক্তিকর এক সাহচর্য দেয়। জীবনানন্দ দাশের ‘ক্যাম্পে’ কবিতার প্রায় শেষে ‘এই ব্যাথা—এই প্রেম সবদিকে রয়ে গেছে—কোথাও ফড়িঙে—কীটে—মাহুঘের বুকের ভিতরে’—‘ব্যাথা’ এবং ‘প্রেম’-এর অন্তর্হীন ব্যাপকতাকে মাত্র একটি লাইনে সম্পূর্ণ আলাদা, চেতনহীন ক্ষুদ্র এবং চেতনময় বিরাট দুই জীব পদার্থের পাশাপাশি উল্লেখমাত্র করে অসীম দক্ষতায় বুঝিয়ে দিয়েছেন কবি। বিশ দশকের শেষের দিকে সোভিয়েট রাশিয়ার চিত্রস্বরণযোগ্য পরিচালক আলেকজান্ডার দভজেনকো-র ‘আরসেনেল’ ছবিটি তোলা হয়। এর প্রথমে দৃশ্য (sequence) একটি মাত্র চিত্রে (shot) শেষ হয়ে যায়। ছবিটি শুরু হয় শুদ্ধ শাস্ত বেশ কিছুক্ষণ স্থায়ী একটি মাঠের দৃশ্য দিয়ে। সহসা, এক ভয়ংকর বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সমস্ত শাস্ত মাঠ আদিগন্ত কৈপে ওঠে এবং এরপরই দর্শক সরাসরি যুদ্ধের সামনে পৌঁছে যান। হাল আমলে জুফো-র ‘ফোর হানড্রেড রোজ’-এ শেষ দৃশ্যের একটি মাত্র স্থির-সটে পরিচালক অসাধারণ দক্ষতায় ধরে রাখেন একই সঙ্গে এক প্রাণ এবং সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে। কবিতা এবং চলচ্চিত্রের এই উল্লেখ-শুলিতে দেখা যায় কত অল্প শব্দ ও দৃশ্যের সাহায্যে অনেকদূর পর্যন্ত বলা সম্ভব। আপাত সংযোগহীন এবং প্রায় বিপরীতধর্মী দুটি দৃশ্য পর পর জুড়ে ঘটনার ব্যাপকতা ও গভীরতাকে ধরে রাখার অজস্র উদাহরণ চলচ্চিত্রে আছে। চ্যাপলিনের ‘সিটি লাইট’-এ একদল দণ্ডিত মাহুঘকে দেখিয়ে পরবর্তী দৃশ্যে দেখানো হয় বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাওয়া এক ভেড়ার পালকে। মুণাল সেনের ‘মটির মাহুঘ’-এর শাস্ত হৃন্দর গ্রামের দৃশ্যের পরেই ভয়াবহ শব্দ করে উড়ে যায় যোদ্ধা উড়োজাহাজ এবং দর্শক অস্থমিত করতে পারেন আসন্ন দুঃসময়। ‘স্ববর্ণরেখা’র ঋষিক ঘটক এক মা-এর মৃত্যুর একটিমাত্র দৃশ্য দেখিয়ে চলে যান দৃষ্টান্তের যেখানে দেখা যায় এক কিশোর গাছের ডালে বাঁধা দোলনায় বসে ছুঁছে, আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝি এই কিশোর সেই মৃত মা-এর সম্ভান। কবিতায়ও এই ধরনের ব্যবহার বিশেষভাবে সম্ভব।

‘তারপর ঘাসের জঙ্গলে প’ড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত

বসন্তদিনের চটি। এবং

আকাশ আজ দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল শার্টপাজামার

মতো বাস্তবিক।

একা ময়ূর ঘুরছে খালি দোতলায়। ঐ ঘরে সজল থাকতো।

সজলের বোঁ আর মেয়েটি থাকতো। ওরা ধানকল পার হয়ে চলে গেছে।

এবার বসন্ত আসছে সম্ভাবনাহীন পাহাড়ে জঙ্গলে এবার বসন্ত আসছে
প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাড়ির ভিতরে নেমে দু’জন মানুষ তামা ও অলু খুঁজছে।

তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছ বাদাম পাহাড়ে।’

আমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছে বাদাম পাহাড়ে।’

(এই সংগ্রহের শেষ কবিতা/পুরী সিরিজ। উৎপল কুমার বসু।)

গত লেখা এবং সাজানো এই কবিতাটির প্রত্যেকটি লাইনের চিত্রকল্পের সঙ্গে পরবর্তী লাইনের চিত্রকল্প প্রায় আপাত-সংযোগহীন, পরস্পরাহীন বলে মনে হয় এবং সচরাচর কবিতাপাঠের যে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে তা বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু উপযুক্ত প্যাঠের পর দেখা যায় লাইনগুলি অসাধারণ-ভাবে গ্রাহ্য হয়ে উঠছে ক্রমশই এবং চোখের সামনে নেমে আসছে এমন এক দৃশ্য যা সমস্ত অহুভূতির মর্মে গিয়ে পৌঁছয়। একজন কবি হিসেবে, চলচ্চিত্রের সম্পাদনার মধ্যে যে বিন্যাসের আবিষ্কার লুকিয়ে থাকে তা আমার কবিতার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। কবিতার রূপক, চিত্রকল্প সরাসরি উঠে আসতে চায় চলচ্চিত্রে। আইজেনস্টাইন-রুত ‘অক্টোবর’, সেই বিখ্যাত সিনেমায় জার-শাসিত সময় বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় জার-সৈন্তের পোষাক এবং মেডেল।

১৯২৪ সালে ফার্নান্দো লেগ্যা, সে সময়ের ইউরোপের এক বিখ্যাত কিউবিষ্ট চিত্রকর, অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে একটি ছবি তোলেন, স্বল্পদৈর্ঘ্যের ওই চলচ্চিত্রের নাম ‘ব্যালো মেকানিক’, এ্যানিমেশনের ধাঁচে তৈরী এই চিত্রটি আজো চিরকালের শ্রেষ্ঠ একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র। এই সময়েই, বিশ শতকের ইউরোপে সুরিয়ালিষ্ট আন্দোলনে যে কয়েক-

জন ক্ষমতাবান চিত্রকর যুক্ত ছিলেন, তাদেরও অনেককেই ভূতগ্রস্তের মত আকর্ষণ করে চলচ্চিত্র মাধ্যমটি। ম্যান রয় থেকে সালভাদর দালি প্রত্যেকেই সেই সময় যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এই মাধ্যমটির সঙ্গে। এই শিল্পীগোষ্ঠীর তৈরী 'ল্যা এজ দ্যা অব' চলচ্চিত্রটি এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ইয়োরোপীয় ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থা এবং ক্যাথলিক-সিদ্ধান্ত-এর প্রতি এমন আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল এই চলচ্চিত্রটি যে প্রথম প্রদর্শনের পরেই প্যারিসে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। সেটা ১৯৩০ সাল।

এই সময় থেকেই সুররিয়ালিষ্ট মভমেন্ট শিল্পের অগাধ মাধ্যমগুলিকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। বৃত্তান্তের মত এক অসাধারণ ক্ষমতাবান চিত্র-পরিচালকের আবির্ভাব হয়, যার প্রথমদিককার চলচ্চিত্রগুলিতে সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকরগোষ্ঠীর কাছে তাঁর ঋণ অশেষ। জ্যারমেন হালক, জেন এপিষ্টেন প্রভৃতি তদানীন্তন চিত্রপরিচালক নির্মিত 'এতোলি দ্য'ম্যার', 'দ্য সি সেল এণ্ড দ্য ক্লাগি ম্যান,' 'দ্য ফল্ অফ্ দ্য হাউস অফ্ উনার' ছবিগুলিতে প্রেম, খুন, ব্যর্থতা, বিষাদ, পাপবোধ ইত্যাদিকে বিষয় হিসেবে নিলেও বিষয়াতিরিক্তভাবে যা আছে তা সুররিয়ালিজম-এর অচ্ছেদ্য প্রভাব। শোনা যায়, প্রাচীন গ্রীস দেশের চিত্রকরদের বাস্তবকে হুবহু অনুকরণ করার দক্ষতা এমন বিচ্যুতিহীন উৎকর্ষে পৌঁছেছিল যে তাদের ঝাঁক ফুল, ফলের দিকে ছুটে আসতো পাখি। কিন্তু আজকের কোন শিল্পী-চিত্রকরের কাছে শুধুমাত্র এই দক্ষতা কাম্য নয়। গত কয়েক দশকে পৃথিবীব্যাপী চিত্রকলার যুগান্তকারী পরিবর্তনে দেখা যায় বিমূর্ত্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে গতির প্রতি ঝোঁক। চলচ্চিত্রের সমতল পর্দার মতই চিত্রকলার ফ্রেম (ব্যতিক্রমও আছে), এরা ত্রিমাত্রিক হয়ে ওঠে শিল্পী এবং চিত্রপরিচালকের ঘটনা থেকে সজ্ঞাত অভিজ্ঞতার আরকে তৈরী ধারণার শিল্পময় প্রক্ষেপনে। না হলে হুই-ই স্থির থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। আজকের চিত্রকর তার সৃষ্টিকে গতিময় করে তোলার জন্য চলচ্চিত্র থেকে গ্রহণ করতে পারেন বেগ, ও একজন চলচ্চিত্রকার একটি দৃশ্যের কৌণিক অবস্থান, দৃশ্যের অগ্রভূমি ও পশ্চাৎভূমি, ফ্রেম, আলো ও ছায়ার সংস্থাপন, বিষয়বস্তুর সঙ্কেতসম্পর্কযুক্ত রং-এর ব্যবহার এবং পরিশেষে দৃষ্টান্তবিরুদ্ধ বোধের জন্য ঋণী থেকে মুক্ত হতে পারেন চিত্রকলার কাছে।

শতভিষা

প্রাচীন পৃথিবীর নবীনতম এই শিল্প-মাধ্যমটির অপ্রতিরোধ্য এক আকর্ষণ আছে। কিন্তু এই মাধ্যমের ব্যবহারকারীর দায়িত্বও অনেক। কেননা এ এমন এক মাধ্যম যা বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে একসঙ্গে পৌঁছয় এবং প্ররোচিত করে। হয়তো একদিন আসবে, কবি তার লেখার পেনের ছুঁচলো নিব আঙুলে সম্পূর্ণ বিধিয়ে দেবেন শেষ পর্যন্ত, চিত্রকর আয়ুল চুকিয়ে দেবেন তুলির কাঠাংশের পশ্চাৎভাগ তাঁর গোথে, স্বর ভুলে পাগলের মত ছোট্টাছুটি করবেন সংগীতকার, এবং এই প্রাচীন পৃথিবীতে অনেক কিছু আরো অনেক, অনেক প্রাচীন হয়ে আসবে; কে জানে, হয়তো আমরা তখনো শুনতে পাবো এক কির-কির কির-কির শব্দ, দেখবো একটি মূর্তি ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মানুষ, যার অনেক কিছু তখনো বাকি তুলে রাখার, দেখবো এই দৃশ্য, যদি না কোন রাজনীতির ভূত সেই মানুষের চাত থেকে কেড়ে নেয় ক্যামেরা। কেননা চলচ্চিত্র একই সঙ্গে বেশী দেখে, বেশী দেখায় অনেককে।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সৌন্দর্যতত্ত্ব ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা

সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় 'ভালো লাগা' ব্যাপারটা এতই অতর্কিত এবং আপেক্ষিক যে তাকে নিয়ে কোন ব্যাপক বিচার চলে না। সৌন্দর্যের কোনো অধিষ্ঠাত্রী দেবী আদৌ আছেন কিনা জানিনা। থাকলেও তাঁর মূর্তি যে অস্পষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। কখনো প্রকৃতিতে কখনো শিল্পশৈলীতে, কখনো ব্যক্তিগত রুচি কখনো নৈর্ব্যক্তিক ব্রতচর্চার মধ্যে তিনি যে অচির আভাস ক্ষণে ক্ষণে আমাদের দিয়ে থাকেন, অনেক সময় মনে হয় তাকে অভিজ্ঞতার মুহূর্তটি থেকে বার করে এনে তত্ত্বকথার ভাঁজে পুরতে গেলে তাঁকে আর চেনবার উপায় থাকে না, অবয়বটাই যায় বদলে। অথচ এই ক্ষণিকতাই বোধহয় রসিকজনকে লুকু করে সেই অথবা মুহূর্তগুলিকে একটি তত্ত্বের নিগড়ে ধ'রে রাখতে। অজস্র বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এই কেন্দ্রগত বাসনাটুকুই বোধহয় শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্যব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্য ভিত্তি, একথা মনে হ'তে পারে।

সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে এ কথাটি বিশেষ ক'রে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। অনেক সময়েই মনে হ'তে পারে প্রতিটি সাহিত্যকৃতি তার সম্যক বিশিষ্টতা নিয়ে একক একটি বিশ্ব — কোনো সাধারণ তত্ত্ব থেকে স্তর করলেই বোধহয় তার মর্ম পৌঁছোনো যাবে না। এমন কি আমাদের রসতত্ত্বও তার সমস্ত অভিনবত্ব নিয়ে এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট সহায় নয়। নবরসের শ্রেণীবিভাগ খুবই চমকপ্রদ বোধ-শক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নেই। একটি শ্লোক বা চরণে তার উপস্থিতি খুবই স্পষ্ট এবং সার্থক হতে পারে, কিন্তু কোন্ রসের ফর্মুলায় একটি গোটা কবিতা বা উপন্যাসকে আমরা ধরতে পারি? বীভৎস ও শৃঙ্খলারসের মিশ্রণে অমুক আধুনিক উপন্যাস রচিত বললেই কি উপন্যাসটিকে আমাদের বোঝা হ'য়ে গেল?

অথচ তাই বলে কোন সাহিত্যকর্মের বিশিষ্টতা এমনও নয় যে কারো সঙ্গে কারো কোনো সম্পর্ক নেই। তা যদি হ'ত তবে কবিতা উপন্যাস ট্র্যাজেডি কমেডি প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগেরও কোনো মানে থাকত না। 'বিষবৃক্ষের'

লক্ষে ‘চোখের বালি’ বা ‘গৃহদাহের’ কথা সহজেই আমাদের মনে আসত না। তাদের বিশিষ্টতার মধ্যেও কতকগুলি সাধারণ অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ লক্ষণ নিশ্চয় ঠাহর করা যায়। কিন্তু এমন কোনো তাত্ত্বিক কষ্টিপাথর আছে কি যা দিয়ে লক্ষণগুলি আমরা অনায়াসে মেপেজুকে নিতে পারি ?

সৌন্দর্যত্বের অন্ততম মৌল সমস্যা এই বিশেষ এবং নিবিশেষের দ্বন্দ্বই। অন্তান্ত শিল্পের চেয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ সমস্যা দুরূহতর, কারণ রংবেথাস্বরের তুলনায় শব্দের তাৎপর্য আরো বেশি পরিবর্তমান। সাহিত্যরসিক কোনো নতুন কবিতা শুনে যখন ব’লে উঠবেন ‘হ্যাঁ, এ কবিতা হয়েছে’, আর পদার্থ-বিজ্ঞানী যখন নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শুনে বলবেন ‘এ তো কবিতা হয়েছে’—তখন এ দুই ক্ষেত্রে ‘কবিতা’ শব্দের সংজ্ঞা নিশ্চয় এক থাকবে না। অথচ সাহিত্যের বেলায় তার অর্থ থেকে শব্দকে আলাদা ক’রে দেখবারও কোনো উপায় নেই, হাসিমুখ থেকে হাসিটুকুকে আলাদা ক’রে নেবার যেমন উপায় নেই—লুইস্ ক্যারলের রূপকথার সেই বিড়ালের মতো। সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে অর্থ এবং অবয়ব অভিন্ন ও অঙ্গাঙ্গী। কোনো স্বরের বেলায় তার শব্দ থেকে অর্থকে আলাদা ক’রে বিচার করতে পারি না, কোনো ছাঁবর বেলায় তার রং থেকে তার অর্থকে আলাদা ক’রে নিতে পারি না। তাদের অর্থকে বুঝতে হ’লে ঐ রং বা শব্দই আমাদের সম্বল। বলা যেতে পারে ঐ রং বা শব্দই তাদের অর্থ। ঐ রঙের বা শব্দের বিশিষ্টতাতেই তাদের অর্থের বিশিষ্টতা। এবং এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক এতই সূক্ষ্ম যে সামান্যতম পরিবর্তনেও তাদের অর্থের ব্যত্যয় ঘটে যায় : ‘মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে’ আর ‘সুন্দর ভুবনে আমি চাহিনা মরিতে’ ঠিক এক তাৎপর্য বহন করে না।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রতিটি শিল্পকর্মের একধরণের অস্তিত্ববাদী ভূমিকা আছে, যেখানে তাদের অস্তিত্বের মৌলতা তাদের সারার্থ বা ‘এসেন্স’-এর তুলনায় অগ্র-গণ্য। নৃত্বে যেমন মাহুয সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বকে ধরা যায় না, তেমনি সৌন্দর্যত্বে হয়তো আমরা অনেক সাধারণ কথা বলতে পারি, কিন্তু কোনো একটি সুন্দর বস্তুকে তার মর্মগত বৈশিষ্ট্যসমেত কতখানি ধরতে পারি ? কৈশোরের প্রত্যয়রশে রবীন্দ্রনাথ অতি সূঠাম ক’রে আমাদের বলেছিলেন : “সৌন্দর্য উত্তরক করার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের

শতভিষা

অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতা ক্ষেত্র প্রদারিত করিয়া দেওয়া” (‘আলোচনা’ : ‘কবির কাজ’)। কিন্তু এতে শেষ পর্যন্ত কতটুকু বলা হ’ল? কোনো বিশেষ একটি শ্লোক আমাদের অসাড়তা দূর ক’রে হৃদয়ের স্বাধীনতা অব্যাহত ক’রে দেয়, সেটা বুঝতে পারলাম কই? ‘পাখী সব করে রব’ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের চেয়ে ‘ও পারেতে কালো রং’ আমাদের চিত্তকে কেন এবং কতখানি মুক্ত ক’রে দেয় তার রহস্যটুকু গোপনেই র’য়ে গেল নাকি? এই ধরনেই কথা ভেবেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে সুধীন্দ্রনাথের প্রতি লিখেছিলেন : ‘যে কারণেই হোক রূপসৌর reality আমার কাছে অনির্বচনীয়—আমি যে একটি ব্যক্তি সেই ব্যক্তির reality ওজনেই তার যাচাই। অর্থাৎ আমি নিজে যেমন বিনা বিশ্লেষণে বিনা তর্কে নিজের বাস্তবতা একান্ত উপলব্ধি করচি তাকেও তেমনিই করি’ (২৭ আষাঢ় ১৩৩৫)।

এই বিশিষ্টতাবোধই আমাদের সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনার পথে অনেক সময় অন্তরায় হ’য়ে দাঁড়ায়। কারণ যা বিশিষ্ট তার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। প্রতিটি শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতা যদি এতই অনন্য হয় তাহলে তার সম্বন্ধে কোনো সাধারণীকরণ কী ক’রে সম্ভব? এমন কি তার কোনো বর্ণনাই বোধহয় অসম্ভব, যেহেতু বর্ণনা করতে হ’লে শ্রেণীবাচক ও সাধারণগুণবাচক শব্দ ব্যবহার করা ছাড়া আমাদের গতি নেই।

অথচ সাহিত্যালোচকদের কাজই হচ্ছে বিশ্লেষণ এবং বিচার, শুধু একান্তে উপলব্ধি ক’রে তাঁরা ক্ষান্ত হন না। তাঁরা শ্রেণীবিচ্ছাদ করেন, তুলনা করেন, মূল্যনির্ণয় করেন। যদি প্রতিটি শিল্পানুভূতি অবর্ণনীয়ভাবে বিশিষ্টই হয়, তাহলে এই তুল্যমূল্যতা আদৌ সম্ভব হয় কী প্রকারে? কী ক’রে বলতে পারি বক্রিমচন্দ্রের চেয়ে শরৎচন্দ্রের চরিত্রায়ণ আরো বাস্তবায়ুগ, বা এমনি কিছু? এ-সম্পর্কে কোনো যুক্তিসহ প্রস্তাব সম্ভব হয় কী ভাবে?

এখন পালটা প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রতিটি শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট কিনা এ তর্কের নিরসনই বা হবে কী ক’রে? ‘জিবাক ডাকে কিনা’—এ প্রশ্নের জবাব পেতে হ’লে আমাদের অস্ত্র আছে—পর্ষবেক্ষণ। বনে জঙ্গলে চিড়িয়াখানায় ঘুরে, লক্ষ্য ক’রে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর একসময় পেতে পারি। কিন্তু সাহিত্যকৃতিমাঝেই অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনন্য কিনা, এ প্রশ্ন তো তার

অস্তিত্বের মৌল প্রশ্ন, এর উত্তর তো কোনো পর্যবেক্ষণে ধরা দেবে না। ক্রোচে-র মতো দার্শনিক হয়তো বলবেন এর উত্তর পাব আমরা ইন্টুইশন (স্বজ্ঞা)-এর মাধ্যমে, পর্যবেক্ষণে নয়। কিন্তু আমরাও তো উলটে বলতে পারি, এই বিশিষ্টতাও একধরনের শ্রেণীবিভাগ। সাহিত্যশিল্পের অভিজ্ঞতাকে যারা অতি অনায়াসে ‘বিশিষ্টতার’ বা ‘অনন্ততার’ শ্রেণীতে পুরে ফেলতে বিরুক্তি করেন না, আনন্দবর্ধন কি তাঁদেরই উপহাস ক’রে বলেননি, যে যারা কাব্যের আত্মাকে অনির্বচনীয় বলেন তাঁরাও মানবেন যে অন্ততঃ ‘অনির্বচনীয়’ শব্দের দ্বারা তা বর্ণনীয়। কালিদাসও কি তাঁর নাটকে লেখেননি, ‘রম্যাবি বাক্য, মধুরাশ্চ নিশম্য শব্দান্’ আমাদের স্মৃতিপথে অল্প কিছু তুল্য অভিজ্ঞতা এসে হানা দেয় ?

আসলে সচেতন অভিজ্ঞতামাত্রেরই বোধহয় অল্পবিস্তর তুলনাত্মক। দার্শনিকরা যাকে ‘ক্যাটিগরি’ বলেন, যে কোনো অভিজ্ঞতার মধ্যেই তার কোনো না কোনো আদল নিহিত থাকে। ‘অনন্ততার’ আদল অনুযায়ী দৃষ্টিপাত করলে সব কিছুই অনন্ত মনে হ’তে পারে। কিন্তু অল্প আদলের সাহায্যে দেখাও সম্ভব। কোন আদল ব্যবহার করতে পারব তা নির্ভর করছে সাহিত্য-ব্যাপারে আমাদের কী ধরনের অন্তর্দৃষ্টি জন্মেছে তার ওপরে। সেই অনুযায়ী তত্ত্ব এবং ভাষা আমাদের প্রয়োগ পদ্ধতির অঙ্গ হবে। তাই স্বদেশীবিদ্বেষী সৌন্দর্যবিচারের এত রকম তত্ত্ব—ধ্বনি, রস, আবেগ, আনন্দ, সামাজিক উপযোগিতা প্রভৃতি মাপকাঠি সৃষ্টির প্রয়াস। যন্ত্র, জীব, ব্যক্তি সবকিছুকেই সাহিত্যসৃষ্টি বিচারের মডেল করা যায়। যাদের অন্তর্দৃষ্টি শিল্পকর্মকে একটি নিগূঢ় আন্তরসম্পর্ক বিশিষ্ট অথগুণগুলিরূপে দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা তাকে অনন্য তো বলবেনই। কেউ যদি তর্ক তোলেন যে বিচারে, আলোচনায় বা অনুবাদে তার সমস্ত জটিল সম্পর্ক সমেত না হোক কিছু পরিমাণে তার প্রকৃতিটিকে ধরা যায়, ওঁরা মানবেন না, কারণ তাঁদের মতে এই নিগূঢ় জটিলতাই তার আন্তর-ধর্ম, একটু উপাদান হারালেই সে বিকলাঙ্গ হ’য়ে যায়। সাহিত্য সমালোচকেরা অবশ্য হাতে কলমে এ ধারণাকে অমান্য ক’রেই চলেছেন—তাঁরা একটি সৃষ্টির সঙ্গে অপরটির তুলনা ক’রে, বিচারে তাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ ঘোষণা ক’রে অনবরতই প্রমাণ ক’রে দিচ্ছেন, যে তাঁরা বিশিষ্টাশ্রিতবাদী নন।

যশোধরা বাগচী

সমাজচেতনা কি সাহিত্যবোধের পরিপন্থী

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে সমাজ এবং সাহিত্যচেতনা নিয়ে যেসব নানাবিধ ছোট-ছোট আলোচনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি, প্রধানত: তারই তাগিদে এই লেখা লিখতে বসি। যেসব প্রশ্ন ক্লাসের মধ্যে সাহিত্য অধ্যাপনার কৃত্রিমতাকে দূর করতে ক্রমাগতই সাহায্য করে সেই সব প্রশ্নের উপস্থাপনা করবার একটি নগ্ন চেষ্টা এই লেখাতে প্রকাশ পাবে। সাহিত্য-গঠন অনেকাংশে এক যৌথ প্রচেষ্টা। সাহিত্যশিল্পী যেমন বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের এক নিগূঢ় এবং বিশেষ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ক'রে থাকেন পাঠক ও সমালোচকও কিন্তু তেমনি করেই বাইরের সঙ্গে ভেতরের সম্পর্ক-স্থাপনে ইচ্ছুক। ক্লাসে সাহিত্য-অধ্যাপনার মধ্যে দিয়ে এই বিশেষ অভিজ্ঞতা আমার কাছে ক্রমশ: স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তাই এই আলোচনার অনির্ধারিত গণ্ডী টানছি এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীসাহিত্য অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার মধ্যে। এই বিষয়বস্তুর গুরুত্ব যে এই ছোট চৌহদ্দির বাইরে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হয়ে কিন্তু আমি খোলাখুলিভাবে নিজের গণ্ডী নিয়ে টেনে নিচ্ছি। আমার মনে হয় এইভাবে গণ্ডী টানলে প্রধানত: দু'ধরনের স্ববিধা হবে। অনর্থক তাত্ত্বিকতার কচ্‌কচির মধ্যে না ঢুকে নিজের অভিজ্ঞতা-প্রসূত চেনা ভাষা ব্যবহার করার স্বাচ্ছন্দ্য এবং বড়ো-সত্যকে ছোট পরিধির মধ্যে প্রতিফলিত করে তাকে অনেক সহজবোধ্য করে তোলা। তবে এই প্রবন্ধটি এক দীর্ঘতর আলোচনার সূত্রপাত মাত্র—সে দীর্ঘতর আলোচনার মধ্যে চেনা কিন্তু উত্তর প্রত্যুত্তর ও বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

পাদটীকার অল্পপস্থিতিতে হয়ত বহু পাঠক ক্ষণ হবেন কিন্তু স্বল্পপনিসর এই ব্যাখ্যার গতি অব্যাহত রাখবার জন্য পাদটীকা বর্জন করলাম। এর কোনও অংশ সম্পর্কে কোনও পাঠকের উৎস্রুত থাকলে অবশ্যই আমি সাধ্যমতো স্বপ্ন স্বীকারের চেষ্টা করবো।

শতভিষা

এক

সমাজচেতনা কি সাহিত্যবোধের পরিপন্থী ? অর্থাৎ সমাজভিত্তিক এ কথা বললে পরে কি সাহিত্যের সাহিত্যিকতাকে খর্ব করা হয় ? এরকম শঙ্কাবোধ বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যায়। ব্যক্তির এককসত্তা সমাজের সামগ্রিক সত্তার মধ্যে পড়লে নিষ্পিষ্ট হয়ে যেতে পারে এরকম একটা ভয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে কাজ ক’রে আসছে, এই শঙ্কাবোধ কি শুধু তারই এক ছোট সংস্করণ ? শুধু যদি তাই হতো তাহলে হয়তো এই কাণ্ডজে বাঘকে সহজেই খতম ক’রে দেওয়া যেতো। সাহিত্যশিল্প এবং সমাজবোধকে মেলানোর কাজে প্রধান বাধা হলো এই যে শিল্পে বাস্তবের চেহারা প্যালটানোর চেষ্টাই বেশি প্রকট। বাস্তব থেকে ছুটি নেওয়ার জায়গা হচ্ছে নাটক-নভেল-কবিতা-গান। সাহিত্যশিল্পের এই বিশেষ ক্ষমতাটুকু কেড়ে নিলে তার আর থাকে কি ?

সাহিত্য কিন্তু নিজেই তার এই ক্ষুদ্র ভূমিকা মেনে নিতে রাজি নয়। চেনা সমাজগুলির গোড়াতে যেসব মহাকাব্য দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা সত্যের বাহক এবং সভ্যতার ধারকরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই প্লেটো কবিদের বিপক্ষে যে অভিযোগ আনেন তার দার্শনিক ভিত্তি ছাড়াও এক সামাজিক প্রসঙ্গ রয়েছে। প্লেটো বলছেন যে কবিরা এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি ক’রে থাকেন যে তাঁরা বোধশক্তির পরিচালক। প্লেটো ‘অহু করণ তত্ত্ব’ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে কাব্য হচ্ছে বজ্রজগতের ছায়া। উপরন্তু কাব্যপদ্ধতি যুক্তির পরিপন্থী। কোনো বাইরের শক্তি ভর না করলে কবি কাব্যসৃষ্টি করতে পারেন না। অতএব প্লেটো-বর্ণিত আদর্শ সমাজে কবির স্থান নেই। প্লেটোর সমাজে কবির সামাজিক প্রতিপত্তি কতোখনি ছিলো সেটা প্লেটোর এই দার্শনিক ব্যাখ্যা থেকে খানিকটা আঁচ করতে পারা যায়। প্লেটোশিষ্য অ্যারিস্টটল্‌কে তাই কবিকে আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কবিতা বাস্তবকেই অন্তর্করণ করে কিন্তু সেই অন্তর্করণ প্রণালী এমন বিশেষ-ধরনের যে তার মধ্য দিয়ে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে। ইতিহাস শুধু দেখতে পারে বাস্তবে কী ঘটেছে বা ঘটেছিলো। কাব্য দেখাতে পারে বাস্তবে কী ঘটতে পারতো অথবা কী ঘটী উচিত ছিলো। অ্যারিস্টটলের মতে এই সম্ভাব্যতা এবং ঔচিত্যবোধ

শতভিষা

কাব্য-ইতিহাসের তুলনায় অনেক বেশি দার্শনিক তাৎপর্য এনে দেয়। অর্থাৎ মানুষের বোধশক্তি চালনা করবার যে ক্ষমতা প্রেটো কবিদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দার্শনিকের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন অ্যারিস্টটল্, আবার সেই ক্ষমতা কবির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তাকে দার্শনিকের সমগোত্রীয় ক'রে তুললেন।

এই বহু আলোচিত পুরোনো প্রসঙ্গ আবার উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই কথাটি বারবারে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রশ্নটি প্রথম থেকেই বাস্তবতার মূল্যায়নের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসম্বন্ধে বাঁধা। মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রহ বাস্তব জীবনকে ব্যবহার করে সাহিত্য এবং তাকে বাস্তবের রূপায়ণই বলা যাক বা রূপান্তরই বলা যাক সাহিত্যের রূপবিচারের প্রশ্নের মধ্যে নিহিত থাকে বাস্তবের সঙ্গে তার নিগূঢ় সম্পর্কের প্রশ্নটি।

আমল সমস্যাটি বরঞ্চ একটু অগুরুকমের। মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজে বাস ক'রেই সে বাস্তবতার অভিজ্ঞতাকে খুঁজে পায়। সুতরাং সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সমাজবদ্ধ বাস্তবতা থেকে আলাদা ক'রে ফেলবার প্রশ্নটি উঠছে কোথা থেকে ?

সাহিত্যে প্রতিফলিত বাস্তবতা এবং সাদা চোখে দেখা বাস্তবতা যে এক নয় সেটা সকলেই জানেন। যে কোনও সমালোচনা-তত্ত্বের আলোচনা শুরু হয় এই ব্যবধানের অভিজ্ঞতা থেকে, সে তত্ত্ব সমাজভিত্তিকই হোক বা সমাজবিচ্ছিন্নই হোক। এই পৃথকীকরণের জগৎ নানাধরনের নন্দনতত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। সংস্কৃত রসশাস্ত্র থেকে ইউরোপের প্রেটোখমী এবং পরে রোমান্টিক কাব্যাদর্শের বিভিন্ন রূপের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। আমাদের চেনাজানা জগতে সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সৌন্দর্যচর্চার একীকরণ খুবই প্রচলিত। সাহিত্য তথা শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ বিলাদী সৌখীনতার আমেজ আনে। এই কারণে অনেক সময়ে বিদেশী সাহিত্যচর্চার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় একধরনের পরভূত 'নববাবুবিলাস'। আমাদের শিক্ষিত সমাজে ইংরেজি সাহিত্যচর্চা তথা ইউরোপীয় সংস্কৃতিচর্চা অনেকাংশে মৃষ্টিময় কিছু লোকের অবসরবিনোদনের উপায়মাত্র। গত শতাব্দীর শেষের দিকে ইংল্যান্ডে সাহিত্যচর্চার নামে এক সামাজিক আভিজাত্যের গোড়াপত্তন হয়েছিলো যার একটি উপসর্গ ছিলো 'rambles among masterpieces' ইউরোপীয় শিল্পকলার উৎকৃষ্টতম নিদর্শনের

মধ্যে বিচরণ করেই সে সংস্কৃতিবোধ পুষ্টিলাভ করতো। এই-জাতীয় আত্মকেন্দ্রিক ইন্দ্রিয়সর্বস্বতাকে মদৎ জোগায় সামাজিক আভিজাত্যের আত্মপ্রসাদ।

এই সৌখীন শিল্পচর্চার রসান্বাদনের মুহূর্তগুলি স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়ন থেকে অবস্থত। এই শূন্যগর্ভ নৌদর্শবোধ সাহিত্যশিল্পকে সমাজ থেকে দূরে থামিয়ে রাখবার চেষ্টায় তেমন সুরক্ষা করতে পারে না, কারণ তার জন্ম দরকার সামগ্রিক দর্শনের। যে দর্শনের সাহায্যে সাহিত্যকে সামাজিক চেতনার উর্ধ্বতুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা হচ্ছে অতিপ্রাকৃতবাদ। সে চিন্তাধারা সাহিত্যচেতনা খুঁজতে ছোটো জীবনোত্তর কোনো অসীম রাজ্যের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ এর সারগর্ভ বর্ণনা দিয়েছেন দুটো পঙ্ক্তিতে

কুলহারা কোন রসের সরোবরে

মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে

দুই পঙ্ক্তির প্রথম দুটি কথার অন্তর্মিলের মধ্যে ধরা পড়েছে বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্বের দুটি মৌলিক বিশ্বাস। মাহুষের জীবনের পরিধি এবং গভীরতা উভয়ই সীমিত, এই সীমাকে অতিক্রম করাই হলো নন্দনতত্ত্বের প্রধান কাজ, সীমাহীন বিস্তৃতি এবং গভীরতা তাই সাহিত্যের রূপায়ণের প্রধানতম অঙ্গ। সমাজচেতনা যেহেতু ব্যক্তিসত্তাকে তার ইতিহাসজনিত সীমার মধ্যে সঞ্চিত করে সেই কারণে সাহিত্যবোধের সঙ্গে তার বিরোধ। এই ধারণা অমুযায়ী সাহিত্যশিল্পে 'জীবন নদী কূল ছাপিয়ে' 'অসীম দেশে' ছড়িয়ে যায়। সমাজভিত্তিক কাব্যসমালোচনায় অসীমের যাদুছোয়া নেই, অতএব তাঁরা সাহিত্যকে দেখেন নিজীব এক সামাজিক দলিল হিসেবে। অতিপ্রাকৃতের মৃতসঞ্জীবনোন্মুখ্যতাই একমাত্র সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় এবং সে প্রাণের স্পন্দন অবশ্যই সমাজ থেকে না এসে আসে সমাজোত্তর এক ঐশী জগৎ থেকে।

উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যপুষ্টি আমাদের সাহিত্যশিক্ষণ বহুলাংশে এই অতিপ্রাকৃতবাদের কুসংগত। অতীন্দ্রিয় জগতে দেশ কাল সমাজভেদ থাকে না সুতরাং সাহিত্যকে তার সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের ছকে ফেলাটা গহিত কাজ বলে মনে করা হয়। সাহিত্যের সাহিত্যিকতা বলে যে জিনিস ফলাও করে সাহিত্যশিক্ষার মূলমন্ত্ররূপে গণ্য করা হয় একটু তলিয়ে দেখলেই তার অন্তর্লীন ভাবাদর্শটি চোখে পড়ে। এই ভাবাদর্শ কিন্তু প্রায়শই বিযুক্ত এবং পরম ব্রহ্মের

মতো অবাঙমনসোগোচর। অতএব সাহিত্যশিক্ষণকে যদি মনঃদেওয়ার চাইতে বেশি ইচ্ছিয়গোচর কোনও মূর্তি দিতে হয় তাহলে এই ভাবাধর্শের স্বরূপ জানা দরকার। সেই জানার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো তাকে তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ফেলে বিচার করা। সামাজিক বিবর্তনের যে বিশেষ চাপে রক্তমাংসে গড়া কবি অতিমানবিক রূপ নেবার চেষ্টা করেন কাব্যরূপের মধ্যে সে রূপের নিজস্ব স্বাক্ষর থাকে। কাব্যরূপ এবং সমাজের রূপ একই সঙ্গে নির্ধারণ করার কাজ চলতে থাকলে তবেই সে কাব্য এবং সে সমাজের চেহারা বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে থাকে। তার মানে এই নয় যে, যে কাব্যে সামাজিক ঘটনার অবিকল প্রতিলিপি পাওয়া যায় সেই কাব্য উৎকৃষ্ট। সামাজিক বিবর্তন ও কাব্যরূপের মধ্যে সম্পর্ক আরও অনেক সূক্ষ্ম এবং চমৎকার।

ইংরেজ সাহিত্যের যে দুই যুগ নিয়ে এখানে সাহিত্যশিক্ষণের কাজ প্রধানতঃ এগোয় তা হলো শেক্সপিয়ারিয় যুগ ও উনিশ শতকের রোমান্টিক যুগ। এর মধ্যে দ্বিতীয় যুগটির কাব্যাদর্শের সমাজ-বিমুখতা প্রচ্ছন্ন অতএব এই যুগের সাহিত্যে সামাজিক সাপেক্ষাতি ব্যবহার করার নিজস্ব ধরনের সমস্যা আছে। বিশেষ করে এই কারণে উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্য এবং সাহিত্য-সম্পর্কিত ধ্যানধারণার কিছু কিছু অংশ বিশ্লেষণ করে আমি আমার উপরি-উক্ত আলোচনাকে চিহ্নিত করবো। সেই বিশ্লেষণ আমাকে করতে হবে গঙ্গাফড়িঙের কায়দায়, কেননা সমগ্র আলোচনার জন্ত যে পরিসর বা অবসর প্রয়োজন তার কোনোটিই এখানে নেই। তবে ছিটোনো হলেও এই বিশ্লেষণের পেছনে একটি পূর্ণতর চিন্তাধারা প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

আমার উদাহরণগুলি দেওয়ার আগে আরও দু-একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমী সাহিত্যে পুষ্ট আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার একটি প্রধান আশ্রয়স্তম্ভ হলো সাহিত্যের স্বনির্ভরতা। পশ্চিম ইউরোপের রোমান্টিক কাব্যচিন্তা একদিকে সাহিত্য বা শিল্পকলা এবং অপরদিকে সমাজের মধ্যে যে গভীর বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে তার ফলে নৈঃসঙ্গ শিল্পীজীবনের প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্কার ওয়াইল্ড যখন বলেছিলেন জীবন শিল্প-কলার অহুগামী (life imitates art) তখন তিনি রোমান্টিক উত্তর-যুগে শিল্পকলা যে অসীম ক্ষমতা হাতে পেয়েছে সমাজের ধারণাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত

শতভিষা

করতে সেই ক্ষমতারই ইঙ্গিত করেছিলেন। শিল্পজগৎ যে শুধু সামাজিক জগৎ থেকে আহরণ করে তা নয়, বাস্তবজীবনের যে বিশেষরূপ সমাজজীবনে প্রতিফলিত হতে থাকে সেটি তৈরি হয় শিল্পসাহিত্যের মাধ্যমে। সাহিত্য বা শিল্পকলা সেই কারণে সমাজতাত্ত্বিকের আওতার মধ্যে পড়ে।

পশ্চিমী সাহিত্যে ও তার প্রভাবে শিল্পীর নৈঃসঙ্গবোধ আমাদের আধুনিক সাহিত্য ও সমাজচিন্তায় অনুপ্রবিষ্ট। শিল্পী নিঃসঙ্গ অতএব সমালোচনা-সাহিত্যে গোষ্ঠীগত সমাজের স্বীকৃতি অসম্ভব। আধুনিক সমালোচক তাই শিল্পের এককতার উপাসক। বহু মতো একীকরণ শিল্পসাহিত্যের এক সংজ্ঞা, এইজন্ত শিল্পবোধ আপুনিক মননজগতে আত্মোপলব্ধির চরম নির্দেশকরূপে স্বীকৃত। এই চিন্তাধারা অনুযায়ী সাহিত্যশিল্পোপলব্ধির অভিজ্ঞতায় সাহিত্যিক এবং পাঠকের নিজস্বতার এক সমীকরণ ঘটে। এই সমীকরণটুকুই সাহিত্য-পাঠের অননুकरणीয় বৈশিষ্ট্য মনে করে অনুরূপভাবেই সাহিত্যের মূল্যায়ন হয়। সাহিত্য কথ্যটির শব্দগত অর্থ দুই ব্যক্তিসত্তার মিথুনে পর্যবসিত হয়।

সাহিত্যের এই নির্বিড় মাযুজ্যকে মেনে নিয়েও কবিতাকে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ রূপ দেবার এক অদ্বুত চেষ্টা দেখা গেছে সাম্প্রতিককালের নয়া সমালোচনা-রীতিতে (New Criticism)। সবার উপরে কবিতা সত্য তাহার উপরে নাই, অতএব এই সত্যে উব্বন্ধ হয়ে কবিতাকে তার সমাজ তো বটেই তার স্রষ্টার পরিচয়গ্রন্থী থেকে পর্যন্ত কেটে বাদ দিয়ে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে দেখানোর সাধনা করা হচ্ছে। এই জাতীয় কাব্যাদর্শ না থাকলে কবিতার পরিপূর্ণরূপ দেখানো যায় না বলে অনেকেই মনে করেন।

সমাজবর্জিত পরিপূর্ণ কবিতার দুই বাহন, অতীন্দ্রিয়তাবাদ এবং শৈলীসর্বস্বতা উভয়েই ব্যক্তিসত্তার একাকিস্থের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আধুনিক সংস্কৃতির যে চরম ব্যক্তিনির্ভরতার ফলে আমাদের মতো সমাজেও এই স্বয়ম্ভু সাহিত্যের প্রাচুর্য ঘটেছে তার পরিচয় খুঁজতে ইংল্যান্ডের উনিশ শতকের ছোটো সাহিত্যজগতে ছোটো নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক নয়। সেকালের শিক্ষা-ব্যবস্থার ফল আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সপ্রদায়ের সংস্কৃতি—ইংল্যান্ডের সংস্কৃতির সঙ্গে তার নাড়ির যোগ ইতিহাসে স্বীকৃত। তার ওপরে বহু পণ্ডিত এবং চিন্তাবিদেব যৌথ প্রচেষ্টায় ফলে ইংল্যান্ডের সমাজ ও সাহিত্যজীবনের ইতিহাসের অনেকখানিই

শতভিষা

আজ আমাদের অধিগত। অতএব ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ছকে ফেলে উনিশ শতকের রোম্যান্টিক সাহিত্যসর্বস্বতার স্বরূপটি বোঝাবার চেষ্টা করবো।

দুই

ইংল্যান্ডের সাহিত্যজীবনে যে সময়ে ব্যক্তিচেতনার সবচেয়ে প্রকট রূপ দেখা দিলো, ঠিক সেই সময়ে তার সামাজিক জীবনে চলছে পুরোনো সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলে নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের কর্মকাণ্ড। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরীজের রোম্যান্টিক কাব্যের সামাজিক পটভূমি হলো ফরাসী বিপ্লবের আঘাত, রিফর্ম বিলের আলোড়ন ও চার্চিষ্ট আন্দোলন। রিফর্ম বিলের দাবী ছিলো সমাজের ধনবন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনের রাজনৈতিক স্বীকৃতি। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে যে নতুন মালিকশ্রেণী তৈরী হলো তাদেরই দাবী ছিলো যে সমাজের শাসনব্যবস্থায় তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। ইংল্যান্ডের ক্রমবিবর্তনশীল পার্লামেন্টে এতদিন ধরে পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীবিভাগ প্রতিফলিত হতো সেখানে আঘাত করলো ধনতন্ত্রজনিত নতুন শ্রেণীবিভাগ। এরই সঙ্গে চলছিলো মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবোত্তর যুগের প্রেরণা। টম পেইন ও গুড্‌ইনের লেখায় ছিলো যুক্তিবাদী মানুষ্যের মুক্তির জয়গান।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে এর সঙ্গে রোম্যান্টিক সাহিত্যচিন্তার কতোটুকুই বা যোগ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে নৈসর্গীয় নন্দনলোকের দরজা খুলে দিয়ে কর্মক্লাস্ত মানুষ্যের বিশ্রামের জায়গা করে দিয়েছেন, যে নিসর্গের পটভূমিকায় কোলরীজ তাঁর নিসর্গাতীত ভগতের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধর্মবিশ্বাসকে সহজলভ্য করে তুলেছেন, যে নিসর্গে শেলীর আকাশচারী মন বিহঙ্গের মতো মুক্তি খুঁজছে বা কীটসের সৌন্দর্যপিপাসু মন যার দয়জায় বারে-বারে মাথা খুঁড়েছে সেই রাজ্যে প্রবেশ করতে সমাজচেতনার কোনও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন কেবল পাঠকের নিসর্গোন্মুখ তন্ময়তা।

কিন্তু আধুনিক যুগের সাহিত্যসর্বস্ব মনই তো সর্বপ্রথম এই নিসর্গোন্মুখতার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবে। ইংরেজী কবিতাসাহিত্যে এই বিশেষ-ধরনের নিসর্গ-প্রবণতার মেয়াদ অত্যন্ত অল্প কয়েক বছরের। ওয়ার্ডসওয়ার্থের আগের যুগে তো

শতভিষা

নিসর্গের রূপায়ণ ছিলো নিছক সাহিত্যিক ছকের খাতিরে। আবার ভিত্তোবীয় যুগ থেকে শুরু হয়ে গেছে নিসর্গবোধের মধ্যে মানুষের আত্মপ্রকাশন যন্ত্রণা। অতএব কবিতা মানেই ফুল, গাছ, আকাশ, চাঁদ, ছয়ঋতুর নৃত্য এই-জাতীয় রোম্যান্টিক নিসর্গময় কাব্যচেতনা বিশ শতকের বোঝা পাঠকের অবশ্যগ্রাহ্য নয়।

অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকের রোম্যান্টিক সাহিত্যচিন্তার ভেতরে অল্পপ্রবেশ না করে সে সাহিত্য পড়া বা সমালোচনা করা যাবে না, এরকম মত টেকানো যায় না। রোম্যান্টিক কবিতার মাধ্যমে সে সাহিত্যচিন্তার যে অবয়ব আমরা পাই তার রূপ-নির্ধারণে যে সব শক্তি কাজ করে তা খুঁটিয়ে দেখা অবশ্যই সাহিত্য-সমালোচকের কাজ। প্রধানতঃ যে ধরনের সমালোচনা আমরা ক্লাসিকময় ব্যবহারের যোগ্য মনে করে থাকি, তাতে নিসর্গ-সম্পর্কিত দার্শনিক মতামতের ইতিহাস দিচ্ছেই রোম্যান্টিক সাহিত্যের নিসর্গচিন্তাকে ব্যাখ্যা করা হয়। এর একটি ভালো উদাহরণ হলো অধ্যাপক ব্যানিল উইলির Eighteenth Century Background (অষ্টাদশ শতাব্দীর পটভূমিকা)। বইটিতে আঠারো শতকের দর্শনে নিসর্গ-বিষয়ক ধ্যানধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াডসওয়ার্থের নিসর্গচিন্তাকে বোঝানো হয়েছে। এই জাতীয় ‘History of Ideas’ চিন্তার ইতিহাসকে কবিতা বা অন্যান্য সাহিত্যের একমাত্র গ্রহণযোগ্য ইতিহাস মনে করা হয়।

কিন্তু এর মানে হচ্ছে যে কবিতাকে ভাবের (Ideas) সমগোষ্ঠীয় করে না দেখলে কবিতার জাত থাকে না। মুশকিলের কথা এই যে উপনিষদ-বর্ণিত পূর্ণতার মতো কবিতার ভাব তো নিজে থেকেই উদ্ভূত হতে পারে না। যদিও প্লেটো এবং বর্তমান যুগ পর্যন্ত তাঁর উত্তরন্থরিতা চেষ্টা করে যাচ্ছেন কবিতাকে ভাবের নিগড়ে বেঁধে ফেলতে, কিন্তু এটা বোধহয় যে কোনো মতাবলম্বী সাহিত্য-প্রেমিকই স্বীকার করবেন যে বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন করে আজ পর্যন্ত কোনো সাহিত্য বাঁচতে পারেনি। ভাবের ইতিহাসের পেছনে থাকে সমাজবিবর্তনের ইতিহাস—তাই প্লেটোর অতীন্দ্রিয়বাদে আশ্রয় নিলেও কোলরীজ বাকার্লাইলের প্লেটোবাদী দর্শনকে বুঝবার জন্য উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের ভ্রমসমাজের দিকেই তাকাতে হবে।

ওয়াডসওয়ার্থ কোলরীজের রোম্যান্টিক বিপ্লবকে শুধুমাত্র দর্শন বা ভাব-চিন্তার বিবর্তন হিসেবে উপস্থাপন করলে কবিতার তার রূপটিকে এক বিমূর্ত

ভাবজগতের চাবিকাঠির মতো ব্যবহার করা হয়। অপর দিকে 'নয়া সমালোচনা রীতি'র মুতিসর্বস্বতা আমাদের আটকে ফেলে প্রতিটি কবিতার নিজস্ব ছন্দ, শব্দবিন্যাস ও চিত্রকল্পের খাঁচার মধ্যে। অথচ এই কবিতাশৈলীর নিপুণতা এবং ইংল্যান্ডের কাব্যবিবর্তনের ইতিহাসে এই কাব্যরীতির অবদান বিচারে যে পথটি সূত্রে পরিহার করা হয় সেই পথটিই কিন্তু সব চাইতে প্রশস্ত। এই তিন দশকের রোম্যান্টিক কবিরা অভিজ্ঞতার চোখে দেখা পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক জগতকে যে ভাবাশ্রয়ী অপরিবর্তনীয় রূপ দেবার চেষ্টা করছেন তাকে মন্যক উপলব্ধি করতে হলে তাকানো দরকার উনিশ শতকের গোড়ার দিককার মধ্যবিন্ত সমাজের দিকে যাদের মধ্য থেকে তৈরী হচ্ছে এই কবিতার পাঠক সমাজ। আগেই বলেছি ফরাসী বিপ্লবের জোয়ার ঠেকানো এবং শিল্পবিপ্লবজনিত আমূল পরিবর্তনে সমাজের ধনবন্টনব্যবস্থাকে ঢেলে-সাজানোর যে ব্যাপক প্রয়াসের মধ্যে ইংল্যান্ডের মধ্যবিন্তশ্রেণীর এক নতুন উত্থান ঘটছিলো। রোম্যান্টিক কবিতা সেই বিরাট কর্মক্ষেত্রেই অঙ্গ। যেভাবে রোম্যান্টিক কবিতাকে সচরাচর উপস্থাপন করা হয়ে থাকে তাতে এই কাব্যাদর্শকে তদানীন্তন সমাজাদর্শ থেকে পৃথক করে দেখা হয়ে থাকে। শিল্পবিপ্লবের ফলভোগী যদি শিল্পের মালিকরা না হয়ে শ্রমিকরা হয়ে পড়তেন (চার্চিস্ট বিদ্রোহের সময় যে ভয় ইংল্যান্ডের বিদ্রোহান সমাজকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিলো) তাহলে এই কাব্যাদর্শকে হয়তো সত্যিই সমাজের মধ্যে জীইয়ে রাখা শক্ত হতো। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে যে পাঠক-সমাজ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন তাঁদের আনন্দদানের জন্তু প্রয়োজন ছিলো। যান্ত্রিকতামুক্ত নৈসর্গিক জগৎ যেখানে ইউরোপের গ্রীক এবং মধ্যযুগীয় ভাবধারার অনেকখানি ধরে রাখা যায়, শিল্পময় যুগের নিষ্ঠুর বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে যেখানে ব্যক্তির এককসত্তা কিছুক্ষণের জন্তু লাভ করতে পারে ধ্যানময় জগতের অপার শাস্তি। উনিশ শতকে দ্বিমুখী সমাজাদর্শের যে রূপায়ণ (বা রূপান্তর বলতেও কোনো বাধা নেই) ইংল্যান্ডের রোম্যান্টিক কবিতায় ঘটেছে তাকে দেখাতে পারলে কিন্তু রোম্যান্টিক কবিতার রূপ আমাদের কাছে স্বচ্ছতর হয়ে যায়।

সমাজচেতনাসম্পন্ন সমালোচনার এই ধারাকে আরও উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লিখছেন ম্যাথু আর্নল্ড, সাহিত্য-

সংস্কৃতির বিশুদ্ধতম কর্ণধার, যার কাছে পশ্চিমী উদারনৈতিক সাহিত্যচর্চা বিশেষভাবে ঋণী। ১৮৮৯ সালে Culture and Anarchy প্রবন্ধাবলীতে তিনি সংস্কৃতির জয়ধ্বজা তুলে ধরলেন সমাজে নৈরাজ্যের সংশোধক হিসেবে। তাঁর কাব্যাদর্শের বর্ণনা থেকে ফুটে ওঠে এর উভয়মুখিতার চেহারা। আর্নল্ড একদিকে কবিতাকে বলেছেন জীবনের পরিমাপক (Criticism of life), অন্যদিকে সে পরিমাপ হবে কবিতার সত্য ও মৌন্দর্ঘ্যের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (under conditions fixed by laws of poetic truth and poetic beauty)। তাঁর লেখাতে জীবনাদর্শের সমালোচনা আছে প্রচুর। Dover Beach, Thyrsis, Scholar Gypsy ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতাগুলিতে ছড়ানো আছে উনিশ শতকের বিপর্যস্ত জীবনের লম্বা ফিরিস্তি। অথচ কবিতার সত্য ও মৌন্দর্ঘ্য বলতে তিনি কি বোঝাচ্ছেন সেটা কিন্তু কোনো সময়ে পরিষ্কার করে বলেছেন না। এবং এই অব্যক্ত অংশটুকু বাদ দিলে আর্নল্ড তাঁর সংস্কৃতির পটভূমিকা খুব পরিষ্কার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন। শিল্পবিপ্লব-সঙ্ঘাত গণতন্ত্রের বাহক জনকল্যাণ এবং প্রগতিবাদের যে ধূয়ো সমাজে তখন উঠেছিলো তার সহজলভ্যতার বিরুদ্ধে আর্নল্ড উচ্চারণ করলেন ‘সংস্কৃতি’র স্বদ্ব-প্রসারী মন্ত্র। সমাজের শ্রেনীবিভাগের মধ্যে প্রচলিত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে যে সংস্কৃতির ধ্বজা আর্নল্ড ওড়ালেন সে সংস্কৃতিতত্ত্বকে ঠিকমতো বুঝতে তাই একটি স্মৃতিদীপ্ত ঐতিহাসিক শ্রেণীবদ্ধ সমাজ চেতনার প্রয়োজন। এইটি বাদ দিয়ে যেসব সাহিত্য সমালোচক আর্নল্ডের ‘সংস্কৃতি’ মন্ত্র জপ করেন তাঁরা চেলাগিরি করেন মাত্র, সমালোচনা করেন না। অল্পরূপ ক্ষেত্রে প্রায়শই লেখক এবং পাঠক একে অন্তের শিকার হয়ে পড়েন।

যে সত্যকে সাহিত্যিক সত্য বলে প্রায়ই অভিহিত করা হয় তার অবয়ব তৈরী হয় তদানীন্তন সমাজের কাঠামো থেকে, যদিও সাহিত্যের কাঠামো আর সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকলেও দুটো এক জিনিস নয়। সামাজিক তথ্যের সঙ্গে ইতিহাসের বিবর্তনলালিত এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যস্থতা না থাকলে সমাজকে সাহিত্যে উপস্থাপিত করা যায় না। মেহিয়া-এর London Labour and the London Poor-এর পাশে ডিকেন্সের উপন্যাস-গুলিকে রাখলে তফাতটা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে। ডিকেন্স তাঁর তথ্য-

গুলিকে খেরালখুশিমতো বাড়িয়ে কমিয়ে দিয়ে উনিশ শতকের মাঝখানের তিনটি দশকে ইংল্যান্ডের সমাজজীবনের আভ্যন্তরীণ ছন্দের মাঝখানে যেভাবে পাঠককে নিয়ে যেতে পারেন মেহিয়া তা পারেন না। হাম্ফ্রে হাউস তাঁর 'Dickens World' বইটিতে ডিকেন্সের উপন্যাসে ব্যবহৃত সামাজিক তথ্যগুলিকে নিপুণভাবে সাজিয়ে এইটেই প্রমাণ করেছেন যে ডিকেন্স তাঁর মধ্যবিত্ত চিন্তা-ধারার সীমা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে সামাজিক সত্যকে যে-রকম রং চড়িয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, তাতে সে সমাজের আসল চেহারা তো ঢাকা পড়েই নি উপরন্তু মিকবার, ইউরায়্যা হীপ, জো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমাজটি অবিস্মারকমের বাস্তব হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের হিতবাদি (Utilitarian) ইংল্যান্ডে সামাজিক তথ্যের কোনো অভাব নেই, কিন্তু সেই তথ্য ডিকেন্স-সাহিত্যের রসান্বাদনে সাহায্যই করে, তার অপ্ৰাসঙ্গিকতা প্রমাণ করে না।

কথা উঠতে পারে যে ডিকেন্সের লেখা প্রধানতঃ সমাজভিত্তিক, তাঁকে দিয়ে সাহিত্যের সমাজভিত্তিকতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলে তো সমস্তাটির সরলীকরণ করা হয়। তাই সমাজ-সাহিত্য বৈপরীত্যের অপর প্রান্তে নেওয়া যাক ওয়ান্টার পেটারকে। উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে কলাকৈবল্যবাদের প্রধানতম হোতা, ইনিই জর্জোনের ছবি আলোচনা প্রসঙ্গে সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন 'সব শিল্পই সঙ্গীতে পৰ্ববসিত' (all art aspires to the condition of music)। সমাজবিচ্যুত কাব্যাদর্শের এর চাইতে প্রকৃষ্ট উদাহরণ খুব বেশি নেই এবং বলা যেতে পারে এই কাব্যাদর্শের বিচারে উনিশ শতকের সামাজিক মানদণ্ডের ব্যবহার চলে না। সমাজচেতনা বলতে যদি সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ বোঝায় তাহলে অবশ্যই পেটারের সমালোচনারীতিকে বারে বারে আঘাত করা হয়েছে পশ্চিমী মধ্যবিত্ত সামাজিক মূল্যবোধের খাতিরে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে ইংল্যান্ডের উদারনৈতিক সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে একঘরে করবার প্রচেষ্টা চেষ্টা ছিলো। বিশ শতকের গোড়ায় আমেরিকাতে আর্ভিং ব্যাবিট, পল এলমার মোর প্রমুখ মানবতাবাদী সমালোচকেরা এবং ইংল্যান্ডে লীডিস হম্পতী সাহিত্যবোধে সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষয়মানতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনেন তার অন্ততম অঙ্গস্বামী পেটার এবং তার 'শূন্য-গর্ভ নন্দনত্ব' (aesthetic vacuum)।

এই অভিযোগের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যাকে সমাজাদর্শ মনে হতে পারে আসলে তা ভাবাদর্শেরই নামান্তর মাত্র। উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের সমাজের চেহারার দিকে একটু নজর দিলেই বোঝা যাবে যে পেটারের লেখাতে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ সাহিত্যবিচার থেকে মোটেই অশ্লীল হয়ে যায়নি, উপরন্তু তদানীন্তন সমাজ ও সাহিত্য ধারণাগুলির এক নতুন ধরনের সংমিশ্রণ ঘটেছে পেটার-বর্ণিত শিল্পের মন্বয়তায়। যাটের দশকের শেষদিক থেকে ইংল্যান্ডের পাঠকগোষ্ঠীর চেহারা অনেক বেশী সূচিহিত। Westminster বা Fortnightly Review, Academy বা Saturday Review এমন কি সংরক্ষণবাদী Quarterly Review-এর লেখার মধ্যে একে অস্ত্রের মধ্যে সাহিত্য ও সমাজচিন্তার যে সব পার্থক্য লক্ষিত হচ্ছে সমাজের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর মাপকাঠিতে বিচার করলে তাদের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। এঁরা সকলেই নেমে পড়েছেন মধ্যবিত্ত শাসক-শ্রেণীর অবসর ও মননশীলতাকে সম্পদশালী করার কাজে। এঁদের মধ্যে ঝগড়া ভাই নেহাতই আপোষে ঝগড়া; উদাহরণস্বরূপ উনিশ শতকের বহু আলোচিত বিতর্কগুলির একটিকে নেওয়া যেতে পারে। উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী স্যর জেইমস্ ফিট্‌স্ জেইমস্ স্টিভেন ম্যাথু আর্নল্ডের লেখার ইংল্যান্ডের তথাকথিত প্রগতিবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি কটাক্ষ মোটেই প্রতিতির চোখে দেখেননি, Saturday Review পত্রিকায় ইনি ম্যাথু আর্নল্ডের সমাজচিন্তার কড়া সমালোচনা করেন এবং আর্নল্ডও তাঁর নিজস্ব মজলিশি চালে তার জবাব দেন। কিন্তু এরা কি সত্যিই দুই ধরনের সমাজাদর্শে বিশ্বাসী? স্যর স্টিভেন ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ উনিশ শতকের ভারতবর্ষে তার অন্ততম বাহক হলো ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব এবং ম্যাথু আর্নল্ডের 'সংস্কৃতি'-তত্ত্ব এই সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। অর্থাৎ ছোটখাটো বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সমাজভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এঁদের সাদৃশ্য অত্যন্ত গভীর। উনিশ শতকের সংস্কৃতির এই সামাজিক গতিবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে এগোলে বোঝা যায় যে লীভিস তাঁর আপাত-বৈয়িত্য সত্ত্বেও পেটারেরই স্বদলীয় এবং সেই কারণেই পেটার যখন 'মহৎ শিল্প'-এর (great art) সংজ্ঞা দেন তার সঙ্গে লীভিস-বর্ণিত 'মহৎ সংস্কৃতিধারার' (The great tradition) মৌলিক পার্থক্য খুবই কম।

গোড়ার দিককার এই ছবিটি পরিষ্কার করে নিয়ে যদি পেটারের সমালোচনা-

সাহিত্য বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে তার মধ্যে ধরা পড়তোর মালমসলা—আঠারো শতকের বুদ্ধিবাদী দর্শন যে স্বাভাবিক মানুষের বর্ণনা করেছে এবং উনিশ শতকের হেগেলীয় দর্শন যাকে আদর্শবাদী মানুষ বলেছে সে-দুটি মিলিয়ে পেটার তৈরী করেছেন তাঁর নান্দনিক জগৎ। এই জগৎকে তাঁর সমাজের প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত সমাজাদর্শ থেকে কোনো অংশে বিচ্যুত মনে করার কোনো কারণ নেই। এই অভিমত যে-কোনো এক বিশেষ মতবাদ-প্রসূত নয় তার প্রমাণ নিছক সাহিত্যধর্মী সমালোচনা থেকেও পেটারের এইরকম একটি পরিচয়ই বেরিয়ে আসে। একদিকে টি এস এলিয়টের ‘Arnold and Pater’ প্রবন্ধটি অপরদিকে ফ্র্যাঙ্ক কারমোডের ‘The Romantic Image’ বইটি খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে পেটার ভিক্টোরীয় সংস্কৃতিচিন্তাকে পৌছে দিচ্ছেন বিশ শতকের গোড়ার দিককার ‘আধুনিক’ কাব্যচিন্তার দোরগোড়ায়। স্তবরাং পেটারকে তাঁর জ্ঞানগত সমাজচিন্তা থেকে বিচ্যুত মনে না করা কেবলমাত্র সমাজভিত্তিক বিশ্লেষণের কষ্টকল্পনা নয়।

আপত্তি উঠতে পারে এগুলি তো সবই মাছের তেলে মাছ ভাজা। সমাজ-ভিত্তিক চিন্তাউনিশ শতকের মার্কামারা তাই দিয়ে উনিশ শতকের কিছু কাব্যচিন্তার আলোচনা করা হ’লো এতে কার কি এসে গেলো? ‘আধুনিক’ মননজগৎ এসব সমীকরণ পেরিয়ে কবে চলে এসেছে মনোজগতের কুলকুণ্ডলিনীর প্যাচের মধ্যে। আধুনিক মন নিয়ে কাব্যজগতের এই জটিলতার মধ্যে মানুষের সামাজিক জীবনের সরলীকৃত সত্যকে প্রতিকলিত করা যায় কি? কোনো এক বিশেষ সাহিত্য-চিন্তাবিদেব মতে আধুনিক যুগে উপন্যাস, গল্প, সমালোচনা সবই হয়েছে কবিতার অধিকার কবলিত। কবিতাই একমাত্র শব্দের অন্তর্গত রূপটিকে নিটোলভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং আগে যা বলেছি এই রূপ খুঁজতে কবিতার বাইরে কোথাও যাওয়া চলবে না; সমাজজীবন তো খুব দূরের কথা, কবির ব্যক্তিগত জীবনের অল্পপ্রবেশও এখানে নিষিদ্ধ।

ভরসার কথা এই যে আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচক আমার চোখে পড়েননি যিনি এই অতিমানবিক স্বপ্ন (অথবা দুঃস্বপ্নকে) সার্থক করতে পেরেছেন। কাব্যাদর্শের যে-সব আলোচনা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে এবং যা দিয়ে আমরা পুষ্ট তার ওপরে পশ্চিমী কাব্যাদর্শের ছায়া অত্যন্ত ঘন। যে কবি-

পাঠক সম্পর্কের ওপরে পশ্চিমী কাব্যচিন্তা এখন দাঁড়িয়ে দেখান থেকে এমন কোনো চাপ আর কবির ওপরে আমার সম্ভাবনা দেখি না যা কবিকে অগুভাবে চিন্তা করাবে। সমাজের গোষ্ঠীগত জীবন বলতে কোনো চেহারা আর পশ্চিমী জগতে তেমনভাবে চোখে পড়ে না। যন্ত্রভিত্তিক পুঁজিবাদ এবং ভোটভিত্তিক গণতন্ত্র-বাদ পশ্চিমী মানুষকে নিঃসঙ্গ হবার প্রেরণা জুগিয়েছে। পশ্চিমী কাব্যাদর্শ এই প্রেরণার জনক এবং প্রজ্জ্বলিত দুই-ই। কাব্যকে সমাজবিচ্যুত করার পেছনে এই-জাতীয় ঐতিহাসিক ধারার অবদান অনেকখানি। সুতরাং 'বিশুদ্ধ কাব্য'-এর আদর্শকে ব্যুত্রে গেলে যে সমাজে সে আদর্শ উদ্ভূত হচ্ছে এবং যে সমাজ তাকে পরিপুষ্ট করেছে সে সমাজের চেহারাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। এর ফলে দান্তে-বর্ণিত প্লুটোর মতো 'বিশুদ্ধ কাব্য' নেতিয়ে পড়লেও কাব্যরূপের গভীরতা এবং তাৎপর্য আমাদের চোখে বাড়বে বই কমবে না। এই গভীরতা বা তাৎপর্য সমাজ-চেতনার গভীরতা বা তাৎপর্যের সমগোত্রীয়।

আনাড়ি হাতের এই বিরাট বিষয়ের অবতারণা করার দুঃসাহসের জন্ত সম্পাদক মহাশয় শ্রীম্বরজিৎ ঘোষ মূলত দায়ী। এই আলোচনাটি পরোক্ষভাবে যাদের কাছে ঋণী তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্যের নাম অন্যতম। প্রত্যক্ষভাবে শ্রদ্ধেয়া সুকুমারী ভট্টাচার্য সাহায্য করেছেন। লেখার ভুলত্রুটিগুলি আমার নিজস্ব।

গৌতম বসু

পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত : বিবর্তনে ও কবিতার সান্নিধ্যে

শ্রুতির মূলেই উপকরণ ; নৈসর্গিক কিম্বা মনন-সঞ্জাত শব্দে যেখানে স্বয় (মেলডি), সঙ্গতি (হার্মনি) প্রভৃতির সূত্র উপস্থিত, উপকরণ ও গ্রাহকে সেখানে সৃষ্টির সম্পর্ক। প্রাকৃতিক নিয়মে শব্দ সঙ্গীতের মূল একক এবং উপকরণ, ফলে, শব্দই একাধারে প্রেরণা ও প্রকাশমাধ্যম হলে স্বভাবতই, সঙ্গীত প্রথম পর্যায়ের উৎপন্ন শিল্প (first order derivative art) হয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, শুধু সঙ্গীত নয়, ভিন্ন-ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্প-সৃষ্টি এই প্রাথমিক পর্যায়ের অন্তর্গত। কিন্তু সরলীকরণের সত্ত্ববনা সীমিত, যেমন, ইতিহাস সাক্ষী, কখনো কখনো শিল্পই শিল্পের প্রেরণা। এই ধরনের সৃষ্টিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎপন্ন শিল্প (second order derivative art) বলা যেতে পারে। পর্যায়ের ভিন্নতার সঙ্গে অবশ্য আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের কোনো তাত্ত্বিক সন্দেহ নেই; এড্‌না সেন্ট্‌ ভিন্‌সেন্ট্‌ মিলের 'On Hearing A Symphony of Beethoven'-এর থেকে যে কীট্‌স্‌-এর 'Ode To A Nightingale' শ্রেষ্ঠত্ব তার স্বতন্ত্র কারণ আছে। বস্তুত, মূল প্রভাবের শ্রেষ্ঠত্ব অতিক্রম ক'রে দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্প অনেক দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। *Cantus planus*, অর্থাৎ plainsong-এর যুগ থেকে প্যালেরট্রিনা এবং তারপর বাথ্‌, বেথোভেন্‌ হয়ে টিপেট্‌ পর্যন্ত পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রে এনেছে; কিন্তু শুধু সঙ্গীতাত্মক নয়, এক বৃহত্তর শৈল্পিক কাঠামোর এর বিবর্তন বিচার্য। বিচ্ছুরণ মহৎ শিল্পের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য—তার অর্থ ও আভাসের প্রাপ্ত নির্ণয় করা শক্ত—পাবলো কাসাল্‌স্‌ যেমন বাথ্‌-এর The Well-tempered Clavier (*Das Wohltemperierte Clavier*) সম্বন্ধে বলেছিলেন : 'There is always something left to discover in it'। সম্ভবত এই সত্ত্বাই এক নিটোল গ্রন্থি হয়ে বিভিন্ন শিল্পাধার মধ্যে রক্তের সম্পর্ক গাঁড়ে জুড়েছে। সময়ের বিশেষ চরিত্রপ্রভাবে যখন এই সংযোগ ক্ষীণ হয়েছে, তখন শিল্প হয় অন্তর্মুখী উত্তরণের সত্ত্ববনার উজ্জল, নয় তো ক্ষয়ের লম্বুখীন।

Art integral-এর প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার কয়েকটি প্রধান উৎস

লক্ষণীয় : হেলেনইজ্‌ম্, রেনেসাঁস্, খৃষ্টধর্ম এবং লোকশিল্প। প্রভেদীয়, বারোক ইত্যাদি অন্যান্য প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য কিন্তু বরাবরই তাদের স্থানগত সংকীর্ণতা ছিল—বারোক-এর প্রধান প্রভাব যেমন কেবল চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং সঙ্গীতে, প্রভেদ-এর প্রধান প্রভাবও তেমন কাব্যসাহিত্যেই স্প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি-বাদ এই অর্থে সীমিত নয় কিন্তু School of Puritan Ethics-এর ফল-স্বরূপ অতএব স্থূল হিসেবে রেনেসাঁস্ এবং খৃষ্টধর্মের প্রভাবগুণ্ট। বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয় সঙ্গীত, এবং অন্তত এই ক্ষেত্রে হেলেনইজ্‌ম্-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব সীমিত। গ্রীস-এর সঙ্গীতিক ঐতিহ্যের যে নমুনা পাওয়া যায় তাতে সভ্যতার আভাস নিশ্চয় আছে কিন্তু পরবর্তীকালের সঙ্গীতচিন্তাকে অনুপ্রাণিত করার যথেষ্ট উপকরণ নেই। এ-সঙ্গেও হেলেনইজ্‌ম্-এর প্রভাব আছে, এবং সেটি অন্তরের। ভারীকালের জন্ম গঠনতত্ত্ব, সমালোচনার মাপকাঠি কিম্বা অসামান্য কোনো সঙ্গীতশ্রষ্টার প্রমাণ না রেখে গেলেও গ্রীসীয় সভ্যতা তার বিরাটত্ব, সংযত আবেগ এবং চেতনায় একটি ক্লাসিকবোধ রেখে গেছে।

দ্বিতীয়ত, রেনেসাঁস। 'নবজাগরণ' সঙ্গীতের পক্ষে কি যথার্থই নবজাগরণ ছিল? এই সময়ে পলিফনি কোরাল পলিফনি-তে পরিণত হয়, সেক্যুলার্ মিউজিক্ অর্থাৎ ধর্মবিহীন সঙ্গীতেরও এই প্রথম সম্মানের আসন মেলে, কিন্তু চিত্রকলা কিম্বা সাহিত্যের মতন সঙ্গীতের ভিত্তিতে কোনো ব্যাপক ও দ্রুত বদলনের সঠিক পরিচয় নেই। বস্তুত, সঙ্গীতিক রেনেসাঁস্-কে অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন প্রক্রিয়া হিসেবেই চিহ্নিত করা উচিত। সঙ্গীতিক তত্ত্বের পরি-শীলনে এবং পালেষ্ট্রিনা, লাসো ইত্যাদি সঙ্গীতশ্রষ্টার হাতে আঙ্গিকের ক্রমোন্নতিতে রেনেসাঁস্ সঙ্গীতকে ক্লাসিক যুগের তোরণে পৌঁছে দিয়েছে। এই বিচারে বারোক-যুগের বিশিষ্টতা থাকলেও কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই; এটি আশ্চর্য-জনক হ'লেও নিতান্ত যুক্তিহীন নয়। রেনেসাঁস্-এ সংঘর্ষের আধিপত্যের অব্যবহিত পরে উচ্চাঙ্গ ও অতি-অলঙ্করণের যুগ প্রায় অবশ্যস্তাবী—নাহ'লে ক্লাসিক যুগে সামঞ্জস্যের অভাব থেকে যেত। বৃহত্তর সংজ্ঞায় রেনেসাঁস্-কে বিচার করলে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় : প্রথমত, সেক্রেড্ ও সেক্যুলার্ সঙ্গীতের সমান্তরাল অস্তিত্বের প্রথম স্থায়ী চিহ্ন; দ্বিতীয়ত, বাথ্ ও হ্যান্ডেল্-এর মধ্যে পলিফনি-যুগের উচ্চতম স্তর এবং সেইখানেই যুগের

শতভিষা

সমাপ্তি ; এবং তৃতীয়ত, বারোক-যুগ সম্পূর্ণ ভিন্ন মেস্সাজের হয়েও রেনেসাঁস্-এর সঙ্গে যুক্ত। রেনেসাঁস্-এর মূল কাঠামোয় থেকেও কেবলমাত্র এক-জনই সদর্থে অভিনব হ'তে পেরেছিলেন, তিনি আধুনিক কন্যচ্যটো-র প্রধানতম স্রষ্টা অ্যানটোনিও ভিভাল্ডে। হারমনি-প্রধান যুগে মেলডি-প্রধান লোক-সঙ্গীত ব্যবহার ক'রেই ভিভাল্ডে নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

প্রাক-ক্লাসিকাল যুগ থেকে লোকসঙ্গীতের নতুন প্রয়োগে শুধুমাত্র মেলডি অংশের ঐশ্বর্যই বাড়েনি, আঞ্চলিক স্বাদের ভিন্নতার দরুন বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত মিলে বহুমাত্রিক সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছে। স্বল্পপরিসরে প্রধান প্রধান লোক-সংস্কৃতির মূল্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব, শুধু এইটুকুই লক্ষণীয় যে ভিভাল্ডের মধ্যে যেটি কেবল নতুনত্বের স্বাদ ছিল, আধুনিক কালে ডিলিয়ম্ কিম্বা ভন্ উইলিয়াম্-এর মধ্যে সেটি পরিণত মাধ্যমের আকার ধারণ করেছে।

যুরোপীয় কল্পনার সময়োচিত ক্ষুরগের জন্তু খুঁটবৃত্তান্তের মতন আধারের ক্রান্তিহাসিক প্রয়োজন ছিল। আত্ম স্বীকার করতে বাধ্য নেই, মধ্যপ্রাচ্যের রক্ষণ পরিবেশ থেকে একটি religion নির্মাণ অন্ততপক্ষে শিল্পগত দিক থেকে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। শুধুমাত্র বাইবেল-এর কিং জেম্-ভার্সন-ই এর যথেষ্ট প্রমাণ—ছত্রে ছত্রে রূপক, প্রতীক এবং সর্বোপরি কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে বইটি নানা শিল্পশাখার সজীব প্রেরণা হয়ে আছে। প্রকাশ্যে, বাইবেল প্রচার এবং প্রশস্তি, মানসিকতায়, শিল্প ও দর্শন। উদাহরণস্বরূপ, চতুর্বিংশ সাম-এর দুটি ছত্র উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

6. This is the generation that seek him, that seek thy face, O Jacob. Selah.

7. Hold up your heads, O ye gates ; and be ye lift up ye everlasting doors ; and the King of glory shall come in.

এই শিল্পবোধ সংক্রামক। সামান্য ব্যবহারিক কারণে রচিত ক্যান্টাটা, প্রেলিউড্ প্রভৃতির অলঙ্করণ সর্বতোভাবে এই বিশিষ্ট শিল্পবোধ প্রসূত। কিন্তু অলঙ্করণ বাহ্যিক ; কিউগ্, মাস ও ওরাতোরিওর মতন গভীরতর সৃষ্টি কখনোই নিছক অলঙ্করণে সীমাবদ্ধ নয়। হ্যানডেল্-এর 'The Messiah'

কিষা বাথ্-এর 'The Passion according to St. Matthew' অন্তরের কোনো ঈশ্বরসন্ধান—সঙ্গীত ও religion অবলম্বন মাত্র। ঐতিহাসিকতার অন্তরায়ের জন্ত ক্লাসিকাল যুগ অর্থাৎ হাইডন্-এর সময় থেকেই গির্জাপ্রাঙ্গন কিছুটা অপ্ৰয়োজনীয় হয়ে যায়। স্তরীভূত অভিজ্ঞতা পেরিয়ে ব্যক্তিচেতনা ক্রমশই নিজের এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ফিরে আসে, যেমন বেথোভেন্। Eroica অর্থাৎ তৃতীয় সিম্ফনি-তে যিনি অস্থির, পঞ্চম সিম্ফনি-তে যিনি নিয়তির তাড়নায় জর্জরিত, নবম সিম্ফনি ও শেষ কয়েকটি ক্যার্টেট-এ (A Minor, B flat Major, C sharp Minor, F Major) তিনিই আবার প্রজ্ঞায় স্থিত। দীর্ঘ সাত বছর প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকার পর বেথোভেন্ যখন Hammerclavier Sonata লেখেন তখন তিনি সমাজ, religion এমন কি সমস্ত বাহ্যিক শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন। এ একরকম ভালো ; শিল্পী যখন সব স্ববিরোধের উপরে তখন পৃথিবীও নতুন কিছু শেখাতে অক্ষম। তখনকার অভিব্যক্তির দুর্গমপথে বাথ্-এর religion-আশ্রয়ী আড়ম্বর অবাস্তব। নিঃসঙ্গ বেথোভেন্ হয়তো সেইজন্তই ক্যার্টেট-এর ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর উপলব্ধ সঙ্গতির সূত্র রেখে গেলেন। বাইবেল-প্রেরিত ধর্মবোধ শেষে উৎস অতিক্রম করলো।

প্রধানত সেকুলার সঙ্গীতের কল্যাণে ক্লাসিক যুগ বহু স্রোতের পটভূমিতে আসায় তার আঙ্গিক ও পরিধিতে সম্প্রসারণের পরিচয় মেলে। সিম্ফনি, সোনাতা প্রভৃতি আধুনিকতর আঙ্গিকের গঠনে, প্রভাব এবং নাট্য ও কাব্যসাহিত্যের অঙ্গসঙ্গ ইত্যাদির ফলে সঙ্গীতিক অল্পভূতিসম্পন্ন একটি সঙ্গীতোত্তর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অথচ বাথ্-এর ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে নয়, নিতান্ত সাধারণ মানুষ ও জীবন সংক্রান্ত অক্ষুট ভালো লাগার বোধগুলি জাগিয়ে তোলায় এর সিদ্ধি। এই যুগে কবিতার থেকে নাটকের প্রভাব তীক্ষ্ণতর হলেও, উক্ত সঙ্গীতোত্তর পর্যায় স্পষ্টতই কাব্যিক—এবং লিরিক কবিতার অর্থে। বেথোভেন্-এর পাসটোরাল্ সিম্ফনি বা মুনলাইট্ সোনাতার মতো দৃষ্টান্তে তো আধুনিক কালের Tone-poem -এর পদক্ষেপও চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এ-জাতীয় রচনায় অবশ্য ক্লাসিকতার সঙ্গে রোম্যান্টিকতার সহাবস্থান ঘটেছে, কিন্তু মোটজার্ট-এর E flat Major-এ Horn Concerto-র মতন সম্পূর্ণ ক্লাসিক রচনা ধরা গেলেও কাব্যিক চেহারার স্পষ্টতা থেকে যায়। অথচ হাইডন্, মোটজার্ট ও

বেথোভেন-এর মধ্যে কেউই খুব একটা সঙ্গীতচর্চার বাইরে এসে যুগের হাওয়ার পরিমাপ করেননি। অপেরা লেখার স্ববাদে সমকালীন নাটক সম্বন্ধে ধারণা থাকলেও, লিরিক কবিতার বিশারদ এঁরা নন। তবু কবিতা কাজ করেছে; সৃজনশক্তি কয়েকটি কবিতার স্বরূপে ক’রেই ক্ষান্ত হয়নি, সঙ্গীতরচনার সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। বেথোভেন সাধারণত শেষ ক্লাসিকাল এবং প্রথম রোমান্টিক হিসাবে সমাদৃত, (যথার্থই তিনি জীবনের দুই প্রান্ত দিয়ে দুই যুগ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন) কিন্তু বিশ্লেষিত নন। লিরিকবোধের প্রেরণায় তিনি ক্লাসিকাল যুগের উচ্চতম চূড়ার নিমার্ণ, কিন্তু যখন এই কাঠামোয় লিরিকবোধের আর ঠাই বইল না তখন তিনি রোমান্টিকতার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

ক্লাসিকতার সামঞ্জস্যবোধকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যবর্তিতায় জার্মানির লিরিক কবিতা আবেগে প্রাণ সঞ্চার করতেই সঙ্গীতে ও বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে তার প্রধাবিক্রমতা প্রতিভাত হয়। রোমান্টিক মানসিকতার উন্মুক্ত পরিবেশ ওয়েবার, শুবার্ট, ব্যরলিঙজ, শুমান এবং বিমূর্ততর স্তরে মেন্ডেলসন্, শোপ্যা ব্রাম্‌স ও লীস্ট প্রভৃতির সমবেত চেষ্টায় উনাবংশ শতাব্দীর সঙ্গীতপ্রবাহ প্রায় আন্দোলনের সামিল। ১৮২০ থেকে এই আন্দোলনের বরাবরই বৃহত্তর সাহিত্যক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া আশ্চর্যের নয় কারণ সঙ্গীতশ্রষ্টার মেজাজের উপযোগী উপরণের সম্ভার ছিল বিস্তৃত। গোয়েঠে-র ‘Faust’ থেকে ব্যরলিঙজ-এর ‘The Damnation of Faust’ ও বাইরন্-এর ‘Childe Harold’s Pilgrimage’ থেকে ‘Childe Harold In Italy’; বিভিন্ন কবির (বিশেষত হাইনের) কবিতা থেকে শুমান-এর ‘Romances and Ballads’; শেক্স-পিয়ার-এর ‘A Midsummer Night’s Dream’ প্রভাবিত মেন্ডেলসন্-এর একই নামে বিমূর্ত রচনা—ফর্দের যেন শেষ নেই। অথচ এই সম্পর্কে নিছক প্রাথমিক বিষয়বস্তু ব্যবহারে সীমাবদ্ধ মনে করলে ভুল হবে। সেই অর্থে শোপ্যা-র কোনো বহিঃগত উপকরণ নেই, অথচ শোপ্যা-ই রোমান্টিক-তায় সর্বাপেক্ষা মগ্ন। তর্কের খাতিরে (এবং আধুনিক মতের বিরুদ্ধে) যদি যেনেও নেওয়া হয় যে শোপ্যা-র ব্যালাডগুলি আসলে তাঁর বন্ধু অ্যাডম্‌ মিকিউইজ-এর কবিতা ভালো লাগার ফল, তাহলেও প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মেজাজের পার্থক্য দেখে প্রেরণার স্বার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। আসলে

সম্পর্ক মূলত ভাবের। সেইজন্যই লীস্ট-এর Symphonic poem বা মেন্ডেলসন্-এর Song Without Words সম্পূর্ণ সঙ্গীত হয়েই সম্পূর্ণ কবিতা হয়ে ওঠে। শুধু মাধ্যমের পার্থক্যে যেমন কবিতা-অকবিতার বিচার চলে না, প্রতিটি প্রাসঙ্গিক মাধ্যম উত্তীর্ণ হলেই একটি গান, ছবি কিম্বা মূর্তি কবিতা হয়।

সমকালীন কবিতায় স্বরারোপের প্রবণতা রোমান্টিক যুগের থেকে অক্ষত আকারে একশো-বছরের বেশি টেকেনি কিন্তু সঙ্গীতের ইতিহাসে দাগ কেটে গেছে। প্রধান চারজন স্বরকার শুবার্ট, শুমান, ব্রাম্‌স্‌ ও উল্ফ-এর মধ্যে শুবার্টই শ্রেষ্ঠতম; তাঁর The Winter Journey (Die Winterreise) কিম্বা গোয়েঠে-র কবিতা অবলম্বনে The Erl-King (Der Erlkonig) শুনলেই স্বরারোপের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শোনা হয়ে যাবে। কিন্তু স্বরারোপ শুধু সাফল্যই দেয়নি, কবিতা ও সঙ্গীতের সম্পর্কে কিছু প্রশ্নও তুলেছে। কবিতাকে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গেলে একে অপরের পরিপূরক না হয়ে বিরোধী হয়ে যেতে পারে। একটি কবিতাকে যদি সম্পূর্ণ শিল্পবস্তু হিসেবে গণ্য করা যায় তাহলে সঠিক অমুবাদেও (তা সে সঙ্গীতে কি অন্য ভাষাতেই হোক) কিছুটা শিল্পক্ষয় প্রায় অবধারিত, কিন্তু মূল্যের সঙ্গে কোনো বিরোধ কবির পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে গোয়েঠে শুবার্ট-এর বেশ কিছু স্বরারোপের বোরতর বিরোধী ছিলেন, ব্রাম্‌স্‌ তো গোয়েঠে-শিলাব-হাইনের থেকে অপ্রধান কবি ডাইমেরর কবিতাই বেশী স্বর দিয়েছেন। অপরপক্ষে, ভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও মেজাজের বিশিষ্ট মিলের জন্যই দেবুসি ভারলেন, মালার্নে ইত্যাদির কবিতার উৎকৃষ্ট স্বরারোপ করেছেন।

বস্তুত, রোমান্টিক কাঠামোর প্রতি সম্পূর্ণ অহুগত থেকে তৎকালীন (উন-বিংশ শতাব্দীর) কাব্যসাহিত্যে গীতিরূপ-প্রদানের মধ্যে একটি বিরোধ ছিল। শুবার্ট-প্রবর্তিত কণ্ঠ ও সঙ্গত অর্থাৎ কণ্ঠ ও পিয়ানোর মধ্যে সামঞ্জস্য বক্ষার পথ অমুসরণ না করে শুমান সঙ্গতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন; ব্রাম্‌স্‌ তাঁর মেলডির প্রতি দুর্বলতার জন্য লোকসঙ্গীত ভিন্ন ব্লিরকের ভাবগত স্বর বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে ধরতে পারেননি, কিন্তু হিউগো উল্ফ-এর কৃতিত্ব যথার্থই স্বীকার্য।

শুমান-এর সঙ্গত-প্রধান পদ্ধতি মেনে নিয়ে তিনি পিয়ানোকে লিরিকের সঙ্গে না বৈধে, লিরিকের অন্তরালে, অর্থাৎ কবির মানসিকতায় পৌঁছে দিলেন। ফলে, সাদ্ধাতিক চরিত্র স্পষ্ট রেখেও কবিতার নিজস্ব স্বাধীনতাকে হেয় করা হয়নি। দেবুসির সুরারোপের সময় রোম্যান্টিকতার পরিবেশ অনেক দুর্বল, কাব্য-সাহিত্যও অপেক্ষাকৃত বিমূর্ত হয়ে ওঠে—ফলে মালার্মের *The Afternoon of A Faun*-এর জন্ত প্রেলিউড্ রচনা কিছুটা সহজসাধ্য হয়েছিল। চারিত্রিক পাথক্য সত্ত্বেও দেবুসি ও উলফ্-এর সুরারোপের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পরবর্তী-কালে মালার্মের বহু কবিতার গীতিকর হয়েছেন, বিশেষত পিয়ের বুলের হাতে, এবং প্রায় সব সফল দৃষ্টান্তই দেবুসির ধর্যমুসারী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে সঙ্গীতচিন্তায় ব্যাপক ভাঙাগড়ার প্রবাহে সিমফনি, সোনাতা প্রভৃতি কোনো আঙ্গিকই অক্ষত থাকেনি। রোম্যান্টিকতার পরে ইম্প্রেশনইজম্, নিও ক্লাসিকাল যুগ এবং তারও পরে সিরিয়লইজম্-এর (serialism) বিকীর্ণতার ফলে প্রতিষ্ঠিত আঙ্গিকগুলি ভেঙে গিয়ে পরস্পরের মিশ্রণের ফলে নতুন এবং ব্যাপকতর বয়েকটি আঙ্গিক সৃষ্টি হয়। নতুন আঙ্গিকের মধ্যে লীস্ট-এর *Symphonic Poem*-এর কিছু পরিমাণে একতার অভাব ছিল—রিচার্ড স্ট্রাউস-এর প্রচেষ্টায় এবং সোনাতা, ফিউগ্ ইত্যাদির উপযুক্ত প্রয়োগে এই আঙ্গিক উন্নততর স্তরে পৌঁছায়। স্ট্রাউস-এরই জন্ত এই আঙ্গিকের পক্ষে শুধুমাত্র 'Don Juan' নয়, শেক্সপিয়ার-এর *Macbeth*-এর নিয়তির গতিবিধি, এমনকি, নিৎসে-র 'Also Sprach Zarathustra'-র দার্শনিকতাকে সুরে প্রতিফলিত করা সম্ভব হয়।

এই আলোড়ন সত্ত্বেও আধুনিক যুগ ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক যুগের সঙ্গে একটি গ্রন্থিতে যুক্ত থেকে গেছিল—প্রতি ক্ষেত্রেই ধ্রুপদী সঙ্গীত tonal method-এর উপর নির্ভরশীল। এই সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে শোনবার্গ atonal method-এর প্রবর্তন করেন। একটি স্বরকে (note) প্রত্যেকভাবে চিহ্নিত না ক'রে তার চারপাশের স্বরের মধ্যবর্তিতায় উক্ত স্বরকে প্রকাশ করাই এর প্রধান লক্ষ্য। প্রথাসিদ্ধ রীতিবদ্ধতার বিকল্প হিসেবে শোনবার্গ atonal method-এ note method অর্থাৎ Serialism-এর প্রচলন ক'রে সাদ্ধাতিক তত্ত্বের যে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেন তা প্রথমে তিরস্কৃত হলেও আজ অভিনন্দিত।

শতভিষা

আঙ্গিকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা ও সঙ্গীতের বোধ বদলে
অনভ্যস্ত কানের কাছে পাউণ্ড ও শোন্‌বার্গ সমান দুর্বোধ্য, কিন্তু
অভ্যস্ত ও শিক্ষিতের কাছে দু'জনেই বিংশ শতাব্দীর কবিতা ও সঙ্গীতের মূল
স্তম্ভের মতন। এই আপাত-দুর্বোধ্যতার জন্য সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে সম্পর্ক
ছিন্ন হতে চলেছে ব'লে অনেকেই মনে ক'রে থাকেন। বস্তুতপক্ষে আধুনিক
কবিতার সুরারোপ স্ট্রাভিন্‌স্কির হাতে খুব সফল হয়নি, কিন্তু সেটাই শেষ
কথা নয়। ক্লাসিকাল যুগের মতন আজও সঙ্গীত এবং কবিতার সম্পর্ক অনেকটা
ফল্গুধারার মতন—সেই শক্তিতেই মালহ্ব-এর Song of The Earth-এর
মতন সিমফনি আকারের সৃষ্টিতে প্রাচীন চৈনিক কবিতার ব্যবহার হয়, ভন
উইলিয়াম্‌স্-এর Sea Symphony-তে ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর Leaves of Grass
প্রায় কোরাল সিমফনির কাছাকাছি এবং এলিয়ট-এর Four Quartets
শুধু চেম্বার মিউজিক নয়, শেষ পর্ধ্যের বেথোভেন্-এর কথা মনে করিয়ে দেয়।
জীবনের মূলেই আজ যখন সংশয়, সূখ আর দুঃখের ব্যাপ্তি, শিরশ্চেতনার ক্ষেত্রে
নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা টানা আদৌ কি সম্ভব ?

রমানাথ রায়

বিভূতিভূষণ ও তাঁর ছোট গল্প

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের অমিত রায় কারণে অকারণে রীতিমত বাকপটু হয়ে উঠেছে, যখন শরৎচন্দ্রের কমল স্বাভাবিক কথা ভুলে কেবলমাত্র তর্কের জাল বুনে নিজেকে আধুনিক ব'লে প্রমাণ করতে ব্যস্ত এবং যখন হামসুন, গোকি-পড়া একদল তরুণ পূর্ববর্তীদের আক্রমণ ক'রে আরো বাস্তব, আরো নয় সত্যের মুখোমুখি হবার জন্তে কৃষক, শ্রমিক, জেলে, বেঙ্গী ও কেবাগীর জীবনী রচনায় মত্ত, দিশেহারা, ঠিক তখনই বাংলা সাহিত্যে এমন এক স্বপ্নদশী বালকের আবির্ভাব ঘটল যে মুহূর্তের মধ্যে সকলের চিত্ত জয় ক'রে অমর হয়ে রইল। অথচ এর জন্তে বিভূতিভূষণকে তর্কের জাল বুনেতে হয়নি, কিংবা, কৃষক, শ্রমিক বা কোন বেঙ্গীর দ্বারস্থ হতে হয়নি। শুধু তাই নয়, পাঠকের মন ভোলাবার জন্তে তিনি কোন জমজমাট অতি নাটকীয় ঘটনার অবতারণা পর্যন্ত করেননি। অপূর কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি এমন সব তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ ঘটনা বেছে নিয়েছেন যার মধ্যে মানুষের সত্যিকার ইতিহাস লেখা আছে। বিভূতিভূষণ জানতেন, 'জগতের বড় ঐতিহাসিকের অনেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মাঝে, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রীদের সোনালাঁ পোশাকের জাঁকজমকে দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। পথের ধারের আমগাছে তাদের পুঁটুলি বাঁধা ছাত্ত কবে ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট হইতে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়া পল্লীর মধ্যবিন্ত ভদ্রলোকের ছেলে তাহার মায়ের মনে কোথায় আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছিল— ছ'হাজার বছরের ইতিহাসে সে-সব কথা লেখা নাই— থাকিলেও বড় কম।' আর সেই কারণেই বিভূতিভূষণ আরও স্মৃশ, আরও তুচ্ছ জিনিসের সন্ধান করেছিলেন, যার ভিতরে মানুষের বৃকের স্পন্দনের ইতিহাস লেখা আছে। তাঁর বিশ্বাস আজকের মানুষ আর বড় বড় ঘটনা চায় না। এখন 'মানুষ মানুষের বৃকের কথা শুনেতে চায়।' এই বৃকের কথা শোনাতে গিয়ে বিভূতিভূষণকে আজিকের কথাও বিশেষভাবে ভাবতে হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন প্রট-নির্বাণের

শতভিষা

মধ্যে লেখকের যতই বুদ্ধির পরিচয় থাকনা কেন, তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ধরা পড়ে না। কেননা, কার্যকারণের স্বেচ্ছা নির্মাণ করতে করতে জীবন থেকে লেখককে ক্রমশ সবে দাঁড়াতে হয়। ইউরোপে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে আধুনিক কথাসাহিত্যের জন্মলগ্নে এই কথাটি অনেকেই বুঝেছিলেন। আর বুঝেছিলেন বলেই সেখানে কথাসাহিত্যের নবজন্ম ঘটেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখকেরা তখন এটা বুঝতে পারেননি।

দুই

প্রথম মহাযুদ্ধ আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে এক ভয়ংকর সর্বনাশ এনে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বিস্ময় এবং সৌন্দর্য সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের উল্লঙ্ঘন বীভৎসতায় মানুষের মন থেকে সমস্ত বিস্ময় চলে গেল। এবং সৌন্দর্য ‘অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে’ আত্মসমর্পণ করল, ফলে শিল্পীরাও ‘সৌন্দর্যের ইন্দ্র-ধনু’র আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়েনতুন করে এই পৃথিবীর দিকে চোখখুলে তাকালেন। মানুষ সম্পর্কে সভ্যতা সম্পর্কে তাঁদের সকলের মোহভঙ্গ হল। তাঁদের কাছে পৃথিবীটা হয়ে উঠল ‘পোড়ো জমি’ এবং মানুষ হয়ে উঠল ‘ফাঁপা মানুষ’। বাংলাদেশের তিরিশের নবীন লেখকেরা তখন এই একই তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে ইন্দ্রধনুর মায়ায় অস্বীকার করে মর্তবাসীদের নীচতার, বিকৃতির ও জৈবতার দিকগুলো সাহিত্যে জোর গলায় প্রচার করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, এই বাস্তব, এই সভ্যতার প্রকৃত চেহারা। কিন্তু প্রকৃতির কোঁতকে সর্বত্রই নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই নবীন লেখকদের মধ্যেও ব্যতিক্রম ছিল। সেই ব্যতিক্রম বিভূতিভূষণ। বাস্তবিক, ভাবতে অবাক লাগে, যখন কারও মধ্যে বিস্ময় বলে কিছু নেই, এমনকি একজন সবকিছু জেনে ফেলেছেন বলে নিজেকে ভাগ্যহীন মনে করে বড়াই করছেন, ঠিক তখন বিভূতিভূষণের আবির্ভাব ঘটল, তাঁর মধ্যে বিস্ময়ের অস্ত নেই, তাঁর মধ্যে পুনরায় ‘সৌন্দর্যের ইন্দ্রধনু’ ধরবার আয়োজন দেখা গেল।

বিভূতিভূষণের মন ছিল রোমান্থর্মা। রহস্যময় স্বপ্নের আকর্ষণে তাঁর মন

বারবার 'জানার গভী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে' যাত্রা করে। 'সোনাডাঙ্গা মাঠ ছাড়িয়ে, ইচ্ছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে' যে পথ সামনে চলে গেছে, 'শুধুই সামনে...দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে', সেই পথের রহস্য তাঁকে থেকে থেকে আকুল করে তোলে। তাই 'দ্রবময়ীর কাশীবাসে'র উৎপীড়িতা উপেক্ষিতা দ্রবময়ী নিজের ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে কাশী চলে যান, 'একটি ভ্রমণ কাহিনী'র গোপীকৃষ্ণ-বাবু ও শত্ৰু ডাক্তার হৃদয়ের আবর্ষণে বারবার প্রোগ্রাম ও টাইমটেবিল প্রস্তুত করে রাখেন। 'সিঁদুচরণ' গল্পের সিঁদুচরণও এই একই আবর্ষণে দূর দূরান্তে যেতে না পারলেও বাহাডুরপুর পর্যন্ত বেড়িয়ে আসে। কিন্তু বিভূতিভূষণ অপরিচয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলেও পরিচিত জগতের স্মৃতি কখনও ভুলতে পারেন না। থেকে থেকে তাঁর মনে পড়ে যায় 'তাহাদের বনে ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘনছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচকিচ করিয়া পাখি ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট, নিঃশব্দ শান্ত বৈকাল—সেই হলদে পাখিটা আজও আসিয়া পাঁচিলের কক্ষর ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোতা লেবুচারাটাতে হয়ত এতদিনে লেবু ফলিতেছে....' ঠিক এই সব মুহূর্তে বিভূতিভূষণকে আর দূরের পথ টানে না। তাই অপু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে 'আমাদের যেন নিশ্চিন্দপুরে ফেরা হয়।' দ্রবময়ীও কাশীতে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি। নিজের গ্রামে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। কেননা, নীরজার সঙ্গে কথক ঠাকুরের কাছে কাশীমাহাত্ম্য শুনতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে যায়, 'ঘরের গাছে কত কাঁঠাল হয়েছে এই আষাঢ় মাসে, বড় কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শিকড় পর্যন্ত কাঁঠাল।' সিঁদুচরণও আবার নিজের গ্রামেই ফিরে আসে।

জানা এবং অজানার দ্বৈত আকর্ষণে বিভূতিভূষণের সত্তা যেন বিধাবিস্তৃত। তিনি এই উভয়ের কোন একটিকে সম্পূর্ণরূপে বরণ করে নিতে পারেননি। কেউই পারে না। পারা সম্ভব নয়। সভ্যতার ইতিহাসে কত মানুষ ঘর ছেড়ে পথে বেড়িয়েছে। কিন্তু ঘরের মায়া কে কবে ভুলতে পেরেছে?

মানুষের অস্তিত্বের একটি অংশকে ঘিরে রয়েছে প্রবৃত্তি, অগ্ৰটিকে ঘিরে চৈতন্য। প্রতিটি মানুষের মধ্যে কয়েকটি এ-দুটো অংশ বর্তমান। মানুষের যেমন খাওয়ার প্রতি আকর্ষণ আছে, ঠিক তেমনি আকর্ষণ আছে নক্ষত্রালোকের প্রতি। তবে পশু বা উদ্ভিদের মধ্যে আমরা শুধু প্রবৃত্তির অন্ধ অভিব্যক্তি দেখি। আর এখানেই মানুষের সঙ্গে পশু বা উদ্ভিদের তফাৎ। বস্তুতঃ, সভ্যতার ইতিহাস মানুষের প্রবৃত্তির ইতিহাস নয়, চৈতন্যের ইতিহাস। এবং সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে শিল্প, যা কিনা 'উৎকৃষ্ট চৈতন্যের ফসল', তার জন্ম প্রবৃত্তির সঙ্গে চৈতন্যের প্রবল বিরোধিতার মধ্যে। এই প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে: অথবা তার নাগপাশকে অতিক্রম করে শিল্পী দ্বিতীয় পৃথিবীর নির্মাণ করেন। এই দ্বিতীয় পৃথিবীর রূপকার বিভূতিভূষণ। তিনি জানতেন 'যে-জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাতে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মবাস্ত অগভীর জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দভরা সৌম্যজীবন লুকানো আছে— সে এক শাস্ত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্ডাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে; দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃততত্ত্বের পাত্রে, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্তজীবনের উৎসধারা—' তাই 'গার্হস্থ্য সমাজে যা খুব ঘোরতর সমস্তামূলক ও প্রয়োজনীয় ও উপাদেয়' তা তাঁর কাছে অত্যন্ত 'খেলো, রমণীয় ও অপ্রয়োজনীয়' মনে হয়। বিভূতিভূষণ 'আনন্দভরা সৌম্যজীবন'র সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই তাঁর হাতে প্রতিটি চরিত্র শেষ পর্যন্ত অগ্ৰ অর্থে দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাই সেই সময়ে যখন তারশঙ্কর প্রেমেন্দ্র বা মাণিকের গল্পে কুটিল, হিংস্র, লোভী, স্বার্থপর চরিত্রের অনন্ত মিছিল চলেছে তখন এঁদের পাশাপাশি থেকেও বিভূতিভূষণ কোন মানুষকে প্রকৃতির হাতের পুতুল ভাবতে পাবেননি। তাঁর কোন গল্পেই প্রকৃত অসৎ কেউ নেই; যারা আছে, তারাও অবশেষে ভাল হয়ে যায়। বিভূতিভূষণের ধারণা, কোন মানুষ খারাপ নয়, সকলেই আসলে সৎ, হয়ত কেউ কেউ পরিবেশের চাপে খারাপ হয়ে গেছে। তবে তারা সৎ মানুষ বা ভাল পরিবেশের সংস্পর্শে এলে পুনরায় শুদ্ধ হয়ে ওঠে। 'কিন্নরদল' গল্পে অকালপঙ্ক, ঝগড়াটে গ্রাম্য কুমারী শান্তি, যার বয়স মাত্র সতের, অথচ যে

তার মার বয়েশো মণ্টুর মার সম্পর্কে খুব সহজেই উচ্চারণ করে : 'কি ব্যাপক মেয়েমাহুষ ঐ মণ্টুর মা। ঢের ঢের মেয়েমাহুষ দেখেছি, অমন লকাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে নমস্কার, বাবা বাবা', সেই শান্তিও একদিন শ্রীপতির গুণবতী স্ত্রীর স্পর্শে আস্তে আস্তে বদলে যায়, সেও কখন যেন সবার অগোচরে খুব ভাল হয়ে ওঠে। 'মৌরীফুল' গল্পে ঝগড়াটে, খামখেয়ালী সুনীলাও একদিন কোন এক শহরবাসিনীর স্পর্শে হৃন্দর হয়ে ওঠে। শান্তি বা সুনীলাব মত চরিত্র বিভূতিভূষণের গল্পগুলোতে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। যে-কোন মুহূর্তেই এদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে। কিন্তু এরা ছাড়াও বিভূতিভূষণের গল্পে এমন অনেকে আছে যাদের সমাজ কোনদিন ভালবাসবে না, সমাজের কাছে যাদের চরিত্র নিন্দনীয়, তারাও বিভূতিভূষণের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়নি। শুধু তাই নয়, বিভূতিভূষণের হাতে পড়ে সেই সব চরিত্র শেষ পর্যন্ত সমাজের সহানুভূতি কেড়ে নেয়। 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পের নায়ক কৃষ্ণলাল যে ধরণের জীবন যাপন করে তা সমাজের চোখে নিন্দনীয় হলেও, কৃষ্ণলালের ব্যক্তিগত স্বহৃৎখ আমাদের অদ্ভুতভাবে স্পর্শ করে। এমনকি 'বিপদ' গল্পের পতিতা হাজুও বিভূতিভূষণের ভালবাসা পেয়ে অনগ্র হয়ে ওঠে। সমাজের চোখে পতিতাবৃত্তি গহিত হলেও হাজু নিজে এই পতিতাবৃত্তির মধ্যেই নিজের জীবনের চূড়ান্ত সফলতা খুঁজে পায়। যে হাজু একদিন পরের বাড়ি ভিক্ষে চাইতে গিয়ে লালিত হয়েছিল, সেই হাজু এখন নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা পিরিচে গ্রামের লোককে চা খাওয়ায়। এর জগ্রে পতিতাবৃত্তিকে বরণ করার হাজুর মনের মধ্যে কোন হৃৎখ নেই, কোন গ্লানি নেই। সে বরঞ্চ আনন্দিত। তাই বিভূতিভূষণ শেষ পর্যন্ত হাজুর পতিতাবৃত্তিকে নিন্দা করার মত ভাষা খুঁজে পান না। পৃথিবীতে পতিতাদের নিয়ে অনেক কাহিনী লেখা হয়েছে। কিন্তু এই গল্পের তুলনা নেই। এই গল্পের আঙ্গিক হয়ত খুবই দুর্বল এবং অপাংক্তেয় ; কেউই এটিকে সেজন্ত ভাল গল্প বলতে রাজী হবে না, তবে আঙ্গিকের কথা বাধ দিয়ে চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, এখানে হাজুকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থিত করা হয়েছে তার অভিনবত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যে পতিতাদের জীবনের কথা বলতে গিয়ে ঐচ্ছিক লেখক তাদের ভাগ্যাহত বিভূতি জীবনের নিষ্ঠুর পঙ্খিল দিকগুলোই সমাজের লামনে তুলে ধরার মানবিক প্রচেষ্টা

করে থাকেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ হাজুর মধ্যে বিড়ম্বিত জীবনের সন্ধান পাননি, বরঞ্চ তিনি হাজুর মধ্যে এক আনন্দময় জীবনের সন্ধান পেয়েছেন।

বিভূতিভূষণের ভালবাসা কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতির প্রতিও তাঁর ভালবাসা সমানভাবেই প্রবল এবং ক্রান্তিহীন ছিল। প্রকৃতির প্রতি বিভূতিভূষণের এই ভালবাসা তাঁর সাহিত্যকে স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করেছে। ‘কনে দেখা’ গল্পটি এই প্রকৃতি প্রেমের এক আশ্চর্য উদাহরণ। বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি চেতনাহীন পদার্থ ছিল না। তিনি এর মধ্যে এক দিব্য আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন।

এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, মহুয়েতের প্রাণীরাও বিভূতিভূষণের ভালবাসা পেয়েছে। ‘বুধীর বাড়ি ফেরা’ গল্পটিতে তার সার্থক প্রমাণ আছে।

চার

বিভূতিভূষণের কিছু গল্প আছে যা অলৌকিক বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। তাঁর মন মাঝে মাঝে এই দৃশ্যমান জগতের উর্ধ্বে আর এক জগতের রহস্য সন্ধানে উন্মুক্ত হয়েছে। সেই জগতের সন্ধান সকলেই পায় না। কেউ কেউ পায়। যারা পায়, সেইসব অল্প ছ’একজনকে কেন্দ্র করে বিভূতিভূষণ লিখেছেন ‘তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প’, ‘ভৈরব চক্ৰোত্তির গল্প’। অশরীরী আত্মাদের সম্পর্কে তাঁর কল্পনার পরিচয় এখানে পাওয়া যাবে। অশরীরী আত্মাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সন্দেহ পোষণ করলেও এই গল্পগুলো আশ্বাসন করতে কোন অসুবিধে হয় না। কারণ, পরিবেশ বর্ণনায় এমন অসাধারণ নৈপুণ্য আছে, যা আমাদের মনের ওপর এক ধরনের মোহস্রষ্টি করে। আর একথা সত্য যে কোনো লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অশিষ্টাশ্বাস যাই থাক না কেন, তা কোনদিন সাহিত্য-পাঠের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। কোনো নাস্তিককে কি রবীন্দ্রনাথ বা ক্লোদেলের কবিতাপাঠে বিমুগ্ধ করে তোলে? হেনরি জেমসের ‘দি টান’ অফ দি ক্লু’ কার না ভাল লাগে, যদিও সেখানে আছে অশরীরী আত্মাদের উপস্থিতি; হয়ত তাদের উপস্থিতি গভর্নেশেরই কল্পনা বা বিকার, তবুও এই অশরীরী আত্মাদের সন্দেহজনক উপস্থিতি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যায়।

শতভিষা

বিভূতিভূষণের এইসব গল্প আপাতদৃষ্টিতে তাঁর পটভূমি থেকে একটু বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই এগুলোকে আর বিচ্ছিন্ন বলে মনে হবে না। বিভূতিভূষণকে বারবার অজানা অদেখা জগতের রহস্য রোমাটিকদের মতই প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। আর এরই ফলে তাঁর নায়কেরা মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে। কিংবা বেড়িয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখে। তবে বিভূতিভূষণ সব সময় মর্তলোকের অজানা অদেখা জগতের রহস্য সন্ধানে তৃপ্ত থাকতে পারেননি। আর পারেননি বলেই অমর্তলোকের রহস্যের পথে তিনি থেকে থেকে যাত্রা শুরু করেছেন।

পাঁচ

বিভূতিভূষণের ছোট গল্পের শরীর তাঁর চরিত্রগুলির মতই সহজ, সরল এবং আড়ম্বরহীন। তাঁর গল্পে তেমন কাহিনী থাকে না, তেমন ঘটনা থাকে না। শুধু তাই নয়, তাঁর ভাষার মধ্যে তেমন তীব্রতা পর্যন্ত থাকে না। তাই কোন পাঠক হঠাৎ তাঁর গল্প পড়তে বসলে তেমন আকর্ষণ বোধ করবে না। প্রতি-মুহূর্তেই তার অস্বস্তি হতে পারে। কিন্তু একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাঁর গল্পের সারল্যে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। এই সারল্য তাঁর প্রতিটি গল্পের ও উপজ্ঞাসের প্রাণ বলা যেতে পারে। আর এখানেই বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্য। আজ যখন ছোট গল্প থেকে কাহিনী, চমকপ্রদ ঘটনা ও দীর্ঘ ভাষা নির্বাসিত, তখন কেন যেন বারবার বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়ে।

এখন অনেকেই বলতে পারেন, এই সারল্য বিভূতিভূষণকে যতখানি স্বতন্ত্র করেছে, ঠিক ততখানি দুর্বলও করেছে। কেননা, তাঁর নায়ক নায়িকারা এমন এক রূপকথার জগতের অধিবাসী যেখানে আধুনিক মানুষের বেঁচে থাকার ক্লান্তি নেই, যন্ত্রণা নেই, বিরক্তি নেই, সেখানে কেউ কাউকে ঈর্ষা করে না, ঘৃণা করে না, বঞ্চনা করে না, সেখানে সকলেই ভাল, খুব ভাল। কিন্তু তাই বলে তাঁর জগতকে কেন অনাধুনিক ও অবিদ্যমান বলে মনে করা হবে? কারণ, মানব-মনের জটিলতা দেখানোই আধুনিক সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। যদি হত তাহলে ‘দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী’ আধুনিক সাহিত্যে অসাধারণ গ্রন্থ হিসেবে

সম্মানিত হত না। আর সব থেকে বড় কথা, মানুষের প্রকৃত পরিচয় আজও মানুষের কাছে প্রাণ হয়ে আছে। কারো হাতেই তাঁর রহস্যের আবরণ উন্মুক্ত হয়নি। কেউই জোর গলায় বলতে পারেনা, এই হচ্ছে মানুষ, এই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। হয়ত মানুষ জটিল, হয়ত বা সরল, কিংবা উভয়ের অদ্ভুত মিশ্রণ। তবে বিভূতিভূষণ মানুষকে আর পাঁচটা লেখকের মত অবিশ্বাস করেননি, সন্দেহ করেননি ব'লে মানুষ তাঁর কাছে কোনদিন একটা জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। মানুষের প্রতি, মানুষের সত্যতার প্রতি তাঁর প্রবল বিশ্বাস ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের শেষদিকের রচনা ‘অন্তর্জাল’র কথা মনে পড়ে যায়। গল্পের নায়ক দীনদয়াল চক্রবর্তীকে অন্তর্জালী জগৎ ডুমুরদেহের ঘাটে আনা হয়েছে। দীনদয়াল একজন বিখ্যাত পাঁচালীকার ও কবিগান রচয়িতা। তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল অবিশ্বাস, ঘৃণা বা ক্রোধের মধ্য দিয়ে নয়, ভালবাসার মধ্য দিয়ে। তিনি বিখ্যাত কবিয়াল নবাই ঠাকুরকে ভালবাসায় আপন করেছিলেন। তারপর শুধু নবাই ঠাকুরকে নয়, একদিন সকলকেই তিনি এই একই মন্ত্রে জয় করেছেন। এবং তিনি যেমন মানুষকে ভালবেসেছেন, মানুষও তেমন তাঁকে ভালবেসেছে। এই ভালবাসাই ছিল তাঁর বেঁচে থাকার, তাঁর জীবনযাপনের একমাত্র অবলম্বন। তাই কবিরাজ মশাই যখন তাঁকে স্মৃতিকালভরণ দিতে উত্তত, তখন তিনি বাকরুদ্ধ হলেও মনে মনে বলেন: ‘তোমাদের সকলের ভালবাসাই আমার সবচেয়ে স্মৃতিকালভরণ... আমার আর স্মৃতিকালভরণে দরকার নেই, বাবা।’ বিভূতিভূষণেরও এই একই কথা। তবে আজ আধুনিক মানুষের কাছে বিভূতিভূষণের এই দিব্য উপলব্ধি অনেক দূরের, এমন কি অবিশ্বাস মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে নির্জন মুহূর্তে বিভূতিভূষণের এই অলৌকিক, অবিশ্বাস জগৎ আমাদের যে ভয়ংকরভাবে আকর্ষণ করে তা অস্বীকার করতে পারি না। এবং শুধু তাই নয়, সেই জগতের অধিবাসী হতেও আমাদের ইচ্ছে হয়। তাই বিভূতিভূষণের এই জগত যেন কিছুতেই মলিন হয়না, পুরনো হয়ে যায় না। সৃষ্টির স্বপ্নের মত সজীব থেকে যায়। আর এখানেই বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠত্ব।

সুরজিৎ ঘোষ

অভিনয় শিল্প : সত্যের স্মরণ সন্ধান

‘চাক-ভাঙ্গা মধু’ নাটকে বিভাস চক্রবর্তী যখন সাফাই গাইতে গিয়ে ভাঙা গলায় বাষ্প ছড়িয়ে বলেন “আমরা তো সেই সব দুঃখের কথাই বলিয়ে লাভিনী... আমরা তো সেইসব বেদনার কথাই বলি” তখন দ্বিতীয় বার দুঃখের পরিবর্তে বেদনা শব্দটির বিশিষ্ট উচ্চারণে ঐ আপাততুচ্ছ সংলাপ বা অভিনয়অংশটি যে গভীর মূল্যে মূল্যবান হয়ে ওঠে তাকে বোধহয় একমাত্র তুলনা করা যায় স্বাভাবিকের পর্দা ভেদ ক’রে অন্তরের লীলার উদ্ঘাটনের সঙ্গে। সাফাই কি আর তখন কেবল সাফাই থাকে, নাকি নিজের বানানো কথায় নিজেই কোন অদৃশ্য ক্ষতে খোঁচা খান শিল্পী আর তাঁর কুঁজো হয়ে জীবনযাপন, মূখের চটুল খেউড়, ছোট হয়ে আসা চোখের জমাট কান্নায় বদলে যায়, মঞ্চের উপর কয়েক মুহূর্তের জগ্ন দুঃখের বেদনা হয়ে যায়। ‘অভিনয়ের সত্য’ আমার কাছে এই রকম। মূলত তা চরিত্রগুলির সর্বাত্মক উপস্থিতির অন্তর্ভেদী জ্যোতস্নায় কিন্তু স্বভাবতই বিশেষ বিশেষ নাট্য মুহূর্তে বজ্রাহত গাছের মতো নিষ্কম্প, ধ্রুব।

বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক ততটাই যতটা কাদামাটি আর রঙের সঙ্গে প্রতীমার সম্পর্ক। শিল্পকে হয়ে ওঠার জগ্রে নির্ভর করতে হয় তার মাধ্যম উপাদান এবং প্রবণতায় উপরে যার সব কিছুই এক অর্থে লৌকিক অর্জন। কিন্তু এই সব থেকে উদ্ভূত শিল্প আসলে এর অনেক উপরে, উত্তীর্ণ হবার দাবী রাখে কোন লোকোত্তর বিমূর্তিতে। মাটির সত্য তার গঠিত হওয়ার মত কোমলতা, নির্মাণের সত্য তার ছন্দোময় শৃঙ্খলা, আর রঙ লাগানোর সত্য তাকে বোঝানোর ভঙ্গী; কিন্তু প্রতীমার সত্য এর কোনটাই নয়—তাকে দাঁধর হয়ে উঠতে হয়, প্রেমের অথবা পূজার। এই হয়ে ওঠা, অথবা কখনো বানিয়ে তোলাই শিল্প যদিও তার ভিত্তি বাস্তব পরিমণ্ডলেই প্রোথিত। ফলে তার সত্য বাস্তব সত্যের কোন নিহিত নির্ধারিত, যেখানে সারাজীবনের দুঃখকে কয়েকটি মুহূর্তের শরীরে বেদনার মত ঘন ক’রে বিগ্ৰস্ত করতে হয়।

পূর্ববর্ণিত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে তাদের মাত্রার প্রভেদে এক শিল্পের সত্যও আর এক শিল্পের সত্য থেকে পৃথক হয়ে ওঠে।

শিল্পের সত্য বলতে আমি তার উপস্থাপনা এবং বিষয় দুয়েরই নিবিড়তম সত্য রূপটির কথা বলছি। ফলে এ নিবন্ধের শিরোনাম 'অভিনয়ের সত্য' অথবা 'সত্য অভিনয়' যে কোন একটি রাখলেই তা একই অভীক্ষার পরিপূরক হবে এটা বলাই আমার উদ্দেশ্য। তবে অভিনয়শিল্পের সত্য উজ্জীবনের আগে আমাদের একটা পুরনো অথচ মৌল ভরু বিস্তারিত ভাবে সেরে নেওয়া দরকার যে অভিনয় আসলে কোন শিল্প কিনা। অভিনয়ের সত্যের যোগ্যতাকে আমি শিল্পিত মাপকাঠিতেই বিচার করেছি, ফলে অভিনয়কে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এই আলোচনার ভূমিকা না হয়ে প্রথম প্রামাণ্য বিষয়েরই মর্যাদা পাবে বলে আশা করি।

অভিনয়শিল্প

অভিনয়শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের বহুবার এই অস্থিস্থিতে পড়তে হয়েছে যে শিল্পীর জগৎ চিহ্নিত কোন সম্মানের অংশীদার তাঁরা হতে পারবেন কিনা। বিখ্যাত অভিনেতা কক্ল্যাঁ (Coquelin) বহুবার এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর প্রতিবেদনে তিনি অভিনেতাকে শিল্পী হিসেবে লেখক, চিত্রকর বা ভাস্করের সমান আসনেই বসাতে চেয়েছেন। সে সময় পর্যন্ত কোন অভিনেতাই 'coveted cross'-এ ভূষিত হননি, অবশ্য Re'gnier মঞ্চত্যাগ করে কন্জার্ভেটরীর শিক্ষকপদে বৃত্ত হলে সেই সম্মান পান। যে সংস্কারের বিরুদ্ধে কক্ল্যাঁ'র আবেদন ছিল, ১৮৮২ সালে তার অচলায়তন কিছুটা ভাঙে এবং তারপর থেকে অন্তরূপ সম্মানে অভিনয়-শিল্পীরাও ভূষিত হয়ে এসেছেন যদিও কক্ল্যাঁ সে পুরস্কার কখনও নেননি, না হলে মনে হতে পারতো যে তিনি ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থে লড়েছেন। তাঁর এবং তাঁর মতো অনেকেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিনয়বলার শিল্প হিসেবে মর্যাদালাভ। বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা তাল্মা (Talma)-র এটি অসাধারণ অভিনয়দৃশ্য বর্ণনা প্রদক্ষে কক্ল্যাঁ তাই আর্ভনাদ করেন... 'And you tell me that this is not art? Pray, tell me what it is, then'। অথচ সেদিনও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ-টিনকে সম্মান জানাতে গেলে 'ট্রেসর্ রোপার'-এর আপত্তি সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

শতভিষা

অভিনয়কে যারা শিল্প হিসেবে স্বীকার করেন না তাঁদের সমস্ত যুক্তির সারমর্ম সূত্রাকারে বিজ্ঞস্ত ক'রলে তা এইরকম দাঁড়ায় :

(ক) অভিনেতার প্রকাশের মাধ্যম তাঁর জীবন্ত দেহ যা সম্পূর্ণত তাঁর চিন্তা-নিয়ন্ত্রিত নয় বরং অধিক পরিমাণে অন্ধ ভাবাবেগের বশবর্তী। নিম্প্রাণ বস্তুর (যেমন ভাস্করের মাটি, চিত্রকরের তুলি) উপরে মাল্শের সচেতন পূর্ব-নিয়ন্ত্রণই শিল্পসৃষ্টি কবতে পারে, যে কর্তৃত্ব অভিনেতার নিজের দেহের উপর নেই। অবচেতন ভাবের খেলায় নিজের দেহ ব্যবহার করেন ব'লে অভিনেতা শিল্পী নন। (গর্ডন ক্রেগের মন্তব্য)

(খ) অভিনয়কে বিশ্বাসযোগ্য হতে গেলে জীবনের নিছক অনুকরণ করতে হয়। এই সূত্রে অভিনেতা মাছিমায়া কেবল ভিন্ন কিছু নন। কারণ জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কোন গভীরতর বোধ বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার সুযোগ অভিনেতার নেই। এ-প্রসঙ্গেও গর্ডন ক্রেগের একটি উক্তি লক্ষ্য করা যায় যেখানে অভিনয়ের শিল্পত্ব স্বীকার করবার জন্য তিনি বলেন 'The actor looks upon life as a photo-machine looks upon life ; and he attempts to make a picture to rival a photograph'.

(গ) নাট্যকর্মে পরিচালকের চিন্তাই সকল রকম ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে—সে ক্ষেত্রে কথার নির্ধারিত ভূমিকায় অভিনেতার শিল্পীমত্তার বিকাশের স্থান থাকে না।

(ঘ) যে চরিত্র-চিত্রণ অভিনেতার দায়িত্ব তা মূলত সৃষ্ট নাট্যকারের কল্পনা থেকে, অঙ্কের কল্পনাকে কণ্ঠে বা শরীরে রূপ দেওয়ার মধ্যে কোন শিল্প-গুণ নেই।

(ঙ) অভিনেতা তাঁর সৃষ্ট কোন কিছু, মূলত যা মুহূর্ত-সমষ্টি, মৃত্যুর পরে পিছনে রেখে যেতে পারেননা—এখানেই অভিনয়ের শিল্প হয়ে ওঠার প্রতিবন্ধকতা।

উপরের 'এই সব সমালোচনার প্রথম প্রতিজ্ঞা দু'টি নিদারুণভাবে ভ্রান্ত। এ-গুলি কেবল তাঁদের দ্বারাই উচ্চারণ সম্ভব ব'লে মনে হয় যাদের অভিনয় করা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নেই। কিন্তু এই দলে গর্ডন ক্রেগ জাতীয় সমালোচক-রাও পড়েন ব'লেই এ অভিযোগেরও উত্তর দেবার প্রয়োজন আছে। প্রথমত,

শিল্পপ্রসঙ্গে সচেতন অবচেতনের তর্ক একান্ত পরিমাণে পুঁথিগত এবং প্রকৃত-পক্ষে অবচেতনের প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে এড়ানো অসম্ভব—অবাস্তবিক বটে। তবে তাকে নির্দিষ্ট শিল্পরূপ দিতে গেলে সচেতন বিশ্বাস প্রয়োজন এবং নিত্যন্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই শুধু বলতে পারেন যে অভিনেতার দেহের উপরে তাঁর শিল্পী-মনের সচেতন প্রভুত্ব থাকে না। প্রকৃতপক্ষে অভিনেতার ভিতরে সর্বদাই একটা দ্বৈত সত্তা কাজ করে। স্ব-দেহই তাঁর শিল্পের প্রকাশ-মাধ্যম হওয়ায় তাঁকে প্রতিনিয়তই একটি দুরূহ কাজ করতে হয়—নিজের সত্তার দ্বিধাকরণ। তাঁর প্রথম সত্তা যন্ত্রী, দ্বিতীয় সত্তা যন্ত্র। প্রথম সত্তা দিয়ে তিনি নিজেকে **অভিনেয় চরিত্রটির মতো ক'রে বোঝেন** এবং দ্বিতীয় সত্তা দিয়ে সেই বোধকেই প্রকাশ করেন।

এক অর্থে প্রথমটিই সত্তা, যে দেখে, সে প্রভু এবং দ্বিতীয়টি দেহ, যে প্রকাশ করে, সে ক্রীতদাস। এই ক্রীতদাস প্রভুর যত বাধ্যের প্রভু তত তাকে দিয়ে আরক কাজটি করিয়ে নিতে পারেন। ভাবাবেগ নয়, এই তাঁর অহত্ব এবং বোধশক্তির সচেতন কর্তৃত্বই অভিনেতার স্ব-দেহকে চালনা করে। উপরন্তু প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে ঠিক ঠিক লক্ষ্য তাকে দিয়ে তামিল করানোর জন্য সেই দেহকে নিপুণভাবে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হয়—কক্স'রা যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'The ideal would be that the second self, the body, should be a soft mass of sculptor's clay, capable of assuming at will any form' এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ অভিনেতার সচেতন এবং পূর্ণ মনোযোগী দেহ ও মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণক্ষমতার বিষয়ে স্তানিস্লাভস্কি এতবার বলেছেন যে মেথড্ অভিনেতাদের অভিনয় রীতির বিষয়ে সামান্য উৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন সেই আর্থবাক্য :

প্রত্যেক অভিনেতা তাঁর অঙ্গভঙ্গীকে এমন ভাবে সংযত করবেন যে তারা

তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন হবে, তিনি তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন না।

এই সংঘর্ষের তারতম্যেই অভিনয় পরিণত হয় অতি অভিনয়ে অথবা পর্ধবসিত হয় আড়ষ্টতায়। তবে প্রকৃত অভিনেতার যে এই সংঘর্ষক্ষমতা পূর্ণমাত্রাতেই থাকে তা তো বারংবারই দেখা গেছে। প্রসঙ্গত আমার নিজের দেখা একটি অভিনয়রঙ্গণীর কথা মনে পড়ছে। বহুরূপী 'রাজা অয়দিপাউন'

—একটি তীব্র উত্তেজনারিদ্ধ মুহূর্তে শত্ৰু মিষ্ট্রের আগ্রুত অভিনয়ের মধ্যে হঠাৎ লোড্-শেডিং হয়ে গেল। ব্যবহাপত্র করতে মিনিট পনেরো কেটে গেল। পর্দা আবার সরতেই একই ভঙ্গিমায় গুস্ত শত্ৰুবাবু স্বরগ্রামের একই স্কেল থেকে এবং একেবারে খণ্ডিত অংশটির প্রাণকেন্দ্র থেকে অভিনয় শুরু করলেন—যেন এর মধ্যে কোন সময়ের ফাঁক ছিল না, কোন ঘটনার এলোমেলো ধাক্কা ছিল না।

একি স্ব-দেহের (এবং অহুভূতিরও) উপরে সচেতন প্রভুত্ব ব্যতিরেকে সম্ভব? Max Reinhardt অভিনেতাকে তাই ভাস্করের সঙ্গে তুলনা করেছেন—‘The actor’s power of self suggestion is so great that he can bring out in his body not only inner and psychological change, but even outer and physical changes’। মনে রাখতে হবে চিত্রকর বা ভাস্কর যখন তাঁর মানস-অবয়বকে আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে নির্মাণ করতে পারেন তখনই তাঁর সৃষ্টি সম্পন্ন, তাঁর কাজ শেষ। কিন্তু অভিনেতাকে তাঁর নিজেরই তৈরী মূর্তির ভেতর ঢুকে পড়তে হয়, তার সাথে সাথে হাঁটতে হয়, কথা বলতে হয়, হাসতে হয়, কাঁদতে হয়, এবং সেটা ঐ ছবির ফ্রেমের ভেতরে থেকেই—সেই ফ্রেম হলো মঞ্চ। অভিনেতার শিল্প-মাধ্যমের উপর তাঁর আত্মকর্তৃত্ব সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের স্বোপাজিত প্রত্যয়কে সম্পূর্ণ নস্যাত্ন করে তাই বলা চলে না যে অভিনেতা নিজের ভাবাবেগ বা দৈবের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। আর শুধুমাত্র মাধ্যমের বিচারে শিল্পের বিচার হয় না। নিজের দেহ-শিল্প-মাধ্যম হতে না পারলে নৃত্য এমনকি সঙ্গীতও এক অর্থে শিল্পের তালিকা থেকে খারিজ হয়ে যায়। আর যদি স্বরকার বা নৃত্য-উদ্ভাবককেই কেবল সঙ্গীত বা নৃত্যের ক্ষেত্রে শিল্পীর মর্যাদা দেওয়া হয়, সঙ্গীতের বা নৃত্যের হৃন্দর বা কুৎসিৎ উপহাপনাকে কেবলই গুলিয়ে ফেলা হয় যন্ত্রের পটুতা বা অপটুতার সঙ্গে তবে দুঃখের সঙ্গে সে জাতীয় সমালোচকদের মনে কারিয়ে দিতে হয় যে কারিগর শিল্পী নন ঠিকই কিন্তু শিল্পীমাত্রেরই একটি কুশলী মিস্ত্রী-সন্তা থাকা প্রয়োজন। তবে কেবল সেই সন্তাটুকুকে বিচার করেই যদি কেউ তার শিল্পীত্ব অস্বীকার করতে চান তবে তাহবে সর্কার্ণতারই নামাস্তর। শ্রেষ্ঠ গায়ক, নৃত্যশিল্পী বা অভিনেতা ব্যাকরণের মধ্যে থেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রের সাধারণদের তুলনায় যে ভিন্নতা প্রকাশ করেন তা শুধু কুশলতা-

ভিত্তিক নয়, সে প্রভেদ কিছু ভিন্ন জাতের, সৃষ্টির ছোঁয়া লেগে থাকে তা'তে । ভারতীয় রাগসংগীত ও নৃত্যকলার অন্তরঙ্গী ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে ভাব ও রসের বিভিন্নতা কি ভাবে শিল্পীর কণ্ঠে বা শরীরে নিজস্ব শিল্পচিন্তায় স্থানীয়কৃত হয় । ভারতীয় নৃত্যকলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন মূদ্রার বা ভঙ্গীর সাহায্যে যে সব ভাব বা রসসৃষ্টি হয় তাদের সূক্ষ্ম প্রভেদ ঘটে আকার, তাৎপর্য বা গতি-প্রকৃতির বিভিন্নতায়—নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরত যার জন্ত পুরোপুরি অভিনেতার ব্যক্তিগত বিচারে নির্ভরশীল । লক্ষ্যনীয়, আমরা 'বিচার' শব্দটি ব্যবহার করছি কারণ এই সূক্ষ্ম পার্থক্য তাঁর সচেতন বোধেরই প্রতিফলন, ভাবাবেগের নয় । আর অভিনয় মূলত নিজ-শরীরে নৃত্য, সঙ্গীত এমনকি ভাস্কর্যেরও প্রকাশ—তাই সমষ্টিগত প্রাচ্য নৃত্যের চৈতন্য অবলম্বন ক'রে 'আরতো' উদ্ভাবন করেন নতুন নাট্যশৈলী, 'থিয়েটার অব ক্রুয়েল্টি' । আসলে অভিনেতা শরীরকে ভাষা দেন, মুখের ভাষার ব্যবহৃত বিবর্ণ প্রতিলিপি যেখানে পৌঁছয় না সেখানে দেহের অনেক সদ্য-আবিষ্কৃত ভাষা পৌঁছে যায়, কারণ তুলনায় অনধিগত সেই ভাষা স্বচ্ছল ব্যবহারে পাণ্ডুর হয় না ।

পূর্বোক্ত সমালোচনাগুলির দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে আমার মূল আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক দুই মেরুতে অবস্থিত দু'টি নক্ষত্রের মতো সূদূর । অভিনেতা বাস্তবের ফটোগ্রাফ, যাকে পরিবেষণ করেন বা সেটাই তাঁর জীবনদর্শন একথা মান-বার মত কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না । আর শিল্পের সঙ্গে বাস্তব কতটা অধিত—এ প্রশ্নের কোন শেষ জবাব কি কেউ পেয়েছেন ? শুধুমাত্র বাস্তব-বর্জিত হওয়াই কি শিল্পের প্রধান লক্ষণ নাকি ? অথবা বাস্তবের ছোঁয়া লাগায় গর্কির "মা" শিল্পগুণ থেকে বিচ্যুত ? আসলে এই মাপকাঠিগুলোই ভুল দোকান থেকে কেনা, ভুলভাবে । কোথায় ব্যবহার করব না কেনেই তাদের ঘরে আনা হয়েছিল; এখন তাই যত্র তত্র লাগিয়ে দেওয়া । আসলে বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, নিছক বাস্তব থেকে উত্তীর্ণ হওয়াই শিল্পকর্ম; অভিনেতাও তাই করেন । যে-কোন শিল্পের মাধ্যম, উপাদান আর প্রবণতা সবই তো বাস্তব কেবল সব মিলিয়ে প্রকাশিত যে সৃষ্টি তা বাস্তব হয়েও বাস্তবোত্তীর্ণ । তবে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয়, কেন না প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বা প্রকৃতি-প্লাবী শিল্পের জন্মদানের যন্ত্রণাও প্রকৃতিসৃষ্টি এবং শেষ অবধি সেই সৃষ্টিকাণ্ডও প্রকৃতিতেই ন্যস্ত । তবে অভি-

নেতা যে মঞ্চে এসে শুধু চারপাশের দৈনন্দিন জগতের খবর দেন না, বা ‘আপনি কি ফুল ভালবাসেন’ জাতীয় স্বাভাবিক প্রশ্ন সহজভাবে ক’রে দেখান না, সে বিষয়ে যে কোন দৃষ্টিবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি একমত হবেন। আসলে জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই অভিনেতা তাঁর অভিনীত চরিত্রের মধ্যে ধারণ করবার চেষ্টা করেন। বাস্তবে ঐ চরিত্রেরা কিভাবে চলাফেরা করে বা তিনি ঐ পরিস্থিতিতে থাকলে কি ক’রতেন তার প্রকাশই তো শুধু আর অভিনয় নয়। অর্থাৎ পুতুল হওয়া নয়, পুতুলের খোলশ গায়ে দিয়ে নিজের সচেতন খেলা যার মধ্যে পুতুল হিসেবে বিশ্বাস-যোগ্যতা আর মানুষের দৃষ্টি-ক্ষমতা দুই-ই থাকবে—মানে আত্মবিলোপ নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ; জীবনের প্রতিলিপি নয়, সামঞ্জস্য বজায় রেখে তার প্রধান প্রয়োজনীয় (পরিবেশের দাবী অনুযায়ী) বৈশিষ্ট্যগুলিতে এমনভাবে আলো ফেলা যাতে তাদের নিজস্ব রঙ বিশেষ তাৎপর্য পায়, যে তাৎপর্যে আকাশ আর পাহাড়, ধরিত্রী আর সমুদ্র, ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে এক অপরিহার্য যোগ-নৃত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই আলো প্রক্ষেপের ক্ষমতাই অভিনেতাকে সামান্য নকল-নবীশ থেকে এমন এক শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত করে যে আমরা আরও গভীর ও প্রবল ভাবে তাঁদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

নির্দেশক বা নাট্যকারের হাতের পুতুল অভিনেতার স্বতন্ত্র শিল্পী-সত্তার উন্মেষ হ’তে পারে না—এই দু’টি নৃত্যই অভিনয়ের শিল্পত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো অভিযোগ। সেই প্রসঙ্গে আবার বলতে হয় যে অভিনেতার ভিতরের কারিগরটুকুই সব নয়, শ্রষ্টার ভূমিকাও বিরাট। জীবন সম্পর্কে কোন না কোন অভিজ্ঞতার সঞ্চার করা যদি অভিনয় হয় তবে প্রথর কল্পনা-শক্তির অভাব ঘটলে অভিনেতা নির্দেশকের পুতুল হবেনই। কিন্তু যিনি ভাবতে জানেন? তিনিই কেবল ভাবতে জানেন বা পারেন লাদা-সাপ্টা পর্দা চকিতে খুলে দিয়ে ভিতরের অপূর্ব সংগ্রহ দেখাতে। এই কল্পনাশক্তিকে চরিত্রচিত্রণে অবশ্য যেমন তেমন ক’রে কাজে লাগানো যায় না, তার অন্ত প্রয়োজন স্থানিসল্লাভ-বর্ণিত “Triumvirate”-এর, “feeling” “will” এবং “mind”-এর সমন্বয়ে যা গঠিত। ইচ্ছাশক্তি ব্যতিরেকে অভিনেতা পরিচালকের হাতের পুতুল হ’তে পারেন, নচেৎ নয়। আর feeling এবং mind-কে মেশাতে হবে বড় সন্তর্পণে যাতে এই সম্পূর্ণ

ভাবসাম্য বজায় থাকে। এই মতের সমর্থন শুধু স্তানিস্লাভস্কি নয়, আর-উইন পিস্কাভর-এর কথায়ও পাওয়া যায় :

“In this unity of reason and emotions, of spirituality and affection and sensation—the actor will discover his creative genius for the stage—the art of acting.”

যদিও ঐ sensation-এর ব্যাপারে আপত্তি আছে দিদেরো (Diderot)-র বা ককল্যার, আবার হেনরী আরভিং বা সালভিনির মতে feeling-ই অভিনয়ের প্রধান স্থান জুড়ে আছে। আমার নিজস্ব ধারণা, অভিনেতার হৃদয় ও বোধের সুষম বিজ্ঞান প্রথর কল্পনাশক্তির দ্বারা সৃষ্টভাবে তড়িত হলেই তাঁর পক্ষে সার্থক সত্য অভিনয় করা সম্ভব, নতুবা নয়। সেই অভিনয় নির্দেশকের এবং নাট্যকারের জলন্ত উপস্থিতিতেও স্বতন্ত্র স্বাধীন শিল্প। তবে স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার নয়। একটি নাটকে অনেক চরিত্র, তার উপর আছে অনেক রকম যান্ত্রিক ঘোগবিয়োগ যার সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা থাকে পরিচালকের মাধ্যম। মনে রাখতে হবে যে নির্দেশকের ব্যবহৃত উপাদানগুলির মধ্যে একটি প্রচণ্ড মানবিক, সেটি অভিনেতা যিনি ভাবতেও জানেন। সম্পূর্ণ মাঠের স্বত্ব পরিচালক বিভিন্ন সত্তার সীমানা নির্দেশ ক’রে দেন, স্বক্ষেত্রে সেই সত্তার সত্য এবং প্রকৃত উজ্জীবনই অভিনেতার শিল্প। নিয়ন্ত্রণাধীন থেকেও স্বকীয় শিল্পের বিকাশই তাঁর আর্ট-ফর্মের প্রধান দায়িত্ব। আর নাট্যকার—তাঁর সঙ্গে অভিনেতার কোন সম্পর্ক? সেখানেও তো ঐ “অধীনতা—স্বাধীনতা”র প্রশ্ন। যে চরিত্রটি মঞ্চের উপর সৃষ্টি করা অভিনেতার শিল্প-দায়িত্ব, তার মূল সৃজন তো নাট্যকারের কল্পনা থেকে। নাটকের পরিবেশ ও সংলাপও তো নাট্যকারেরই সৃষ্টি। তাহ’লে অভিনেতার শিল্পী-সত্তার প্রকাশ কোথায়? প্রত্যেক শিল্প-মাধ্যমই এমন একটা প্রকাশ ভঙ্গীর বা সম্পূর্ণতার দাবী রাখে যা অত্র আর কোন মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অভিনেতাও সেই রকম তাঁর আঙ্গিক বা বাচিক ভঙ্গীর সাহায্যে বা তাঁর সত্তার প্রতিফলনে, নিজস্ব অভিক্ষেপণে এমন মুহূর্ত বা সংহতি সৃষ্টি ক’রতে পারেন যা কেবলমাত্র নাট্যকারের লেখ্য প্রকাশ পায় না এবং সেই কারণেই অভিনয় একটি স্বতন্ত্র শিল্প। শুনেছি “আমার সাজান বাগান তুলিয়ে গেল”

—এই সংলাপটি গিরিশচন্দ্র, দানীবাবু এবং শিশিরবাবু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আবেগে ব্যক্ত করতেন—কিন্তু তাঁদের ঐ সূক্ষ্ম জটিল প্রভেদটা যে কী তা নিছক সংলাপটিকে লক্ষ্যবাহু পড়লেও বোঝা যায় না। অথবা ‘দশচক্র’ নাটকে শম্ভুবাবু যে ভাবে ‘মেজরিটি’ শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে এক জটিল আবেগ-প্রবাহ সৃষ্টি ক’রতেন তা যঁরা! ধেখেননি, তাঁদের কি ভাবে বোঝাই? ভাষাকে ছাড়িয়ে এই উদ্ভরণ এবং তার ব্যবহারই অভিনয়শিল্পের একটি মহৎ লক্ষণ। কিংবা ‘রক্তকরবী’ নাটকে বেদীর উপরে দাঁড়ানো সর্দারের ভঙ্গী এবং বিভিন্ন স্তরের চরিত্রদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গীমার সামান্য বদলদলে অমর গাঙ্গুলী স্পষ্ট ক’রে দিতেন তাঁর সর্দারের বিচিত্র ডাইমেনশ্যান্সুলিকে—এগুলো তো নাটকটা কেবল প’ড়ে বোঝবার নয়। আবার একই চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতা / অভিনেত্রীর সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ পেয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্তও অনেক। এই তফাতের কারণ শিল্পীর অন্তর্স্থিত গভীর সত্তার উপলব্ধির বিভিন্নতা, যার ফলে একই প্রাকৃতিক জগৎ ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর চোখে ভিন্ন রূপাবয়ব ধারণ করে। আসল কথা ঐ সম্পূর্ণতা, শিল্পের প্রধান কথা ঐ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা। তার জন্য নাট্যকারের প্রয়োজন হয় অভিনেতা বা নির্দেশককে তেমনি অভিনেতারও প্রয়োজন হয় নির্দেশক বা নাট্যকারের যেমন নির্দেশকের প্রয়োজন নাট্যকার, অভিনেতা প্রভৃতির। অর্থাৎ এঁরা নিজেরাই কখনো শিল্পী, কখনো বা উপকরণ। এই সমষ্টিগত শিল্প-মাধ্যমের ভেতরেও নিজের সৃষ্টি-মুহূর্তে একাকী হন শিল্পী-অভিনেতা—কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে কোথাও সেই বৈশিষ্ট্য ছন্দ-চ্যুতি ঘটায় না—এই অথগুতাই অভিনয়ের শিল্পগত উৎকর্ষতার বিচার। অর্থাৎ কাঠামোটা নাট্যকারের, তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিকল্পনা নির্দেশকের আর সূক্ষ্মসব রঙের কাজ অভিনেতার। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ এবং বিশিষ্ট। শ্রেষ্ঠ নির্দেশক স্তানিস্লাভস্কি অভিনেতাকেই প্রকৃত শিল্পী বলেন যার কাছে তাঁর প্রত্যাশা অপরিণীম এবং শিল্পী বকেই সে দাবী যেটানো অভিনেতার পক্ষে সম্ভব (it demands too much of the actor, but then it is the actor who is a true artist Stanislavsky had in mind. And one can never demand too much from an artist—David Magarshack : Stanislavsky on The Art

of the Stage)। সেইজন্যই বারবেঙ্কে মনে রেখে শেক্সপীয়র নাটক লিখেছেন। অভিনেতার বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সৃষ্টি হয়েছে King Lear's fool-এর, ফোর্বস-রবার্টসনের জন্ম বার্ণাভুশ লিখেছেন তাঁর 'সৌজার ও ক্লিওপ্যাট্রা' নাটক, হেলেনে হ্লাইগেলকে মনে রেখে যেমন অসংখ্যবার স্বেণ্ট। আবার ইংলেণ্ডে যখন নাট্যকারের অভাব তখনো শেক্সপীয়রের নতুনতর প্রযোজনায় ভিতর দিয়ে মুক্তি লাভ করেছেন বিখ্যাত অভিনেতারা। আসলে পরম্পরের শিল্পকর্মের সম্পূর্ণতা ও অপরিহার্যতার বোধই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বা নির্দেশককে পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধাভাজনে সাহায্য করেছে।

একটি সৃষ্টিকর্মকে অতিক্রম বা বিকৃত না করেই তাই অভিনেতা আর একটি শিল্পরূপে উত্তীর্ণ হতে পারেন, পূর্বতনটিকে কেবল উপকরণের মতো রেখে। সমষ্টিগত নাট্য-শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অভিনয়ের শিল্প-গরিমা প্রসঙ্গে আরও একপা অগ্রসর হয়ে Max Reinhardt বলেছেন "It is to the actor and to no one else that the theatre belongs" যে মতের সমর্থন পাওয়া যায় গ্রেন্ডিল্ বার্কারেও। আমি অবশ্য আমার ব্যবহৃত পূর্বতন গাঢ় বাক্য-বস্তুটিতেই সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসী। আসলে প্রকৃতির সৃষ্টি-রহস্যের নিয়ন্ত্রণে থেকেও তো বিভিন্ন সত্তা স্বতন্ত্র শিল্পসৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃতির অখণ্ড harmony তা'তে নষ্ট হয় না। আবার তার কোলে স্তম্ভ থেকেও মাহুঘের সৃষ্টি 'দ্বিতীয় ভূবন রচনার' গৌরব পায়—নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও এই যে স্বতন্ত্র নির্মাণ, হয়ে ওঠা, তাকেই যদি আলোচ্য মাত্রায় দেখি নিয়ন্ত্রণাধীন অভিনেতার শিল্পী-সত্তার স্বরূপে, তবে পরিচালক ও নাট্যকারের প্রকৃত সার্থক উপস্থিতিতেও একজন সত্য অভিনেতার শিল্পীত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সবশেষে আসে স্থায়ীত্বের প্রশ্ন, পিছনে রেখে যাওয়ার প্রশ্ন। কিন্তু সেটা কি কোন প্রশ্ন? স্থায়ীত্বের বিচারে কি খারিজ করে দেওয়া যায় কোন সৃষ্টি, যদি বা সে হয় কয়েক মুহূর্তের! সমস্ত শিল্পকর্মই নশ্বর। কবিতা অথবা ছবি, শব্দগীত অথবা ভাস্কর্য কে তাড়াতাড়ি করে? হায়, সে কেবল আগ-পরের কথা, কয়বেশী একই নশ্বরতা। শিল্পসৃষ্টি এক জিনিষ, স্থায়ীত্ব আর এক। কাগজের চেয়ে পাথরে লেখা টেকে বেশী, কিন্তু কতদিন? অনন্ত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সবই একদিন লুপ্ত হয়। "আজ থেকে দুশো কোটি বছরের পরে, আমাদের স্মৃতি নিভে যাবে"—তখন?

শতভিষা

শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ক্ষমতায় অভিনেতাও পিছনে কিছু রেখে যান— তাঁর রীতিপ্রকরণ এবং সত্য মুহূর্তের স্মৃতি। স্মৃতি হয়ত কখনো-কখনো উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়। কিন্তু শেষ অবধি সেই এক অমোঘ বিচারক। আজ যদি প্রাকৃতিক খেয়ালে নষ্ট হয়ে যায় অজন্তার সব ভাস্কর্য তবে কি তার শিল্পত্ব মুছে যাবে? যতদিন বাঁচি মনে থাকবেনা তার স্মৃতি, তাকে দেখার অভিজ্ঞতা?

কক্ল্যাঁ সখেদে বলেছেন :

“Suppose that, as the result of a natural and fatal law, at the moment that Michelangelo died, by the same stroke of an invisible hammer, death had reduced to powder all his works, from the Moses to the Last Judgement : because the work and the workman perished at the same instant should you say, “Michelangelo was no artist, he did not create ?”

অভিনেতার সৃষ্ট অবয়ব বা মুহূর্তও তাঁর সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, এ তাঁর শিল্প-মাধ্যমের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক দিক। কিন্তু এ কেবল দুর্ভাগ্য, শিল্প হিসেবে কোন ক্ষতি নয়।

কবি অথবা চিত্রকর অপেক্ষা করতে পারেন ভাবীকালের জন্ত যে তাঁর সত্যের রূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, অভিনেতা সেটুকুও পারেন না। সমসাময়িকের তাঁর আন্দোলিত করতে হবেই, সত্যের শুদ্ধতায় দর্শকে উন্নীত করার দায় তাঁর এই মুহূর্তেই। বহমান সময়প্রবাহের একটি মুহূর্তের মধ্যে চিরন্তন সময়কে ধারণ করবার এবং করবার কঠিন মূল্য অভিনেতাকেই শোধ করতে হয়, এই তাঁর নিয়তি। তাঁর এই ভাগ্যলিপির স্মরণে আমরা দুঃখান্বিত হই যত, তত বেশী ভালবাসি তাঁকে আর সময়-সাগরের পার থেকে ভেসে আসা সম্মিলিত দর্শকের গ্রহণে বিশাল এই অভিনন্দনের প্রতিধ্বনিই অভিনয়শিল্পকে অবিনশ্বর করে তোলে।

সত্যের সন্ধানে

অভিনয় তা হলে একটি শিল্পকলা। তবে এ শিল্পের সত্য কোথায়? সমস্ত মহৎ শিল্পের মতোই তার সত্য হচ্ছে ঐচ্ছিক; সেইখানেই তার সার্থকতা। এই

শতভিষা

শিল্প এক অখণ্ডতা, যেখানে সৃষ্টির উপাদান অভিনেতার অবয়বে রূপ পরি-
গ্রহ করে আরও বড় কোন সত্যের প্রকাশলীলায়। এই রূপময় প্রতিচ্ছবি,
এই গ'ড়ে তোলা বা হয়ে ওঠাই অভিনয়ের সত্য। কিন্তু কেমন ক'রে সম্ভব
হবে সেই সামগ্রিক সত্য অভিনয়? তার জন্য অভিনেতাকে প্রস্তুত হতে হয় প্রতি-
মুহূর্তে। অভিনেতার যন্ত্র তো তিনি নিজেই। কাজেই এই প্রস্তুতি যন্ত্র ও যন্ত্রী
উভয়েরই যত্নরূপ না তিনি নিজেকে দিয়ে সম্পূর্ণ করছেন নিজেসই সৃষ্টিকর্ম।
এঁর জন্য তার দ্বিতীয় সত্তা, ঐ যন্ত্রকে তাঁর মার্জনা ক'রতে হয়, গঠন ক'রতে হয়
সত্য অনুভবকে, ধরবার কাজে। সে মার্জনা কঠোর কৌশলে, শরীরচালনার
অভিনবদ্যে, নৃত্য-শিক্ষায় এবং ভাস্করের মত নিজের দেহকে নানান ভাঙচূরের
ভেতর দিয়ে নানান রূপ দেওয়ায়। আর তাঁর দেখার চোখে অভিনয়ের চরিত্রের
একটা পূর্বনির্ধারিত ধ্যানরূপ আঁকা থাকে যাকে বাইরে এনে দেখা এবং দেখানোই
তাঁর কাজ। সেই সত্যের সৃষ্টিতে তিনি বিধাতার প্রতিদ্বন্দী।

সুনেতে খুব বড়ো বড়ো লাগছে? বড়োই তো, তবে ফাঁকা নয়। শিল্প-
সত্যের realisation এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। প্রকৃতির স্বাভাবিক বিস্ময়ও
তার কাছে স্নান হয়ে যায়। কারণ প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে ক্ষুদ্র মানবকের
এ এক অপরিদায় চ্যালেঞ্জ—‘দ্বিতীয় ভূবন রচনার অধিকার’। অভিনেতার
ব্যক্তিত্ব প্রকাশের তাগিদে বহিরঙ্গ ঘটনা বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়। তাঁর শিল্পীসত্তা
ব্যবহারিক সংগতিক হুমড়ে-মুচড়ে নানান মাপে ফেলে দেয় যার বিভিন্ন বিচ্ছাদে
সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন ডাইমেনশনের। কোমলে-মধুরে মেশানো সেই প্রচণ্ড
অভিনয় আমরা দেখেছি যখন ‘আজ বসন্ত’ নাটকে পার্কে চক্কর-খাওয়া আত্ম-
কালের বৃড়ো হঠাৎ ‘হ্যাম্লেট’ নাটকের কবর খোঁড়ার দৃশ্য চলে যান। কার জন্য,
কেন এই কবর খোঁড়া! এই জটিলতা যখন তীব্র হ'য়ে ওঠে তখনই হঠাৎ
চকিতে দেখা যায় অন্ত এক বিজন ভট্টাচার্যকে ধীর ঝাঁকানো চুলের রাশি
শনের মত মাথার উপর থেকে ছ'গালের পাশে ঝুলে পড়ে আর অজুত এক ভাঙা
গলায় তিনি নিয়তির মত হঠাৎ উচ্চগ্রামে এক চিংকার ক'রে ওঠেন :

“মরণেরে তুঁছ মম শ্রাম সমান

মেঘবরণ তুমি মেঘ জটাজুট.....”

তখন আমরা সেই মরণ, তাঁর মেঘবরণ শ্রামরূপ, বিজন ভট্টাচার্য, পার্কের বৃড়ো

এবং 'হাম্লেট' নাটকের কবর-খোঁড়া লোকটিকে এক শরীরে মূর্ত দেখতে পাই। এই সেই সত্য যাকে আমি বিধাতার অধিকারে প্রাতিবন্দ্য বলেছি।

এই রূপবিশ্বাস, এমন বিভিন্ন স্তরে, সম্ভব হয় শুধু তাঁরই পক্ষে যার অভিজ্ঞতায় রয়েছে বহু বিচিত্র উপলব্ধির বোধ। অভিজ্ঞতা যার সীমিত, উপলব্ধির প্রয়াস যার কম, কল্পনার সীমা তার কতটুকু? বোধি তাকে, তাই বড় একটা সাহায্য করে না। অভিনেতাকে তাই শিক্ষিত হতে হয়। এই শিক্ষা শুধু তাঁর অন্তঃস্থ যন্ত্রের পরিশীলন নয়। এই শিক্ষার মাপজোক করা যায় না অভিনেতার বহিরঙ্গ-প্রকাশে। জীবনের অন্তর্লীন এই শিক্ষায় শিক্ষিত হ'লে অভিনেতা বুঝতে পারেন জীবনের উপরিভাগের জলন্ত অস্তিত্বটাই সত্য নয়, সত্য তার ঘরের দিকের মুখ, ভেতরতলার অন্তর্গত টান। উপস্থিত সত্য থেকে নিহিত সত্যের বিচরণেই অভিনয়ের সত্য প্রকাশ; যার ব্যাপ্তি গভীরতার সঙ্গে অস্থিত, ফেনিল আবেগের উচ্ছ্বাসী স্বতোৎসার নয়। অভিনেতাকে তাই সং হতে হয়। এই সত্যতা তাঁর অমুত্তরের কাছে, জীবনোপলব্ধির কাছে, তাঁর আত্মার কাছে, রসদৃষ্টির কাছে। না হলে কোন সার্থক রসস্থিতিও তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এ তো কোন দৈব দুর্ঘটনা নয় যে তিনি অবস্থার চাপে প'ড়ে অভিনয় ক'রতে আসেন। এ তো সম্ভ্রমে নিজেকে ত্রুণবদ্ধ করা, যে আনন্দময় যন্ত্রণা-ভোগের মহৎ অধিকার শিল্পীকে শিল্পী ক'রে তোলে। জীবনের এবং নিজস্ব শিল্প-মাধ্যমের প্রতি এই সত্য-দৃষ্টিই তাঁকে তাঁর অভিনয়ে চরিত্র বা পরিবেশের পক্ষে বিশ্বস্ত হ'য়ে উঠতে সাহায্য করে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত অভিনেতা তাই প্রথমেই জানেন :

ক) শিল্প বলতে তিনি কি বোঝেন? কেবল অমৃতদের চেয়ে নিজের একটি সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য অর্জন নয়, যে স্থিতির বেদনা তাঁকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করে তারই ব্যক্তিত্বময় প্রকাশ।

খ) কেন তিনি তাঁর মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন অভিনয়কে এবং কতটা কষ্ট তাঁকে স্বীকার করতে হ'তে পারে এই শিল্পের সত্যকে স্পর্শ করতে? তিনি ভালো ক'রেই জানেন যে তাঁর সমস্ত প্রেরণার উৎস একটাই, একটাই তাঁর পথ এবং সে আকাশের ধ্রুব নক্ষত্রও অনন্ত—সে হ'ল নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। স্থলর হ'য়ে বাঁচবার শ্রম, পৃথিবীতে এবং পৃথিবীতেই অনন্ত; অথচ স্বভাবের স্তর

থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে, অর্থাৎ অল্পতবের মধ্যে জীবনকে ধ'রে রেখেও জীবনের নিশ্চিন্তায় প্রতিযোগিতার উর্ধ্বে থাকতে হবে তাঁকে ।

গ) অভিনয়ের জন্ত তাঁর ভালোবাসার তৃষ্ণা এতই ভীত যে সেই জীবনের সমস্ত বাধা বিপত্তিকেই তিনি তাঁর ভালোবাসার অতিক্রম ক'রতে পারবেন ।

হ্যাঁ, ভালোবাসা ! সমস্ত সৃষ্টিকর্মের মূলেই এই ভালোবাসা । তা কেবল মাধ্যমের জন্ত নয়, বিষয়ের জন্ত নয়—নিজের জন্তও । নিজেকে প্রকাশের আবেগ, হয়ে ওঠার তাড়নাই তো শিল্পের মূল, না হ'লে তো প্রকৃতি-প্রেমে আত্মস্থ হয়েই কেবল বসে থাকা যেত, যদি সেটা নিজের সম্পূর্ণতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত না হতো । সম্পূর্ণতাই সত্য, স্নন্দনের অঙ্গীকার । বতদিন বাঁচব, পৃথিবীর উপর, মঞ্চের উপর স্নন্দর হ'য়ে বাঁচব, এই শুদ্ধ ভাবনাই অভিনেতাকে অভিনয়কর্মে নিমগ্ন করে । এই স্নন্দর তো তখনই আসেন যখন সত্য তার মূল থেকে উৎপাটিত না হয়েও নিছক জন্মের উত্তরাধিকারকে, যে কোন পূর্ব-নির্গমকে অতিক্রম ক'রতে পারেন । তাই যে অভিনয় অভিনেতার নিজস্ব আবেগকে ধারণ ক'রতে পারে না তা শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ হয় না, সং হয় না । সত্যার এই শিল্পী-স্নলভ তাগিদেই একই চরিত্র দু'জন মহৎ শিল্পীর হাতে দু'টি পৃথক সত্যরূপ পরিগ্রহ করেছে স্বদেশে এবং বিদেশে, যার পরিচিত নিদর্শনগুলি পাঠকের অবিদিত নেই, আশা রাখি । এই আপাত-অদ্ভুত অথচ শিল্পগত অর্থে স্বাভাবিক সংঘটন ঘটেছে শেক্সপীয়রের মতো একজন মহৎ নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রেও, যে শেক্সপীয়র নিজেও একটি চরিত্রকে বুঝতেন নটের চোখে এবং কেবলমাত্র নাট্যকারের চোখে নয় ।

একটি সং চরিত্র-চিত্রণের জন্ত, যন সার্থক মুহূর্তের অভিনেতাকে তাই কঠোর মনোযোগী হ'তে হয়, নির্মাণ ক'রতে হয় নিজের সৃষ্টির বৃত্ত । এই বৃত্তের ব্যাস যতো বড়ো হয় অভিনেতার কাজ তত সার্থক হয়ে ওঠে—অবশ্য এর মধ্যেই তাকে নিপুণ আত্মাসে স্থির থাকতে হয় সেই বৃত্তের কেন্দ্রে । এই স্বপ্ন-বৃত্ত অবশ্যই অভিনেতাকে এক অর্থে নিঃসঙ্গ ক'রে তোলে, কিন্তু সেটাই অভিপ্রোত । এই বিচ্ছিন্নকরণে, অভিনেতা নিজেই নিজেকে বাইরে থেকে এবং ভেতর থেকে বিশ্লেষণ করতে পারেন । এই সময়ে তাঁর মনোযোগ

শতভিষা

এত তীব্র হয় এবং সেই সঙ্গে পূর্ণ মানসিক চেতনা এমন ভাবে বাঁধা থাকে যাতে শরীর ও মনের সমস্ত প্রয়োজনীয় নায়ু উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, আলোকিত হয় এবং সবকিছু মিলে মিশে একটি লক্ষ্যেই ধাবিত হয় যেন একটিই ভাবনা তাঁর সমস্ত পৰ্বেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও অল্পভবকে এক চৌম্বক আবেশে বিদ্ধ ক'রে রাখে। হৃদয়ের সঙ্গে বোধির ও ইচ্ছাশক্তির এই অল্পময় নিবিড় যোগসূত্র রচিত হয় কেবলমাত্র অভিনেতার ভিতরকার আমিত্বের উপর তাঁর প্রমলক অজিত স্মৃতির আশীর্বাদে। এই আমিত্বকেই নাট্যাচার্য স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন 'Creative I'।

এই এক স্ফুটন পদ্ধতি। যে কোন হয়ে ওঠাই এক অর্থে এমনি কঠিন আবার এমন সহজও। তবে প্রকরণের কথা যখন এলোই তখন তার কথাই কিছুটা বলা যাক, বিশেষত এ-নিবন্ধে তার বাস্তব প্রয়োজন নিশ্চয়ই কারো কাছে অস্বীকৃত হবেনা। জীবনের বিস্তারিত জটিলতা যত বাড়ছে, ততই তফাৎ বেড়ে যাচ্ছে মাহুতের সঙ্গে মাহুতের। মঞ্চের উপরে জীবনের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য আর হ'য়ে ওঠার প্রকাশের ভিতর দিয়ে অভিনেতাকে যে পুনর্জন্মের অঙ্গীকার নিতে হয়, সেই নির্মাণের তাই কোন সামান্য সূত্র আর থাকছে না। ফলে এই লোকটা ভিলেন অথবা ঐ লোকটা প্রেমিক, মঞ্চের উপরে এই কথাগুলো সহজেই চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবার মত কোন প্রাধান্যিত টেকনিক তাই আর সত্য অর্থে টিকছে না। সত্য অল্পভবের সং জীবনায়নই প্রকৃত অভিনেতার অধিষ্ট। এই সত্যকে তা'হলে মঞ্চে ধরা যাবে কোন পদ্ধতিতে? কি হবে তা'হলে অভিনয়ের সত্য রূপ? দোহাই, আমাদের স্বাভাবিক অভিনয়ের কথা বলবেন না। কোন শিল্পকলা কখনোই স্বাভাবিক হ'তে পারে না। স্বাভাবিক মনের রূপেষণা, তার সম্পূর্ণ হওয়ার তাগিদে প্রতিফলনই শিল্প। ফলে স্বাভাবিক ঘটনা-প্রবাহের ভিতর থেকে কিছু তুলে কিছু ফেলে একটা ছন্দোময় মালা গেঁথে মঞ্চের উপরে তার যথাযথ দোলনটুকু ধ'রে রাখাই অভিনয়। সমস্ত জগৎ-সংসারের প্রাণকেস্রে অন্ধকার থেকে আলোর আবার আলো থেকে অন্ধ জয়যাত্রির পথে যে প্রচণ্ড জীবন-স্রোত বয়ে চলেছে তার সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা, সেই বেগকে শরীরে ধারণ করাই অভিনেতার দায়িত্ব। কিন্তু কেমন ক'রে তিনি বুঝলেন তাঁর জীবনকে, সেটা তাঁর অভিনয়ের সত্য নয়, জীবনবোধের সত্য। আর তাঁকে দেখে দর্শক

শতভিষা

যখন সেই উপলক্ষিকেই আশ্রয় ক'রতে পারলো সেটাই হ'য়ে উঠল তাঁর সত্য অভিনয়। অর্থাৎ ব্যক্তিক অহুত্তবের সত্যতা রূপ পেলো এমন একটি উপযুক্ত মঞ্চকল্পে যে তা অধিগম্য এবং বিশ্বস্ত হ'য়ে উঠলো সবার কাছেই। অভিনেতার সবচেয়ে বড় সমস্তার সমাধান হয় তখনই, যখন শিল্পহুত্রে তাঁর ব্যক্তিগত অহুত্তবের উপস্থিত সত্য থেকে নিহিত সত্যের বিচরণ সত্য অর্থে সঙ্গী ক'রে নেয় তাঁর দর্শককে। আত্মিক প্রকাশের সত্যতার এই অনাশ্রয়করণই অন্তের কাছে তাঁকে গ্রহণীয় ক'রে তোলে। তাঁর সৃষ্টি সার্থক হয়। এ'রকম একটি দৃষ্টান্তিনয় দেখেছিলাম 'আজ বসন্ত' নাটকে। নায়ক একটি মিথ্যাভাষণের মুহূর্তে ধরা পড়ায় অপরাধবোধে সংকুচিত হয়ে দেখলেন নায়িকা যেন পাথরের দেয়াল। তিনি সেই দেয়ালের চারপাশে করাঘাত ক'রে ঘুরতে লাগলেন প্রবেশপথের সন্ধানে। হঠাৎ একটা দরজা উন্মুক্ত হ'তেই সামনে দেখলেন একটা আয়না যাতে তাঁরই মিথ্যাচারের মুখটা অমোঘ ফুটে র'য়েছে। দুই হাতে মুখ ঢেকে বিপন্ন পশুর মত আতঁনাদে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে। অবচেতনের এই সমস্ত প্রকাশটাই তিনি ধ'রে রাখলেন অসামান্য অভিনয়ের ইচ্ছিতে। নায়িকা যমতা চট্টোপাধ্যায় মুখে পাথর একে অটুট দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে রইলেন আর তাঁর চারপাশে ঘুরে-ঘুরে তাঁর নাম ধ'রে ডেকে ডেকে, যেন দেয়ালে করাঘাত ক'রে চললেন নায়ক (নাম মনে নেই), হঠাৎ কোন একটা দরজা খুলে গেল, যমতা চট্টোপাধ্যায় নায়কের মুখের দিকে তাকালেন, তাঁর চোখ যেন আয়না হ'য়ে নায়কের মুখের কুংসিত মিথ্যাচারের ছবি ফুটিয়ে তুলল যার যথার্থ রূপায়ণ আমরা মুহূর্তে দেখতে পেলাম নায়িকার চোখে চোখ-রাখা নায়কের মুখবিকৃতিতে আর হঠাৎ কুংসিত একটা আতঁনাদ ক'রে নিজের পাপবোধের কাছে নিজেই অভিযুক্ত হয়ে তিনি পেছনে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন মঞ্চ থেকে। অবচেতনের এই যে সচেতন প্রকাশ যা দেখানো হ'ল আভাসে—তা যেমন সম্পূর্ণ করল অভিনেতার হ'য়ে ওঠাকে, তেমনি তৃপ্ত ক'বল আমাদের বোধিকে যার উপর তিনি দিয়ে গেলেন ছবিটির রঙের মাত্রা হরণপূরণের ভার। উভয়ত এই আত্মোপলব্ধির আবিকারই অভিনেতার শিল্পকে সত্য ক'রে তুলল।

এই সত্যের ধারণায় এবং প্রকাশে পৌঁছবার যে ক'টি মহান শিক্ষা এখন অবধি স্বীকৃত সেগুলির বিভিন্ন ধর্ম ও লক্ষণের বিচারে "Ronald Hayman"

অভিনয়-শিল্পীর ছ-বকম বিভাজন পদ্ধতি দেখিয়েছেন তাঁর “Techniques of Acting” বইতে।

- (1) “Method” and technical.
- (2) Creative and imitative.
- (3) Straight and character.
- (4) Actors who find the role in themselves and actors who find themselves in the role.
- (5) Internal and external.
- (6) Actors who start from the inside and work outwards and actors who start on the outside and work inwards.

এর প্রথম বিভাজন পদ্ধতিতে আমার আপত্তি আছে, কেননা ‘Method’ যা কিনা স্তানিস্লাভস্কি-নির্দেশিত পথের অনুসরণ, সেও এক অর্থে ‘technique’ যা ব্যবহৃত হয় অভিনেতার হৃদয় ও বোধির সংঘম অনুশীলনে, নিম্ন সৃষ্টিকর্মের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে।

দ্বিতীয় বিভাজনটির সম্বন্ধে পূর্ব-প্রসঙ্গেই অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। বলা হয়েছে কী ক’রে অভিনেতা তাঁর অভিনয় চরিত্রের টীকা-কার হয়ে ওঠেন এবং এই স্তরে আর একবার ঐ ‘হয়ে ওঠেন’ বাক্যবন্ধের ব্যবহার। যখন সংলাপ তুচ্ছ, সে সময়েও অভিনেতার বিশিষ্ট উচ্চারণ, দৈহিক ও বাচিক উভয়ত, তাঁর কাজকে অনুকৃতি থেকে সৃষ্টির পর্ধ্যায়ে পৌঁছে দেয়। যেমন দেখেছি ‘তিন পয়সার পালা’ নাটকে শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন তিনি পুলিশ-অফিসার-বেনী রুদ্রপ্রসাদকে আলতোভাবে বলতেন :

“মহীন্দ্রের খবর আমি আপনাকে আবার দিয়ে যাব। আপনি অবশ্য ডাইরির পাতা ছিঁড়ে ফেলবেন। তা হোক—আমি আবার ডাইরি করাব। আপনি আবার ছিঁড়বেন আমি আবার করাব; আপনি আবার ছিঁড়বেন আমি আবার করাব; আপনি আবার ছিঁড়বেন আমি আবার করাব। এ খেলাতো চলবেই, যতদিন না”

এই অভিনয় যারা দেখেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে পড়বে কেমন ক’রে

একইভাবে বসে থাকতে থাকতে তিনি প্রথম দিকের আলগা বাক্যাংশকে শেখ দিকে ক্রুদ্ধ মার্জারের অন্তর্গত ফৌসানিতে রূপান্তরিত করতেন, আবার হঠাৎ কেটে দিয়ে, এক পাক ঘুরে, হেঁঃ হেঁঃ করতে করতে বেরিয়ে যেতেন কোঁশলী চিতার মত। শুধু দক্ষতা নয়, তিনি অপামায়্য সৃষ্টি করতেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অসহায়তা অথচ দুর্নীতিকে আর এক দুর্নীতির স্বচ্ছন্দ শাসানি, স্বার্থপর চেতনা আর কেউটির লেজে পা-দেওয়ার অনিবার্ণ গরল পরিণতি। একবার-দুবার নয়, অস্তুত সত্তেরো-আঠারোটি রাত্রি আমি এই সৃষ্টি-কর্ম প্রত্যক্ষ করেছি ; একই নৈপুণ্য। অভিনেতা তাই কেবল কারিগর নয়, নিপুণ শিল্পী কারিগর।

‘Hayman’-এর তৃতীয় বিভাজনটি এক ধরনের পেশাদারী বিভাজন যেখানে নায়ক-নায়িকারা এক রকম ফর্মুলা অভিনয় করেন এবং চরিত্রাভিনেতার্য করে যান নানান টাইপের প্রবর্তন। আমার বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা থেকে সংগত কারণেই তাই আমি এই বিভাজনটিকে বাদ দিচ্ছি।

বন্দ মেটেনি এবং মিটেবে না কখনই হয়ত তাঁর চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বিভাজনগুলিতে। আসলে একই সত্য লক্ষ্যে সুন্দর উত্তরণই এই বিভিন্ন পথের সমগ্রা। পথটা যেমনই হোকনা কেন, উদ্দেশ্যটা এক।

কোন্টা ভাল আর কোন্টা বন্দ তা নিয়ে বিরোধ মেটেনি আরভিং ও কক্-ল্যার, স্থানিস্লামত্বের পদ্ধতি বা ব্রেশ্‌টের মতে। তাঁদের নিঃসন্দেহই তত্ত্বগত মত, প্রয়োগের সময় অনেকটা ভিন্ন চেহারা নিয়েছে কখনো কখনো। প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের সার্থক সমন্বিত হ’য়ে ওঠাতেই অভিনেতার মুক্তি। তাঁর নিজস্ব চারিত্রিক গঠনের উপর তাই নির্ভর করে কোন্ পথে তাঁর সত্য আসবে। ‘গ্যারিক’ বা ‘জন লরেন্স টুল’ দু’জনেই মহৎ অভিনেতা ছিলেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে লোকে ‘গ্যারিকের’ অভিনয় দেখে এসে বলত ‘হ্যামলেট্’ অপূর্ব আর ‘জন-লরেন্স টুলের’ অভিনয় দেখে এসে অভিনেতার নামই করত অভিনীত চরিত্রের নয়। বাংলা দেশে ‘অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী’র ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি প্রযোজ্য। অনেকে মনে করেন যে এরকম অভিনয়ে নাটকের চরিত্রটি সার্থক বা সম্পূর্ণ অভিনীত হয় না। এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেছেন :

“এইরূপ মনে করা ভ্রম। কলাবিদ্যা—কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। চিত্রকর যখন কোন স্বভাব দৃশ্য অঙ্কিত করিতে চান, সেই দৃশ্যের অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিয়া, তাঁহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যে দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছেন, সেই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকরের যে রূপ মনেঃ ভাব হইয়াছিল সেই ভাবটি যতদূর পারেন, তুলিতে তোলেন। কল্পনা প্রসূত দৃশ্যেও অনেক যোগ করিতে হয়। Art galleryতে Approaching storm অর্থাৎ ঝড় আসিতেছে এই নামে একখানি চিত্র আছে। ঘোর মেঘ উঠিয়াছে, বৃক্ষসকল স্পন্দনহীন, পক্ষী-পক্ষী ভয়াঙ্কুল, ঝড়ের পূর্বে এই দৃশ্য স্বভাবে দেখা যায়। চিত্রকর সেই দৃশ্য আঁকিয়া তাহাতে কতকগুলি চাষা, পথিক, গাভী প্রভৃতি দিয়াছেন। ঝড় আসিবার পূর্বে যেখানে সেখানে চাষা গাভী প্রভৃতি দেখা যায়না। কিন্তু চিত্রকর তাঁহার চিত্রপটে উহা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত মেঘ ও স্পন্দনহীন বৃক্ষ অপেক্ষা অঙ্কিত মানবের মুখভাবে ঝড়ের আশঙ্কা বেশী প্রতীয়মান হইতেছে। অর্দ্রেন্দু উচ্চ কলা-বিদ্যাবলে তাঁহার অভিনীত অংশ চিত্রকরের গ্রায় কতকগুলি কল্পিত হাবভাব দ্বারায় নাটককারের চরিত্র পরিপুষ্ট করিতেন। বর্ণিত চিত্রকরের Approaching storm ছবিতে আমরা ছবি দেখি কিন্তু ঝড় আসিবার ভাব মনে উদয় হয়; অর্দ্রেন্দুর অভিনয়ে সেইরূপ আমরা অর্দ্রেন্দুকে দেখি, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটক-বর্ণিত চরিত্রের ঠিক ভাব উপলব্ধি হয়।”

‘গ্যারিক’ বা ‘টুল’ কারো অভিনয়রীতিই অগ্রাহ্য করার নয়, ‘গিরিশবাবু’ এবং ‘অর্দ্রেন্দু’র অভিনয়ও একই চরিত্রের বেলায় অনেক সময় পৃথক ধরনের হতো—কিন্তু তাঁরা সকলেই সত্য অভিনেতা ছিলেন। এই সব থেকে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয়েছে যে অভিনয় ব্যাপারটা মোটেই একমেটে নয়, তার অনেক রকম ডাইমেনশন্ বা নানান গভীরতার রঙ আছে। তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা বা কৃত্রিমতা, নিমগ্নতা বা বিচ্ছিন্নতা তাই মিথ্যাও বটে, সত্যও বটে। যে কোন একটি মাত্র নান্দনিক তত্ত্বের নির্দেশে তাকে নির্দিষ্ট করা চলে না। জী মাঝা গিয়েছেন, স্বামী শোকাচ্ছন্ন—এই হয়তো নাট্যকারের দেওয়া সিচুয়েশান, কিন্তু সেই শোকের একটা ব্যক্তিগত রূপদানই অভিনেতার সৃষ্টি। ‘রাজা’ নাটকে

বৃদ্ধ ঠাকুরদা-বেশী কুমার রায় যখন বিদ্রোহী রাজ্য-বর্গের পথ আগলে দরজায় দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে চিৎকার করতেন, “রাজার রাজ্যে আমি তো সবচেয়ে অযোগ্য লোক, তাই আমার উপর ভার পড়েছে তাঁর দ্বার রক্ষার”, তখন ঠাকুরদার নব-জাগ্রত যৌবনের দীপ্তি শরীরে এবং কণ্ঠে যেমন সত্য, তেমন সত্য ঠাকুরদার বয়সের বার্ষিক্য যা অভিনেতা কখনোই ভোলেননি, যার নিজের জীবনের একটি বড়ো সত্য ছিল তখন তার চল্লিশ বছর বয়স। এই সৃষ্টি যে পছন্দেই সম্ভব হোকনা কেন, অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী যে ধরনের পদ্ধতিতেই তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুননা কেন, তা সত্য হয়েছিল। মহৎ প্রথা-প্রকরণের সূক্ষ্মতম ভেদ বিচার নয়, এই হয়ে ওঠাই আমার কাছে সত্য।

অভিনেতার কাছে তাই মঞ্চের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ আত্মস্থতার কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিস্থাপন; অটুট আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাসে। নিম্ন পাগল যাতে আর মঞ্চে শুধু ‘রক্ত করবীর’ একটা চরিত্র হয়ে বাঁচেন না, বরং একজন অভিনেতার মধ্যে বাঁচেন যে বিশ্বের ভাবনা এবং দুঃখে তারই মত দীর্ঘ হয়ে যায়। সেই দুঃখ দর্শকের কাছে যথার্থ প্রবাহিত করতে গেলে প্রয়োজন সেই ভালোবাসার যার জন্য জীবনের সারাংশের উৎসর্গ করা যায়। কোন প্রতিযোগিতা নয়, কোন অন্ধ ঘোড়দৌড় নয়, কোন সূখ্যাতির লিপ্সা নয়, শুধু সূক্ষ্মের জগতে প্রবেশাধিকারের চেষ্টা। সৌন্দর্যের ভূষণ আমাদের চারপাশের মানব-মনে। যদি একবারও হৃদয় ও বোধের এক অপূর্ব মিলন মুহূর্তে তাঁদের রসতত্ত্বোতে সাফা তুলতে পারা যায় তাহলে রহস্য হয়ে ওঠে উজ্জ্বলতম সূর্য্যও। এ সেই সার্থক প্রতিফলনের মায়াবী সত্য যার ভিতর দিয়ে দৈনন্দিনের সাধারণতম ঘরও একটি নিটোল কবিতা হয়ে ওঠে। পোষ্টম্যান্ কত হাসি-কান্নার চিঠি বিলিয়ে যায়, কত স্মৃতি আর স্বপ্নের, স্মৃতি, স্বপ্ন আর তীব্রতার, কত সমাহিত নিমগ্নতার খবর; কিন্তু পোষ্টম্যান্ পোষ্ট-ম্যান্ই থাকে। সমস্ত চিঠি যথাযথ বিলি করার মধ্যে এই নির্বিকার পোষ্টম্যান্ হয়ে ওঠাই অভিনয়ের সত্য।

এ নিবন্ধে যা কিছু বলা হলো তা কেবল মঞ্চাভিনয়ের কথা মনে রেখে। সাধারণভাবে এ সব কথা সকল বকম অভিনয়ের ক্ষেত্রেই সত্য বটে, তবে নির্দিষ্ট কোন কোন অংশে সমস্যার রূপটা অন্ত্যস্ত অভিনয়-মাধ্যমে কিছু ভিন্ন।

লেখক।

অভিন্নরূপ সরকার

শিল্প-জিজ্ঞাসা : একটি বিকল্প সিদ্ধান্ত

প্রকৃতির অঙ্ক অমূলক নয়, যথার্থ-অর্থে প্রাকৃতিক তা-ও নয়, স্বাধীন মাহুয়ের চেতনায় প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর তিথ্যক-স্থলর প্রকাশ-ই শিল্প—এমন একটা ধারণা আছে। শতাব্দী-বিস্তীর্ণ এই ধারণা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু হয়েছে কোনো মৌল ভাবার্থে নয়, শুধুমাত্র বাহ্যিক বিভ্রাসে। প্রাচীন ভারতীয় রস-বেত্তাগণ ‘নিয়তিকৃতনিয়মরহিত’ যে শিল্প-প্রক্রিয়ার আকাজক্ষা করেছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম হননি; এবং প্রকৃতি-সজ্জিত সন্ধ্যার মেঘমালাকে বিদেশী রোম্যান্টিকরা সেই একই প্রক্রিয়ায় আপন কল্পনা মিশিয়ে রচনা করতে চেয়েছেন, পূর্ণতার অত্র এক রূপ দিতে চেয়েছেন। ধারণাটির তাত্ত্বিক সংশ্লেষ আরও ব্যপ্ত। ফলত, অসংখ্য নান্দনিক বিচারে একে মূল বিশ্লেষণের একটি ভিত্তি-স্থাপক প্রকল্প হিশেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব বিচার যদিও একে অপরের থেকে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের চরিত্র অমুখ্যায়ী আলাদা, এদের মধ্যে একটি সামান্ত-লক্ষণ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। ঈশ্বং বিতৃত-অর্থে বলা যেতে পারে সেই নন্দনতাত্ত্বিকগণ যারা ‘অমল্লপবরতন্ত্র’ রচনার ধ্যান করেছেন, তাঁরা শিল্পকে বর্ণনা করেছেন একটি বিশেষ বিমূর্তের অধেষণ হিশেবে— রবীন্দ্রনাথ এই অধেষণকে কখনো-কখনো সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব’লে মনে করেছেন ; অত্র তিনি একে গ্রহণ করেছেন আপন সত্তার এক অজানিত অংশের উন্মোচন-প্রয়াস রূপে। অন্য কারো কাছে, এই অধেষণ এক অর্ধ-সচেতন আত্মনিমগ্নতা ; আপাত-অস্পষ্ট এবং বিশেষ-অর্থে নৈর্ব্যক্তিক এক আবেগের মধ্যবর্তিতায় অন্তহীন সময়-প্রবাহ তথা জৈবী অস্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা। স্পষ্টত, এই ধরনের অধেষণের এটি বিশেষ চরিত্র আছে। বিস্তারিতভাবে তা এই : প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অস্থিষ্টির প্রকৃত-স্বরূপ সহজে জিজ্ঞাস্য কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা নেই, অনেকটাই নিজেকে তথা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে করতে এগিয়ে যাওয়া, কাজেই, চরম লক্ষ্যবস্তুটি সেই-অর্থে প্রাকৃতিক নয়, স্পষ্ট নয়, বরং প্রকৃতি-অতীত, অতীন্দ্রিয় কোনো উত্তরণ।

শতভিষা

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মূল প্রকল্পটির ও তৎসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলির সমালোচনা, ভিন্নতর একটি প্রকল্প-নিৰ্মাণ এবং সেই প্রেক্ষিতে বিকল্প একটি সিদ্ধান্তের উপস্থাপনা।

দুই

আরম্ভেই ‘প্রকৃতি’ শব্দটির যথার্থ তাৎপৰ্য ও ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতি এক আরোপিত অবস্থাবলীর সমন্বয় অথবা পূৰ্ব-নির্ধারিত কয়েকটি উপাদান যা একজন ব্যক্তিমানুষ শুধুমাত্র তার নিজের চেষ্টায় পালটাতে পারে না। অর্থাৎ একজন ব্যক্তিমানুষের কাছে তার চারপাশের গাছ, ফুল, আকাশ ইত্যাদি যেমন প্রকৃতির অন্তর্গত, তেমনই তার সমাজ, বান্ধব-সঙ্গ কিংবা ভৌগলিক আবহাওয়া। এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলি কয়েকটি বিশেষ রীতিতে কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পুনরাবর্তিত—এমন মনে করা ভুল হবে না। যেহেতু এই নিয়মগুলি মোটামুটি স্থির, বর্তমান প্রবন্ধে ‘শাস্ত্র প্রকৃতি’ বলতে আমরা এই বিমূর্ত নিয়মগুলিকেই বুঝব।

উল্লিখিত প্রকল্প অনুযায়ী, শিল্পী তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি-লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সচেতন অথবা অধঃসচেতনভাবে বিন্যাসিত করে যে ব্যক্তিগত পৃথিবী রচনা করেন তা-ই শিল্প। অর্থাৎ এখানে দু’টি পরস্পরবিরোধী উপাদানের কথা বলা হয়েছে : এক, পূৰ্ব-আরোপিত, অপরিবর্তনীয় কয়েকটি নিয়ম, শিল্পীর পারিপার্শ্বিক যার ফল, ও দুই, শিল্পীর অন্তর্নিহিত এক রহস্যময়, অতীন্দ্রিয় চেতনা ; এই উপাদানদুটি একে অপরের স্বাধীন এবং পরস্পরের উপর এদের যৌথ প্রতিক্রিয়ার পরিণতিই শিল্প। যেহেতু এই পরিণতি যথার্থ-অর্থে প্রাকৃতিক নয়, ‘উদ্ভব’ জাতীয় শিল্প-সিদ্ধান্তগুলি এই প্রকল্পের-ই অঙ্গস্বরূপ।

যদি এই প্রকল্পটিকে সত্য বলে ধরে নিই, তাহলে দু’টি অঙ্গসিদ্ধান্তে পৌছনো যেতে পারে—প্রথম, প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত কিছু সৃষ্ট হওয়া সম্ভব, ও দ্বিতীয়, কোনো-কোনো মানুষের ভিতরে প্রাকৃতিক গুণাবলী ছাড়াও এমন একটি রহস্যময় চেতনা আছে যার সংমিশ্রণে নিছক প্রকৃতি-লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিও ‘অন্তঃ-পরতন্ত্র’ শিল্প হয়ে ওঠে। দুটি অঙ্গসিদ্ধান্তই আমার ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে।

শতভিষা

বলা যেতে পারে, যে-মৌল প্রতিজ্ঞা থেকে উপরি-উক্ত প্রকল্পটি, সিদ্ধান্তগুলি এবং অমুসিদ্ধান্তদ্বিটি উদ্ভূত তা আর কিছুই নয়, ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া প্রকৃতির উল্লিখিত সজ্জা। স্বভাবতই এই সজ্জা সার্বিক কিংবা চরম নয়, ব্যক্তিনির্ভর এবং মন্বয়, সূতরাং যে কোনো তত্ত্ব সিন্ধাস্তের প্রতিজ্ঞা হওয়ার অযোগ্য। আরো স্পষ্টভাবে, উল্লিখিত সজ্জার ব্যক্তিমান্বয়ও অনিবার্হভাবে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত, শাস্ত্র নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার যে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কাছেই শিল্প-সৃষ্টির প্রাণালীটিও একান্তভাবে প্রাকৃতিক, প্রকৃতি-অতীত কোনো চৈতন্যের স্থান এখানে নেই। বস্তুত, প্রকৃতি-অতীত কোনো চৈতন্যের স্থান কোথাও নেই, কারণ প্রকৃতি অর্থই পরম, শাস্ত্র, সম্পূর্ণ। অতএব প্রকৃতির সার্বিক সজ্জাটি এইরকম : বোধযোগ্য প্রত্যেকটি উপাদান কোনো-না-কোনো কার্য-কারণের সূত্রে আবদ্ধ ; এই কার্য-কারণ-সূত্রের আড়ালে যে কয়েকটি শাস্ত্র নিয়ম অবিশ্রাম কাজ করে তা-ই প্রকৃতি। এই সজ্জা অমুযায়ী 'নিয়ন্তৃত্ত্বনিয়মরহিত' শিল্প-রচনার প্রকল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলিকে আমরা বর্জন করতে পারি।

তিন

এখন বৈকল্পিক একটি প্রকল্পের কথা এইভাবে ভাবা যেতে পারে : সর্বব্যাপ্ত চরাচর অখণ্ডমণ্ডলাকার কয়েকটি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। যে-নিয়মের ফলে গাছ ফুল ফোটে, অনেকটা সেই রকমই একটা নিয়মের ফলে শিল্পী শিল্প রচনা করেন ; গাছ ফুল-ফোটানোর উপাদান সংগ্রহ করে মাটি থেকে, শিল্পী শিল্প-রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন পারিপার্শ্বিক থেকে। এক্ষেত্রে মাটি ও শিল্পীর পারিপার্শ্বিক যেমন প্রকৃতির অন্তর্গত, ফুল-ফোটানোর নিয়ম এবং শিল্প-রচনার নিয়মও তাই। অতএব শিল্প-রচনা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীরই একটি বিশেষ প্রকাশ, প্রকৃতি থেকে আলাদা কোনো প্রক্রিয়া নয়। এই প্রকল্পের প্রেক্ষিতে আমরা এবার ভিন্নতর একটি নান্দনিক-সিদ্ধান্ত নির্মাণ করতে পারি।

প্রাথমিক-অনুমান-স্বরূপ, শিল্প-সজ্জাত অমুভবকে দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে

শতভিষা

বিশ্লেষণ করা যেতে পারে : রস-গ্রহীতার কাছে, এমন মনে করা ভুল হবে না, শিল্প-অনুভব মূলত কয়েকটি অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্বিজ্ঞাস; শিল্পীর দিক থেকে আবার, বলা যায়, শিল্পরচনা স্রষ্টার কয়েকটি অতীত অভিজ্ঞতার শাখতীকরণ-প্রক্রিয়া। কিন্তু শুধুমাত্র এই বর্ণনা অনুসরণ করলে যুগপৎ দুটি সমস্যা দেখা দেবে। প্রথমত, একজন ব্যক্তিমাত্রের কাছে, প্রবৃত্তি-জ্ঞাত ছাড়া অন্য যে-কোনো অনুভব-ই অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্বিজ্ঞাস, শিল্প-অনুভবকে আলাদা করব কেমন ক'রে? দ্বিতীয়ত, স্রষ্টার অভিজ্ঞতার সম্ভার অপরিমেয়; শিল্প-সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় কোন্ বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলিকে রচনায় ধ'রে বেঁধে শিল্পী নির্মাণের আনন্দ পেতে চান? এই সমস্যা দুটি সমাধানের জন্য শিল্প-চেতনাকে আরো সূক্ষ্ম সীমারেখায় নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

এইভাবে শুরু করা ভালো : প্রাকৃতিক নিয়মের ফলেই প্রত্যেকটি মানুষের ভিতর এক-একটি বিশেষ সম্পূর্ণতার বোধ আছে; এই বোধ একান্তই ব্যক্তিগত হুতরাং যে-কোনো দুটি ক্ষেত্রে এক নয়। একজন ব্যক্তিমাত্রের সারাজীবনের প্রায়শ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত-অর্থে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা, এবং এই ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতা-বোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেহেতু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল, একে কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের প্রেক্ষিতেই বিচার করা সম্ভব। প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা পারিপার্শ্বিক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রের শারীরিক, বিশেষ ক'রে মস্তিষ্কের গঠন—মূলত এই তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে একটি প্রাতিম্বিক সম্পূর্ণতা-বোধ।

একজন ব্যক্তিগত রস-গ্রহীতার দৃষ্টিকোণ থেকে, শিল্প-অনুভব এমন একটি অভিজ্ঞতা যা তাঁর আপাত-অস্পষ্ট সম্পূর্ণতা-বোধটিকে অন্তত আংশিকভাবেও স্বচ্ছ ক'রে তোলে, এবং এছাড়া সঙ্গে সেতু-স্থাপন করে বর্তমান বাস্তব এবং আকাঙ্ক্ষিত সম্পূর্ণতার ভিতর। স্পষ্টত, এই সেতু-স্থাপন ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতা-বোধের উপাদান কয়েকটি অভিজ্ঞতার মধ্যবর্তিতায়—শিল্প-অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র এই মূল অভিজ্ঞতাগুলির পুনর্বিজ্ঞাস। যুগপৎ আনন্দ এবং দুঃখ—আনন্দ আত্ম-আবিস্কারের, দুঃখ তাকে না-পাওয়ার।

পক্ষান্তরে, শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে, শিল্প-রচনার প্রক্রিয়া আর কিছুই নয়, ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতা-বোধের গঠন-প্রক্রিয়া। আরো স্পষ্টভাবে, পারিপার্শ্বিক-

শতভিষা

লব্ধ একটি বা একাধিক অভিজ্ঞতা শিল্পীর কাছে কখনো-কখনো বিশেষ অর্থবহ মনে হয়, এই মনে-হওয়া আবার শিল্পীর সেই মুহূর্তের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক নিয়মেই শিল্পী একে গ্রহণ করেন, প্রাকৃতিক নিয়মেই এই অভিজ্ঞতা শিল্পীর ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতা বোধের একটি উপদান হয়ে পঠে, এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তিমাত্রটি নিজের সম্পূর্ণতা-বোধ সম্বন্ধে আর পুরো অজ্ঞ থাকেন না। যেহেতু এই সম্পূর্ণতা শিল্পীর পৰম আকাঙ্ক্ষা, তিনি তাকে ধ'রে রাখতে চান, শাস্ত ক'রে রাখতে চান তার এক-একটি উপদান—শিল্প-রচনা মূলত শিল্পীর সম্পূর্ণতাবোধ-সংশ্লিষ্ট উক্ত অভিজ্ঞতার শাস্তীকরণ প্রক্রিয়া।

চার

এই প্রবন্ধে আমরা পাশাপাশি দুটি প্রকল্প এবং তৎসংশ্লিষ্ট দুটি সিদ্ধান্ত আলোচনা করেছি। প্রথম সিদ্ধান্তটি উত্তরণ-সম্বন্ধীয়—এবং এই উত্তরণ প্রকৃতি-অতীত, অতীন্দ্রিয় এবং বহস্যাবৃত। এই সিদ্ধান্তটিকে আমাদের ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে। বিকল্প যে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তটি আমরা তৈরী করেছি তাও এক-অর্থ উত্তরণ-বিষয়ক। কিন্তু এই উত্তরণ প্রকৃতি-অতীত নয়, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর-ই অন্তর্ভুক্ত। কারণ ভয় থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সবকিছুই যখন প্রকৃতি-নির্ধারিত, শিল্পী ঈশ্বরের সমকক্ষ এক স্রষ্টা—এই ধারণার সমর্থন শুধুমাত্র মাহুষের মূখ্য দাস্তিকতাকে প্রত্যয় দেওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে?

শংকর চট্টোপাধ্যায়

আমি এখন মাহুঘের পোশাক খুলে লাফ দিয়ে নামছি জলে
উঠছি ডাঙায়, উড়ে যাচ্ছি দশদিকে
এখন আর আমি কোন মাহুঘের ছেলে নই কারোর নই আজ্ঞার
নেই-শহরের বাসিন্দা—আমি লাল আলোর লাল হলুদের হলুদ

শতভিষা

ক্রমে ছায়া দীর্ঘ হয়,
ক্রমে
ছায়া দূরে স'রে যায় ।

দূরে
অন্ধকার হ'য়ে আসে
মাহুঘের বাড়ি-ঘর মাহুঘের
স্বথ

পৃথিবী তার
ঘুমের গল্পকে কোলে নিয়ে
অপ্ন দেখে
পাতাবরা গাছের

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই সেদিন রাত্রে শংকরের জন্তে মনটা খুব ব্যাকুল হয়েছিলো। তখন প্রায় দশটা। ওর বাড়িতে ফোন করতে গিয়ে দেখি লাইন খারাপ। পর-দিন সকালে খবর, গত রাত্রে শংকর গৌহাটিতে মারা গেছে। আশ্চর্য! শংকরের কবিতা ওর মুখে আসি অনেক শুনেছি। তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী নিজের লেখা শুকে শুনিয়ে এসেছি বাড়ি বয়ে। এমন সহশক্তি সম্পন্ন মাহুঘ একডাকে মৃত্যুর দিকে ছুটে গেল! 'দেশ'-এ ওর ছবি দেখে সেই প্রথম 'সারাদিন ওর জন্তে কাঁদলাম। আজ শংকরের কবিতা পড়তে গিয়ে দেখি শুধু মেঘ মলিন অভিমান, যা ঢেকে আছে ওর ছবি।

স্বপ্নেন্দু মল্লিক

শতভিষা

পঞ্চাশের একজন বিশিষ্ট কবি শংকর চট্টোপাধ্যায় কবিতা বিষয়ে অতিরিক্ত সিরিয়স ছিলেন, তাই তাঁর প্রবণতা ছিল, হালকা লঘুচালের পরিবর্তে গভীর উপলব্ধির বহনকে তুলে ধরা ; এ তাঁর একটা বিশেষ ঝোঁক, তাই বিষয় হিসেবে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিলো সবসময়ই গভীর কিছু বেছে নেওয়া, তা অনেক সময় বাক নিতো দার্শনিকতার দিকে, কিন্তু কখনো তিনি লঘুচারি কিছু বেছে নিতেন না ; তাই আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম ; ক্রমশই লক্ষ্য করছিলাম, অতৃপ্তি তাঁকে সেইদিকে নিয়ে যাচ্ছে যে বিন্দু থেকে মহৎ কবিতা উৎসারিত হয়ে থাকে । গুরুত্বপূর্ণ একজন প্রিয় কবির পূর্ণবিকাশ দেখা গেলো না, এই দুঃখ ।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি গেলেই আগে শংকর আমাকে টানতো । ওর হাসিখুশি মুখ সতেজ ভরাট গলা মনে পড়তো । ইচ্ছে হতো, একবার শংকরের সঙ্গে দেখা করে যাই । ল্যান্সডাউনের সেই বাড়িটা এখনও নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ।

পঞ্চাশের একজন কবি আমাকে বলেছিলেন, পার্কের পাশের কোনো গাছকে তাঁর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, উত্তেজনা নেই, কোনো কিছু হয়ে ওঠা নেই, গাছ তুই বছরের পর বছর এইভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

শংকরদের বাড়িটাকে আমি এ প্রশ্ন করতে যাবো না । তবে কোনো ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা শংকরের সম্পূর্ণ আজনা ছিলো ছোটো । বড় সব ঘটনা শংকরে মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো । ওর মধ্যে উত্তেজনা আহ্লাদ এবং প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরী হতো । শংকরের লেখা এই প্রতিক্রিয়ার ফল । তাঁর গল্পে, কবিতায় এই চিৎকার আর আত্ননাদ ধরা পড়েছে ।

অনেকে ‘জীবনসংগ্রাম’ ‘জীবনযুদ্ধ’ এই সব কথা ব্যবহার করতে ভাল-বাসেন। কিন্তু আমরা যেভাবে বেঁচে থাকি তাকে ‘যুদ্ধ’ যদি বা বলা যায়, এ ‘যুদ্ধে’ আমাদের শৌর্ষের কোনো পরিচয় নেই, বীরত্বের নাম গন্ধ নেই। এ ‘যুদ্ধ’ আমরা ঘোষণা করিনি। আমাদের ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এ-জীবন আমরা বহন করতে বাধ্য। তার মধ্যে হয়তো কেউ চিৎকার করে উঠতে পারি, কেন জন্ম কেন নির্ধাতন। এই নির্ধাতন শংকরের লেখা গল্পের বিষয়। কবিতায় শব্দ দিয়ে যে বাড়িটা শংকর তৈরী করতে চাইতো তার ভেতরের পরিমণ্ডলটা এই রকম।

আর ল্যান্ডসডাউনের ইটের নিম্পৃহ বাড়িটার পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে যাবো। শংকরের সতেজ ভরাট গলা, হাসিখুশি মুখ মনে পড়বে। এই বাড়িতে আমাদের প্রিয় শংকর চট্টোপাধ্যায় বাস করতেন। শংকর নেই। আর ঐ বাড়িটাকে কি বলা যাবে শংকরের বাড়ি ?

স্বত্রত সেনগুপ্ত

ছোটখাটো একজন স্বয়ং-সম্পূর্ণ কবি হওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না শংকর চট্টোপাধ্যায়ের, সে-রকম কোনো প্রচেষ্টাও ছিল না। তিনি একজন বড়ো কবির সর্ভে ভেবেছেন নিজেকে যে সর্ব আশ্রয়ে আনার জন্ত তাঁর মধ্যে সর্বদাই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ছিল, রক্ত এবং পরাজয় ছিল। তিনি গভীরতর বিপদের ভিতর থেকে ছুঁতে চেয়েছিলেন এক রহস্যের জগৎ যেখান থেকে মানুষের মধ্যে পজুত্ব এবং পরাজয়-কে দেখতে পাওয়া যায়—সেখানে ঈশ্বর এবং সময় নিঃসঙ্গ ব্যক্তিমানুষের পটভূমিকা রচনা করে। তিনি তাঁর আবেগের জটিল নির্মাণ পদ্ধতির মধ্যে মৃত্যুকেও উপলব্ধি করেছেন। তাঁকে আমার সব সময়ই একজন কবি মনে হয়েছে যার প্রথম বিষাদ এবং অবচেতনতা মহৎ কবিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকের জন্ত কবিতার একটি ছত্রও রচনা করেননি

তিনি—এমনকি দুচার লাইন চতুর ‘ছড়রা’ও না— যার ফলে বিশেষ কোনো খ্যাতিও (অর্থাৎ যাকে নাম ছড়িয়ে-পড়া বলা চলে যা একজন লেখকের জন্য আত্মতৃপ্তি আনে এবং তার সৌন্দর্য নষ্ট ক’রে দেয়) হয়নি তাঁর ।

বস্তুতঃ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাঁর কাছ থেকে একজন বড়ো কবির পরিচয় গ্রহণ করছিলুম আমরা, যিনি যে কোনো বিচারমতায় নির্ভীকভাবে মাথা তুলে বলতে পারতেন ‘না’, যিনি মৃত্যুর আগে, অন্তত একটি দশ লাইনের অসম্ভব কবিতাও লিখে যেতে পেরেছিলেন দশ লাইনের এক ‘অসম্ভব’ কবিতা লেখার জন্য তাঁর মধ্যে সারাজীবন এক অন্ধকার অপেক্ষা ছিল, কান্না ছিল, ক্ষয় ছিল । কিন্তু কেন তিনি এরকম আকস্মিকভাবে পা বাড়িয়ে মৃত্যুর ভিতরে নেমে গেলেন ? কেন নেমে গেলেন ?

কালীকৃষ্ণ গুহ

(৬)

কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়কে আমি মাঝে মাঝে চিনতে পারতাম না । যখন তিনি কবিতা প্রতিবেশীদের শোমাবার জন্তাই যেন জোরে টেঁচিয়ে কথা বলতেন, তখন নয় : যখন পুরো চক্ষিশ এম জোড়া পংক্তির পরেই দুই এম-এর লাইন সাজাতেন, তখনো নয়, কিম্বা যখন ঝকঝকে চিত্র-কল্পের মোড়কে নিজেই রাজার সাজে সাজিয়ে রাখতেন, তখনো নয় । কিন্তু যখন “বাঁশি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে তুমি কখন জলে নামবে ?” এই প্রশ্ন খুব নীচু স্বরে উচ্চারণ করতেন, কিম্বা যখন “.....হৃদয়ের কুঁজ বা গলগণ্ড আছে/আছে ভাঁড়ারের ঘট/বর্ণ লিপি/জীবিকা নির্বাহ/তুচ্ছ নেই গহ্বরের ভয়” এই অভিজ্ঞতার পোড়া বাদামী প্রজ্ঞা আমাদের জানাতেন তখন তাঁর বৃকের অন্ধকার কোণে রাখা ছোট্ট বাক্সের ভিতরটা হঠাৎ চোখের সামনে খুলে যেত । আর তখন, ঠিক তখন কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারতাম ।

“মাহুয ষাবার হলে চলে যায়”...এই নিবিকার অমোঘ উক্তির প্রত্যক্ষ দর্শনের এর দ্রুত প্রয়োজন ছিল কি? সত্যই কী ছিল?

পার্থ রাহা

(৭)

নৈরাশ, বেদনা, অপমান, ও বিরক্তি লুকিয়ে রাখা যায় না। চালচলন কথাবার্তায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর নিজেই নিয়েই তো লেখা। তাই শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বইয়ের নাম যখন দেখি,—‘কেন জন্ম, কেন নির্ধাতন’—তখন এই ‘উচ্চকণ্ঠ, বন্ধুবৎসল ও আবেগপ্রবণ মাহুযটির গোপন ব্যর্থাকে যেন অনুভব করতে পারি।

শংকরের কোন গল্প সংকলন থাকলে, হাতের কাছে সব গল্পগুলো পাওয়া গেলে আলোচনায় সুবিধে হোত। এই মুহূর্তে যৌবন, বৃষ্টি, ভাত এইসব গল্পের কথাই মনে পড়ছে। শংকরের নিজস্ব একটা মেজাজ ছিল, সেই মেজাজেই তিনি গল্প কবিতা লিখে গেছেন। ঠিক গতাম্ব-গতিক ভঙ্গীতে গল্প লেখেননি। মাহুযটার মতো তাঁর ভাষাও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। তাঁর গল্পে এমন অনেক অংশ আছে, যা প্রায় কবিতার কাছাকাছি। অবশ্য গল্পের পক্ষে এটা ভাল কি খারাপ সে আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, শংকরের গল্প পড়ে এই জন্মেই বোঝা যায় এটা তাঁরই লেখা।

‘যৌবন’ গল্পের ইতু কৈশোরের বহুসঙ্কটে দাঁড়িয়ে যৌবনের স্বপ্ন দেখেছে।—‘বয়স বয়স তুমি শেষ পর্যন্ত দরজা খুললে... সব রহস্যকে আমায় জানিয়ে দিলে।’ শঙ্কর নিজেও কি জীবনের সব রহস্যকে জানতে পেরেছিলেন? তাই কি এলোমেলো বিশৃঙ্খল জীবনযাপন ক’রে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন?—‘এক নগ্ন নিঃসঙ্গ আগুন জ্বলছে ‘ইতুর সব কিছুকে ঘিরে।’—‘যৌবন’ গল্পের শেষ দিকের একটা লাইন এরকম। আসলে এই নগ্ন নিঃসঙ্গ আগুনে পুড়ে পুড়ে শংকর নিজেকেই নিঃশেষ করে দিয়েছেন।

ভাবতে কষ্ট হয়, আমোদপ্রিয় আড্ডাবাজ এই মানুষটিকে এখন থেকে তো একাই থাকতে হবে।

আশিস ঘোষ

(৮)

বলতে দ্বিধা নেই, প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই তাঁর প্রতি আমি ঝুঁকে পড়েছিলাম। তারপর অনেক গভীর রাত্রি তিনি আমাকে কলকাতার কুটিল রাস্তা অগ্রজের মত শান্ত হাতে পার করিয়ে নিয়ে গেছেন। নানা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ ও ব্যবহার যেন এক অগ্রজ ও বন্ধুর মিশ্রণে আমার কাছে অমোঘ আশ্রয় হয়ে উঠেছিলো। শেষ ছ-সাত বছর যখন তিনি যথার্থ কবিতা লিখছিলেন, তখনই জানতে পেরেছিলাম, মৃত্যুকে তিনি এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু বলতেন, সেই অমোঘ বারবার তাঁর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। যা তাঁর শেষ দিককার লেখায় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। আর, এই মৃত্যুর অন্তিমক্কেই তিনি কবিতায় হয়ে উঠেছিলেন ন সত্য। অর্জন করেছিলেন এক ব্যক্তিত্ব। কেননা, তিনি যখন শেষ ছ-সাত বছর জীবন সম্পর্কে ধারণাগুলি পালটাতে শুরু করেছেন, বুঝতে পেরেছেন কবিতা কী, তখনই কবিতা যে একটি নির্মাণ, এই শিক্ষা ছাত্রের পরিশ্রমী নির্ভায় গ্রহণ করেছিলেন। সেই জন্ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, চাই স্বতন্ত্র ভাষা-ব্যবহার। যার মধ্য থেকে ঘটবে এক তীব্র ব্যক্তিত্বের উন্মোচন। আর এই শিক্ষা, নির্বিধায় বলা যায়, তাঁর কবিতায় সার্থক হয়ে উঠেছিলো। একথা আজ স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন শংকর চট্টোপাধ্যায় বাংলাকবিতার ভূমির ওপর যে প্রাকার গড়ে তুলেছেন তা তাঁর নিজস্ব। সেই প্রাকারের প্রতিটি ধরে সন্ধ্যার হাওয়ার নিঃশব্দতা ধরা দেয়, কান্তে ও কার্পাস নত হয়। মৃত্যুর তীব্র বোধ থেকেই তিনি তাঁর চারিপাশের প্রকৃতিকে দেখতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন, শিল্পের শুদ্ধতা। তাঁর কবিতার একজন নিবিষ্ট পাঠক ক্রমশ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন, কি ভাবে তাঁর এই বোধ অগণেবে এক দ্বন্দ্বিক বিস্তাসে

উপনীত হয়েছিলো। মনে হতে পারে তিনি শিল্পের শুদ্ধতা ও মৃত্যুর মধ্যে এক সমতা আনতে চেয়েছিলেন। তখনই হয়তো-বা তিনি কবিতায় হ'য়ে উঠে ছিলেন কিছুটা দূরত্ব। সেই বিমূর্ত শিল্পের শুদ্ধতায় তিনি নিজেকে নিমগ্ন রাখতে চেয়েছিলেন।

অশোক দত্তচৌধুরী

(২)

'আবেগ কবিতার জন্মশত্রু' এই উক্তিকে নিঃশর্তে মেনে নিয়েও শংকরের কবিতার অনুরাগী পাঠক হতে আমার আটকাই না। আবেগ-ই শংকরের কবিতার প্রধানতম আশ্রয় কিন্তু সে আবেগের জাত আলাদা। শংকরের আবেগ কখনোই ইনিয়োরিনিয়োর বলে ওঠে না 'তোমার নামের শেষ আমার প্রাণে আর কানে গানের মতো'। শংকর অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ চাইতো না কিন্তু তার আবেগ অভিজ্ঞতারই সাব্যস্তার। সেই অভিজ্ঞতাসঞ্চারে আবেগ স্থির শিখার আগুনের মতো জ্বলে ওঠে, মন্ত্রের মতো উপলব্ধিনিবিড় নিশ্বাসে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত যায়। মস্ত্র বিশ্লেষণ নেই, জিজ্ঞাসা নেই, সংঘাত নেই, আছে কখনো জাতি, কখনো আনন্দ-উন্মীলিত দৃষ্টি—বিশ্লেষণ-জিজ্ঞাসা-সংঘাতকে পাশে রেখে শংকরের কবিতা সেই আতি সেই আনন্দ-উন্মীলিত দৃষ্টির কবিতা। শংকরের কবিতাকে আমি এইভাবে বুঝি।

আলোক সরকার

শতভিষা

শংকর চট্টোপাধ্যায়-এর দু'টি কবিতা

ভেঙেছে প্রাচীর

ভেঙেছে প্রাচীর । তুমি বীজ তোলো
তোলো দণ্ডপাণী ।
প্রবাহ কাণ্ডের তবু কুপাময়ী চোখ দুটি থাক
থাক পরমাঙ্গু দীর্ঘ
অদর্শন
বিচ্ছেদ নীলিমা ।

আনো নতুন কর্ণ, অগ্নি, শূণ্যস্থর
আধিপত্যময় ।
লক্ষ্যের আড়ালে রাখো নত মুখ
মলিন চীবর ।
রসস্থ কণায় ধরো বিভূতিও ।

বসন্ত ধূলির তৃষ্ণা ছুঁয়েছে অসীম
ছুঁয়েছে স্বাদের লক্ষ্য পরমাণু
ভেঙেছে প্রাচীর ঐ
কুপাময়ী চোখ দুটি থাক ।

ভাষাভিত্তিক স্বরলিপি

স্বরলিপি খুলে ভাষা চলে যায় গূঢ়তার দিকে
জানি না আহ্বান কিনা প্রাকৃতিক ?

মানুষও যাবার হলে চলে যায়...স্বরশব্দে যায়
বস্তুত অধীন তারা কামারশালায় ।

যাবার পথের বাঁকে দেখা হয় মানুষ ও ভাষার
জঙ্ঘলে কেশের সঙ্গে থরোষ্ঠি লিপির ঘটে কুট যোগাযোগ ।

তখন বিবাহসভা খালি থাকে...নেমে পড়ে ছায়া
খালি চটিজুতো আর স্বরলিপিটির মধ্যে বাক্যালাপ হয় ।

দেখা যায় সহৃদয় বালিশের মোহপাশ ছিঁড়ে ফেলে রবির অমল
খোঁজ নেয় রাজার চিঠির ।

গূঢ়তা ও অধীনতা ভৎক্ষণাৎ একসঙ্গে যুগ্মস্বর তোলে
সম্পূর্ণ সপ্তক...অসামান্য পুরস্কার লাভ হয় মাছাঘের প্রকৃতিরও বটে ।

With best Compliments from :



J. B. Mercantile Corporation

50, EZRA STREET

CALCUTTA-700001

With best Coupliments from :



A WELL WISHER

With best compliments from



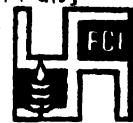
Q. F. India

VILLAGE : CHAKMIR

DIST 24 PARGANAS

এই সুবিশাল ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে
প্রতি মুহূর্তে কিন্তু জমির পরিমাণ এক একরও বাড়ছে
না; তবে কি দেশের লোক না খেয়ে মরবে? না, তা
হ'তে পারেনা তাই বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদকে মেনে
নিতেই হবে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে পৃথিবীর
অন্যান্য দেশ যদি সমৃদ্ধিশালী হতে পারে তবে
আমরাও অবশ্যই হ'তে পারি। আশুন ক্ষুধার বিরুদ্ধে
সবুজের জয়যাত্রায় ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের
বিভিন্ন ধরনের সেরা সার যথা ইউরিয়া, এমনিয়াম,
সালফেট আর বিশেষভাবে **সুফলা** ব্যবহার
করুন—দেখবেন আপনার সংসার উপচে পড়বে।

সুফলা কেনবাং ভাণ্ড আপনার নিকটতম এফ-সি-আই সান-বিক্রেতাব
কাছে বা এফ. সি. আই. লিঃ 'কনক' বিল্ডিং, ৪১, চৌরঙ্গী, কলিকাতা-১৬
মুচিপাড়া ভূগাপুর-১১ ● বিধান রোড, শিলিগুড়ি ● শহীদ সূর্য সেন ট্রিট,
বহরমপুর ● পোঃ মেদিনীপুর, মেদিনীপুরে যোগাযোগ করুন
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিঃ, পূর্বাঞ্চল বিপণন
শাখা, ৪১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১ (৪৪-৪৭২১)



সম্পাদকীয় দপ্তর

স্বরাজিৎ ঘোষ : ৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলিকাতা-১৭

অভিলাষ সরকার : ৪৫এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

কবিতা এবং কবিতা বিষয়ক আলোচনার পত্রিকা 'শতভিষা' পঁচিশ বছর পূর্ণ করল। ১৯৫১ সালে প্রথম প্রকাশের পর থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাকে সত্য অর্থে সজীব এবং ক্রমঅগ্রসরমান রাখার প্রচেষ্টাই তার একমাত্র লক্ষ্য। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধচন্দ্র সেন, অমিয় চক্রবর্তী থেকে শুরু করে বাংলা ভাষার সবচেয়ে তরুণ কবি ও প্রাবন্ধিকটিও 'শতভিষা'র লেখক। কবিতা এবং একমাত্র কবিতার কাছেই 'শতভিষা' উৎসর্গকৃত।

প্রকাশক : তরুণ মিত্র। ৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলিকাতা-১৭

মুদ্রক : গোপীনাথ আর্ট প্রেস। ১০, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ ও আর্ট পেপার সরবরাহ : ত্রীভোলানাথ শীল।

রক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রিপ্ৰোডাকশন্ সিটিকেট।

চতুস্তহারিংগ সংকলন

রক্ত জয়ন্তী বর্ষ : ১৩৮৩

দাম : পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী : ত্রীপরিতোষ সেন।